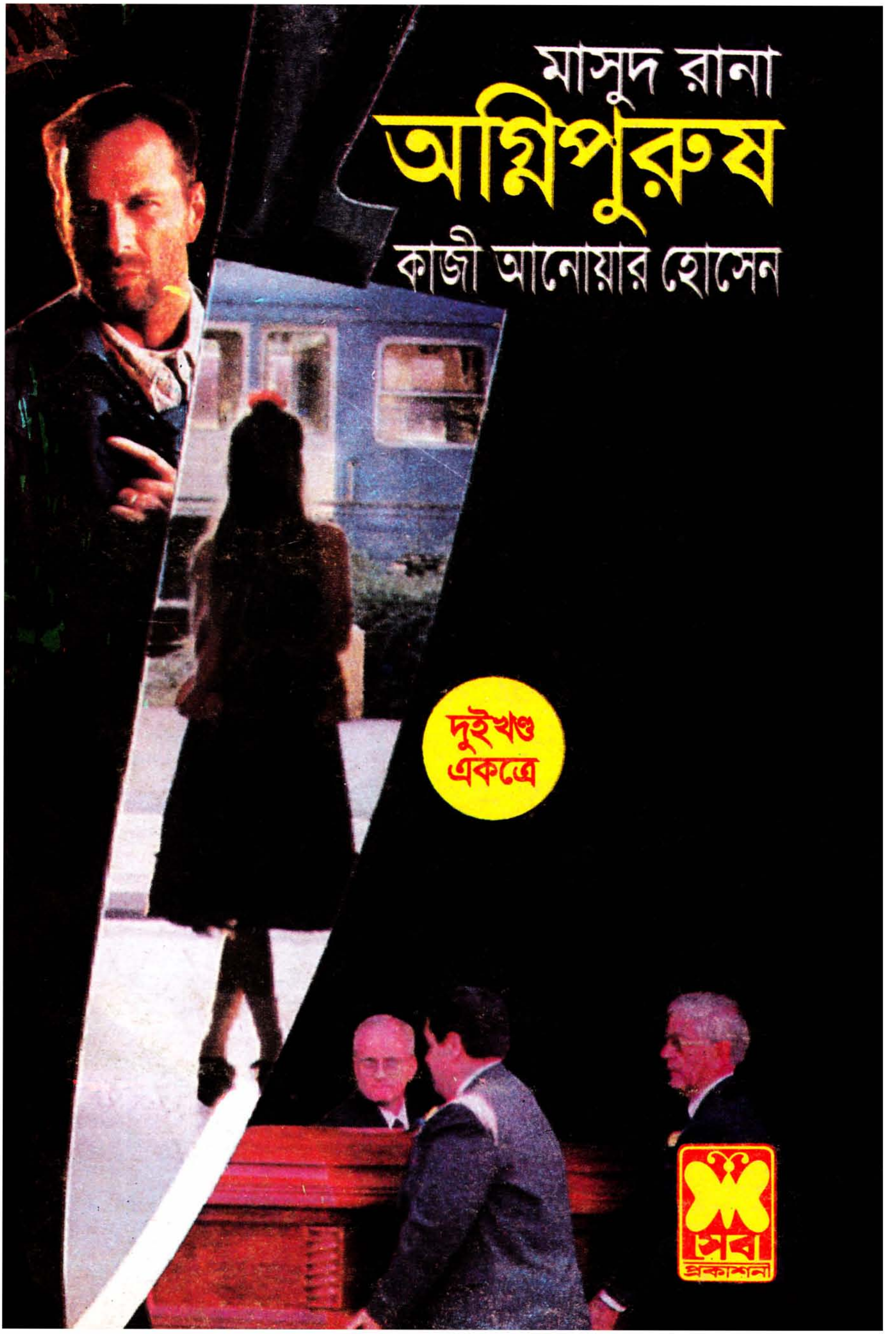

মাসুদ রানা
অগ্নিপুরুষ
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুইখণ্ড একত্রে
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

অগ্নিপুরুষ

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7450-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫

প্রচ্ছদ: আলীম আজিজ

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
AGNIPURUSH
(Part-I & II)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

চৌষট্টি টাকা

মাসুদ রানার ভলিউম

খণ্ড	নাম	মূল্য
১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৮/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৫০/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৯৬/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-

অগ্নিপুরুষ ১

প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল, ১৯৮৬

এক

ঝাঁকড়া মাথা পাইন, নারকেল বীথি আর গাংচিলদের ডানা ঢেকে রেখেছে আকাশটাকে। বাতাসে দারুচিনি আর জলপাইয়ের গন্ধ। চারদিকে মিঠে-কড়া রোদ, ছায়ায় বসন্তের আমেজ। দূর সৈকতে ঝিনুক-লোভী কিশোরীরা স্কার্ট খানিকটা ওপরে তুলে ছুটোছুটি করছে, তেড়ে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ছে ভূমধ্যসাগর, তাদের ভেজা পায়ে ঝিকমিক করছে সোনালি রোদ। অলস দুপুর রাস্তার পাশের একটা গাছ থেকে নিঃসঙ্গ এক কোকিল হঠাৎ জরুরি আবেদনের সুরে কু-কু-কু করে ডেকে উঠছে, চোখ তুলে তাকাচ্ছে দু'একজন অন্যমনস্ক পথিক, নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ।

দ্বীপের নাম কর্সিকা। বাস্তিয়া বন্দর।

দিন দুই বেশ গরম পড়েছে অথচ সময়টা শীতকাল। একজন বার মালিক বুদ্ধি করে একটা টেবিল আর খান কতক চেয়ার টেনে নিয়ে এসে ফেলেছে ছাল ওঠা পেভমেন্টে। ওখানে বসে একা এক বয়স্ক লোক হুইস্কি খাচ্ছে, তার চোখ পড়ে আছে ডকের দিকে। ডকে যাত্রার জন্যে তৈরি হচ্ছে একটা ফেরি, লিভোরনো-য় যাবে ওটা।

প্রায় দু'ঘন্টা হয়ে গেল ওখানে বসে রয়েছে লোকটা। প্রথম দিকে পাঁচ-সাত মিনিট পরপরই গ্লাস ভরে দেয়ার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, শেষে বার মালিক গোটা একটা বোতল, প্লেট ভর্তি কালো জলপাই আর খোসা ছাড়ানো কাজু বাদাম রেখে গেছে তার টেবিলে। রাস্তায় আর পেভমেন্টে অনবরত বাকবাকুম আওয়াজ তুলে গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে এক ঝাঁক পায়রা, হঠাৎ খেয়াল হলে ওগুলোর দিকে এক মুঠো করে কাজু বাদাম ছুঁড়ে দিচ্ছে আগন্তুক।

রাস্তার ওপারে, পেভমেন্টের ওপর বসে রয়েছে ছোট এক ছেলে। ভাঁজ করা হাঁটু দুটো এক করা, তার ওপর চিবুক রেখে গভীর মনোযোগের সাথে লোকটার জলপাই আর হুইস্কি খাওয়া লক্ষ্য করছে সে।

চারদিক শান্ত আর নিরিবিলি, ট্যুরিস্টরা এ-সময় এদিকটায় আসে না। আগন্তুক ছাড়া ছেলেটার দৃষ্টি কাড়ে এমন কিছু নেই আশেপাশে। কচি মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে লোকটা। অদ্ভুত একটা স্থির, অচঞ্চল ভাব রয়েছে তার মধ্যে, প্রয়োজন ছাড়া তার শরীরের কোন অংশ এক চুল নড়ে না। দু'জনের মাঝখানে রাস্তা, মাঝে মধ্যে দু'একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু সেগুলোর দিকে

একবারও তাকাচ্ছে না আগন্তুক। তাকিয়ে আছে ডক আর ফেরির দিকে।

মাঝে মধ্যে ছেলেটার দিকে চোখ পড়ছে তার। গম্ভীর মুখ, নিরাসক্ত দৃষ্টি। তার মুখে দুটো দাগ, একটা বাঁ চোখের নিচে, আরেকটা কপালের ডান দিক ঘেঁষে। সারা মুখে আধ ইঞ্চি লম্বা কুচকুচে কালো দাড়ি, নাকটা টিকালো, গায়ের রং রোদে পুড়ে তামাটে মত। কিন্তু ছেলেটার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তার চোখ জোড়া। মায়াভরা দুই চোখের মাঝখানে একটু যেন বেশি দূরত্ব, ভারি পাতা—সরু হয়ে আছে, যেন সিগারেটের ধোঁয়া এড়াবার চেষ্টা করছে, অথচ লোকটা এই মুহূর্তে ধূমপান করছে না।

হুইস্কির অর্ডার দেয়ার সময় লোকটাকে ঝরঝরে ফ্রেঞ্চ বলতে শুনেছে সে, কিন্তু তবু তার মনে হয়েছে এ লোক ফরাসী হতে পারে না। তার পরনের ঘন নীল ট্রাউজার, পোলো নেক সোয়েটারের ওপর ডেনিম জ্যাকেট খুবই দামি, কিন্তু বহু ব্যবহারে মলিন। তার পায়ের কাছে রাখা লেদার সুটকেসটাও তাই। অচেনা, নতুন লোক অনেক দেখেছে ছেলেটা, বিশেষ করে আগন্তুকদের চরিত্র আর আর্থিক অবস্থা বুঝে নেয়ার আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে তার। কিন্তু এই লোকটা তাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। এর আগে এই প্রকৃতির লোক সে কখনও দেখেনি। তার মনে হল, এই লোক জন্ম থেকে একা, নিঃসঙ্গ যাযাবর। মনে হল, এই লোককে বিশ্বাস করে কেউ কোনদিন ঠকবে না। লোকটা হাতঘড়ি দেখল, বোতল থেকে শেষ হুইস্কিটুকু গ্লাসে ঢেলে এক চুমুকে নিঃশেষ করল। বার মালিককে ডেকে টাকা দিল, কি যেন বলল তাকে; মুখ তুলে রাস্তার ওপারে বসা ছেলেটার দিকে একবার তাকাল বার মালিক। লেদার সুটকেস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, তারপর রাস্তা পেরোবার জন্যে পা বাড়াল।

পেভমেন্টে স্থির বসে থাকল ছেলেটা, লোকটার এগিয়ে আসা দেখছে। লোকটা আরও কাছে আসতে বোঝা গেল, বেশ লম্বা সে, প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। শরীরে একটু মেদ জমেছে, তবু আশ্চর্য হালকা পা ফেলে হাঁটতে পারে। হাঁটাটা অদ্ভুত, প্রথমে মাটি ছোঁয় পায়ের বাইরের অংশ বা কিনারাগুলো।

পাশ কাটাবার সময় ছেলেটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোকটা। প্রায় দেড় বোতল মদ খেয়েও সহজ, সাবলীল ভঙ্গিতে হাঁটছে সে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক ছুটে রাস্তা পেরোল ছেলেটা, টেবিলের ওপর ঝুঁকে খুঁজল তার জন্যে এঁটো কিছু পড়ে আছে কিনা। এই সময় বার থেকে বেরিয়ে এল প্রৌঢ় মালিক। তার গম্ভীর চেহারা দেখে পিছিয়ে আসতে শুরু করল বেচারা। পাঁচ হাত পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, কারণ লোকটার হাতে দুটো প্লেট দেখতে পেয়েছে। কিন্তু বারের ভিতর বা বাইরে কোন খদ্দের নেই।

চোখ ইশারায় কাছে ডাকল বার মালিক। প্লেট দুটো টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। 'কেউ যদি পায়রাগুলোকে এই বাদাম খাওয়ায়,' প্লেট ভর্তি কাজু বাদাম

দেখিয়ে বলল, 'তাহলে,' দ্বিতীয় প্লেটটা দেখাল এবার, 'এই জলপাইগুলো মজুরি হিসেবে পাবে সে।'

বার মালিকের দিকে নয়, ঘাড় ফিরিয়ে ডকের দিকে তাকাল ছেলেটা। লোকটাকে দেখতে পেল সে, ওর দিকে পিছন ফিরে ফেরিতে উঠছে। ফেরিতে উঠে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এগিয়ে এসে প্লেট থেকে দুটো জলপাই তুলে নিয়েই ঘুরল ছেলেটা, ছুটল। পিছন থেকে মালিক সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কি হল?'

'পরে।' এক ছুটে রাস্তা পেরিয়ে কিনারায় এসে দাঁড়াল ছেলেটা। দুটো জলপাই মুখে পুরে দিয়েছে। পনেরো মিনিট পর ডক থেকে রওনা হল ফেরি। অল্প ক'জন যাত্রী, তাদের মধ্যে থেকে আগন্তুককে খুঁজে নিতে কোন অসুবিধে হল না। পিছন দিকে রেইল ধরে একা দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

ধীরে ধীরে গতি বাড়তে লাগল ফেরির। কি এক সঙ্কোচ আর দ্বিধা জড়িয়ে ধরলেও, সব কাটিয়ে উঠে এক সময় একটা হাত মাথার ওপর তুলে নাড়ল ছেলেটা।

ফেরি তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আগন্তুকের চোখ এত দূর থেকে দেখা যায় না, কিন্তু নিজের মুখের ওপর তার দৃষ্টি অনুভব করল ছেলেটা। পরিষ্কার দেখল, রেইল থেকে হাত তুলল লোকটা, ছোট্ট করে একবার নাড়ল।

পরম আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ছেলেটার মুখ। 'তোমার ভাল হোক,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'তোমার ভাল হোক!'

এই আশীর্বাদ আগন্তুকের দরকার ছিল।

দুই

আলো-আঁধারির ভেতর অলস পায়ে হাঁটাহাঁটি করছে লরা আভান্তি, ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা। এক সময়ে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর সামনে দাঁড়াল সে, চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল লেক। লেকের নিস্তরঙ্গ, কালো পারদের মত টলটলে পানিতে ঝিলমিল করছে শেরাটন হোটেলের আলো।

লরা আভান্তির রূপের বুঝি কোন তুলনা হয় না। অভিজাত সমাজে তাকে বলা হয়, বিশুদ্ধ নিয়াপলিটান সৌন্দর্যের উৎকৃষ্ট নমুনা। যৌবন নয়, যেন ফুলের কমনীয়তা; মুখ নয়, যেন শিশিরের স্নিগ্ধতা; চোখ নয়, যেন সাগরের গভীরতা। তবু, যার দেখার চোখ আছে, লরা আভান্তির চেহারায় বিদ্রূপ আব দুষ্ট ভাব সময় সময় ঠিকই দেখতে পায় সে। তার নিটোল ঠোঁটে যৌনাবেদন ফুটে থাকে, বড় বড় চোখে মদির আহ্বান। তার মুখের সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে চওড়া চোয়ালের নিখুঁত গড়ন, প্রায় গোল কপালের সাথে ভারি সুন্দর মানিয়ে গেছে। ঘন

কালো চুল সোজা নেমে এসে ভেতর দিকে ভাঁজ নিয়ে কাঁধ ছুঁয়েছে, তারপর অনেকগুলো ঢেউ তুলে সরু কোমর পর্যন্ত ঝুলে আছে। কোমর থেকে ওপরের দিকটা ক্রমশ চওড়া হয়ে উঠে গেছে। পা জোড়া লম্বা। মেদহীন পাঁজর, গলায় কোন ভাঁজ নেই। অর্ধবৃত্ত আকারের স্তন, ভরাট, এতটুকু ঢিলেঢালা ভাব নেই কোথাও।

পুরুষের লোভ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে জানে লরা, কিন্তু পুরুষমানুষ নিয়ে খেলার প্রবণতা তার জন্মগত। অভিজাত সমাজের হোমরা-চোমরা লোকজন তার চারপাশে ভিড় করে থাকে, ধরা দেয়ার ভান করে তাদের কাছে ডাকে সে, কিন্তু কখনোই ধরা দেয় না। এটাই তার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। তার এই খেলার শিকার বেচারা স্বামী ভিটো আভান্তিও। স্ত্রীকে একান্ত কাছে পেতে রীতিমত সাধনা করতে হয় তার। গাধার সামনে মুলো ঝুলিয়ে রাখার মত পুরুষের সামনে নিজেকে ঝুলিয়ে রাখে লরা। এই খেলার স্বার্থে নিজেকেও তার বঞ্চিত করতে হয়, শরীরের চাহিদা অনেক সময়ই যথাযথ মেটে না। গত ডিসেম্বরেই তো ভিটো অনুযোগের সুরে বলেছিল, 'এ-বছর মোট ক'বার তেমাকে পেয়েছি গুণে বলে দিতে পারি।'

লরার চেহারায় বিষণ্ন একটু হাসি ফুটে উঠেছিল। তার জবাব ছিল, 'বেশি কোন জিনিসই ভাল নয়। তাছাড়া, যতটা সম্ভব অক্ষত, অটুট থাকতে চাই আমি—ঘাঁটাঘাঁটি করে নষ্ট করতে চাও কেন?'

আর এক ঘন্টা পর, রাত আটটায়, তার সাথে গল্প করতে আসবে আলবারগো লোরান। গল্প মানে মুগ্ধ চোখে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা আর লরার রূপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা। লোরান আশা করবে লরা তাকে ডিনারের জন্যে থেকে যেতে বলবে, কিন্তু লরা তার ধার দিয়েও যাবে না। পারিবারিক কোন অনুষ্ঠানে লোরানকে ডিনার খাওয়ান যায়, কিন্তু লরা ব্যক্তিগতভাবে কখনও সে অনুরোধ ওকে করবে না।

আজ সাত দিন পর বিদেশ থেকে ফিরছে ভিটোও। ভিটো পৌঁছুবে ন'টায়, তার মানে লোরানকে আজ বেশি সময় দেয়া যাবে না, ভাবল লরা।

জানালার কার্নিসে ভাঁজ করা হাতের কনুই, তালুতে চিবুক ঠেকে আছে, ছল ছল করছে চোখ জোড়া। বন্দিনীর মন ভাল নেই।

লুবনা আভান্তি মায়ের সমস্ত সৌন্দর্য তো পেয়েইছে, পেয়েছে আরও অনেক বেশি করে। মা মেয়ের রূপে যেমন মিল আছে, তেমনি স্বভাবে আবার অমিলও আছে প্রচুর। মায়ের চেহারায় আছে গর্ব, মেয়ের চেহারায় সারল্য। মায়ের চোখে তির্যক কটাক্ষ, মেয়ের চোখে মায়া। লরা শান্ত, সতর্ক; লুবনা ছটফটে, প্রাণচঞ্চল। মা আত্মকেন্দ্রিক, নিজেকে নিজের ভেতর গুটিয়ে রাখে; আর মেয়ে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে ছটফট করে বেড়ায়।

কিন্তু এ এক শ্বাসরুদ্ধকর বন্দী জীবন। এই বয়সে তার খেলার সাথী দরকার, অথচ বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো নিষেধ। ওর দেখাশোনার জন্যে ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে আথিয়া আর গভর্নেস আছে বটে, কিন্তু দু'জনের একজনকেও সহ্য করতে পারে না লুবনা। আথিয়া চাকরানী, মনিব কন্যার ওপর খবরদারি করার সুযোগ পেয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। এত কথা বলে না, এত কৌতূহল ঠিক নয়, এত হাসি ভাল নয়, বড় হচ্ছ এত লাফায় না—এই চারটে না ছাড়া আর কোন কথা নেই তার মুখে। গভর্নেস বুড়ি আরেক যন্ত্রণা। কেউ যে এমন অঙ্ক-পাগল হতে পারে, বুড়িকে না দেখলে বিশ্বাস হত না লুবনার। দু'ক্লাস ওপরের বই থেকেও অঙ্ক শিখতে হয় লুবনাকে, আর রোজই শুনতে হয়—সুখী হতে হলে জীবনটাকে এখন থেকে অঙ্কের নিয়মে সাজিয়ে নাও।

আর আছে বাবা। কিন্তু বাবার দেখা পাওয়া লুবনার জন্যে ভাগ্যের ব্যাপার। ব্যবসার কাজে বছরের বেশিরভাগ দিনই বাইরে থাকে বাবা। আর যখন ঘরে থাকে, তাকে দখল করে রাখে মা। লুবনার মনে হয়, বাবা তাকে ভালবাসলেও, আলাদা একটা অস্তিত্ব হিসেবে নয়, মায়ের একটা অংশ হিসেবে ভালবাসে।

আর মা যেন থেকেও নেই।

কেন যেন মাকে ভীষণ ভয় করে লুবনার। মা কখনও তাকে শাসন করে না, কখনও বকাঝকা করেছে বলে মনে পড়ে না, অথচ তবু মায়ের সামনে যেতে তার বুক কাঁপতে থাকে। নিজেকেই সে কতবার প্রশ্ন করেছে, মাকে আমার এমন পর পর লাগে কেন? তাকে দেখলেই মা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায়, সেটাই কি তার কারণ? তার ভাল-মন্দ কিছু জানতে চেয়েছে, তার কথায় কখনও হেসেছে, তাকে কাছে ডেকে কখনও আদর করেছে—কই, মনে পড়ে না লুবনার। সামনে পড়ে গেলে মা যেন কেমন অদ্ভুত চোখে তাকায় তার দিকে। তখন শুধু ভয় নয়, কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে লুবনা, একটা আড়ষ্ট ভাব এসে তাকে কুঁকড়ে দেয়।

এই নিরানন্দ, বন্দী জীবনে একমাত্র খোলা জানালা ছিল স্কুল। কিন্তু আজ দু'মাস হল স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বান্ধবীদের কথা মনে পড়ে লুবনার, মনে পড়ে টিফিন আওয়ারে সবুজ ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে আইসক্রীম খাওয়া আর দল বেঁধে হুটোপুটি করার কথা। আর মনে পড়লেই ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি, কান্না পায়।

নিঃসঙ্গ এক পাখির ছানা, খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে বাগান থেকে ধরে নিয়ে এসে খাঁচায় পুরে রেখেছিল লুবনা—নিজেকে তার সেই কাতর পাখির মত লাগে। পাখিটাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তবু তো সে ছিল, কিন্তু তার কে আছে?

সন্ধে থেকে দু'বার মায়ের কাছে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে সে। প্রথমবার ঘর থেকে বেরিয়েছিল, কিন্তু বারান্দা থেকে ফিরে এসেছে। দ্বিতীয়বার সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত পৌছেছিল, কিন্তু তারপর আবারও সাহস হারিয়ে ফেলে। লুবনা

জানে, বাবা আজ ফিরে আসছে। কথাটা বলতে হলে আজই মাকে তার বলে রাখতে হবে।

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল লুবনা। বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল সে। দাঁড়ালে বোঝা যায়, লম্বায় মাকেও ছাড়িয়ে যেতে চলেছে সে। ঘর থেকে বেরুবার আগে আয়নায় চোখ পড়ল, নিজের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন লজ্জা লাগল তার। এখনও সে রোগা, কিন্তু মুখে ফোলা ফোলা একটা ভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। হাতে-পায়ে মাংস নেই, কিন্তু ওগুলো আশ্চর্যভাবে বদলে গিয়ে আরও সুন্দর একটা গড়ন নিচ্ছে। হঠাৎ খচ করে বিঁধল প্রশ্নটা, মা কি তাকে ঈর্ষা করে?

অন্যমনস্কভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল লুবনা। মা-বাবার বেডরূমের সামনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে বলতে পারবে না। ঘরের দরজা খোলা, ভেতরে নেই কেউ। মা কি তবে বাইরে কোথাও গেছে?

মা একা একা বেড়াতে চলে যায়, তাকে সাথেও নেয় না, বলেও যায় না।

ড্রইংরূমের দিকে এগোল লুবনা। ভারি, পুরুষালি একটা আওয়াজ আসছে ওদিক থেকে। দূর থেকেই আলোকিত জানালা দেখা গেল, কিন্তু দরজা বন্ধ। গলাটা চিনতে পারল লুবনা, বাবার বন্ধু আলবারগো লোরান কথা বলছে। মার হাসির আওয়াজও শুনতে পেল সে।

আমার সাথে মা কখনও এভাবে হাসে না, ভাবল সে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করল, তারপর মৃদু টোকা দিল কবাটে।

ভেতর থেকে মা বলল, 'দাঁড়াও।'

লোরান কাকুর একটা কথাও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না লুবনা, কথাগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে মার হাসিতে। একবার ইচ্ছে হল ফিরে যায়। কিন্তু মাকে কথাটা বলা একান্ত দরকার। বাবা হয়ত আবার কাল সকালেই দিন কতকের জন্যে অন্য কোথাও চলে যাবে।

আরও পাঁচ মিনিট কাটল। আবার নক করবে কিনা ভাবল লুবনা। মা হাসছে আর হাসছে। আওয়াজটা যেন ঘরের ভেতর ছুটে বেড়াচ্ছে···একবার কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে, ঘরের ভেতর ওরা ছুটোছুটি করছে নাকি! হঠাৎ, মাঝপথে থেমে গেল মার হাসি, কেউ যেন তার মুখে কিছু চাপা দিল। তারপর আর কোন আওয়াজ নেই।

আরও দু'মিনিট পর দরজা খুলে গেল। মাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল লুবনা।

'ও, তুমি,' বলল লরা, এ-সময় মেয়েকে তার কাছে আসতে দেখে একটু অবাকই হয়েছে সে।

অনেক দুঃখ আর অভিমান জমে আছে লুবনার বুকে, ইচ্ছে হল মাকে জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভরে কাঁদে আজ। কিন্তু মার চোখে সেই দৃষ্টিটা ফুটে উঠতে দেখে আড়ষ্ট

হয়ে গেল লুবনা। মা হাসছে না, শুধু তাকিয়ে আছে, সে তাকানোতে আদরও নেই প্রশ্রয়ও নেই। লুবনার মনে হল, মার দৃষ্টি তার কাপড়, চামড়া, হাড়ভেদ করে শরীরের ভেতর চলে গেছে। সে যেন একটা দর্শনীয় বস্তু, মা যেন তাকে এই প্রথম দেখছে।

'কিছু বলবে?' মেয়েকে পাশ কাটিয়ে ড্রেসিংরুমের দিকে এগোল লরা।

কয়েক সেকেণ্ড কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লুবনা। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরল। ইতিমধ্যে ড্রেসিংরুমের ভেতর ঢুকে পড়েছে লরা, দরজার কবাট ধরে অপেক্ষা করছে।

ধীর ভঙ্গিতে কয়েক পা এগোল লুবনা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল, ড্রেসিংরুমের দরজা থেকে আট দশ হাত দূরে। বুঝতে পেরেছে, মা দরজা বন্ধ করতে চাইছে।

'আমি স্কুলে যেতে চাই,' প্রচণ্ড জেদের সাথে বলতে চাইলেও গলায় তেমন জোর পেল না লুবনা। 'বাবাকে বল…'

'ঠিক আছে,' বলল লরা। হঠাৎ অন্যমনস্ক দেখাল তাকে। দরজা বন্ধ করার সময় মেয়ের দিকে তার খেয়ালও থাকল না।

ঘাড় একদিকে একটু কাত হয়ে আছে লুবনার, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে। বন্ধ দরজাটা যখন ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে, ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটল। তার ফোঁপানর আওয়াজ কেউ শুনতে পেল না।

প্লেনে করে হংকং থেকে সিঙ্গাপুর, তারপর মিলান, মিলান থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে কোমো-তে ফিরছে ভিটো আভান্তি। সাত দিন পর বাড়ি ফিরছে সে, বাড়ি ফেরার একটা আনন্দ আছে। দেশের বাইরে কোথাও গেলে বরাবর যা হয়, লরা আর লুবনার জন্যে উদ্বেগের মধ্যে ছিল সে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল নয়, কোন্ দিক থেকে কি বিপদ আসে কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া, বাড়িতে একটা সমর্থ পুরুষ মানুষ নেই।

একমাত্র ভরসা ওদের পারিবারিক বন্ধু লোরান। আলবারগো লোরান শুধু স্বনামধন্য ব্যক্তিই নয়, লোকটা পিঁপড়ের মত ব্যস্তও। কিন্তু দায়ে-বিপদে আভান্তি পরিবারের পাশে ঠিকই তাকে পাওয়া যাবে। ভিটো যখনই দেশের বাইরে কোথাও একা বা সস্ত্রীক গেছে, লোরান তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে নিয়ে ওদের বাড়িতে এসে খোঁজ-খবর নিয়েছে, বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত। কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করল ভিটো, লোরানের মত বন্ধু হয় না।

কিন্তু বাড়ি ফেরার আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে না ভিটো। অনেক দিন থেকেই গুমোট একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এবার সেটা ঝড় তুলবে। কিছু কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এবার নিতেই হবে। ভিটো জানে সিদ্ধান্তগুলো পছন্দ হবে না লরার। ঝড়টা তখনই উঠবে।

তেরো বছর দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ভিটো জানে এই সঙ্কটকে ছোট করে দেখা চলে না। বছরগুলো স্মরণ করল সে, নিজেকে প্রশ্ন করল, আমি কি সুখী?

এর কোন জবাব নেই। লরা শুধু স্ত্রী নয়, নয় কেবলমাত্র সুন্দরী নারী, লরা তার কাছে প্রচণ্ড একটা নেশা। বিয়ের আগে, প্রথম যেদিন লরাকে দেখে সে, ওর রূপ তাকে মাতাল করে দিয়েছিল। সেই ঘোর আজও কাটেনি, কাজেই এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভালমন্দ কিছুই সে বলতে পারবে না।

আসলে সহজ সরল একটা পরিস্থিতির শিকার সে। ভাগ্যগুণে তার স্ত্রী অসম্ভব সুন্দরী আর আত্মকেন্দ্রিক, নিজের শখ সাধ ছাড়া কিছু বোঝে না, চলে আপন খেয়ালে। সে জানে লরা কোনদিন বদলাবে না, কাজেই হয় সে তাকে ত্যাগ করতে পারে, আর নয়ত মেনে নিতে পারে। সিদ্ধান্তটা কি হবে, অনেক দিন আগেই পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে ভিটো। মেনে নেয়া সম্ভব, ত্যাগ করার কথা ভাবা যায় না।

বিয়ের পর প্রথম দিকে এই নেশা যতটা না ছিল মানসিক, তারচেয়ে বেশি ছিল শারীরিক। রূপ সায়রে অবগাহন করে বেহুঁশ হয়ে ছিল সে। রূপ-যৌবনের সেই আকর্ষণ আজও আগের মতই অনুভব করে ভিটো, কারণ বিধি-নিষেধের বেড়া তুলে দিয়ে নিজেকে লরা দুর্লভ করে রেখেছে। তবে সেই আকর্ষণের সাথে নতুন আরও কিছু যোগ হয়েছে এখন। দুষ্প্রাপ্য কোন বস্তুর মালিক হতে পারলে লোকে যেমন গর্ব বোধ করে, লরার মালিকানা স্বত্ব সেই গর্ববোধ জাগিয়ে দিয়েছে ভিটোর মনে। লরা যাদের অধিকারে নেই তারা ঈর্ষা করে তাকে, কেউ কেউ শ্রদ্ধাও করে। তার ঘরে লরা আছে বলেই অভিজাত সমাজে আর বন্ধু মহলে তার এত খাতির। তার সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে লরা। খাতির আর মর্যাদার মোহ, এ-ও এক দুর্দান্ত নেশা।

লেকের কাছে এসে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। ল্যানসিয়া ডান দিকে বাঁক নিল। মেয়ের কথা মনে পড়তেই খচ করে একটা অপরাধ বোধ জাগল বুকে। লুবনাকে সে ভালবাসে। কিন্তু স্নেহ আর আদরের যতটুকু লুবনার প্রাপ্য ততটুকু তাকে দেয়া হয়ে ওঠে না। এর জন্যে কিছুটা দায়ী তার ব্যস্ততা, কিছুটা লরার অন্যায় আবদার। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ভিটো, তার ধারে কাছে কাউকে ভিড়তে দেয় না লরা। কোথাও বেড়াতে বা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে লরা চায় শুধু তারা দু'জনই যাবে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভিটো।

ওরা তিনজন ডিনার খেতে বসেছে। চওড়া মেহগনি টেবিলের দু'মাথায়, সামনাসামনি বসেছে ভিটো আর লরা। মাঝখানে লুবনা। পরিবেশন করছে মেইড। বসার এই ছক কেতাদুরস্ত আর আনুষ্ঠানিক, ঘরোয়া পরিবেশে আপনজনদের সান্নিধ্য ভাল লাগার যে অনুভূতি এনে দেয়, তিনজনের মধ্যেই তার

বড় অভাব। লরার সাথে আজ কথা কাটাকাটি হবে, সেজন্যে টেনশনে ভুগছে ভিটো। আর ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে তার যুদ্ধ-কৌশল কি হবে ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে লরা। তাছাড়া, ঘরে বসে ডিনার খেতে চিরকালই তার একঘেয়ে লাগে। সবচেয়ে ম্লান দেখাল লুবনাকে। বুক ভরা অভিমান তো আছেই, আবার তাকে স্কুলে যেতে দেয়া হবে কিনা এই অনিশ্চয়তায়ও ভুগছে সে।

আদর্শ স্ত্রীর মতই স্বামীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে লরা। কোমর জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে দিয়েছে, টেনে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়েছে, নিজের হাতে মার্টিনি তৈরি করে দিয়েছে, গভীর আগ্রহের সাথে জানতে চেয়েছে বিদেশ-ভ্রমণ কেমন লাগল। কিন্তু লুবনা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ভিটোকে সে অভিযোগের সুরে জানিয়ে দিয়েছে, মেয়ের মন ভাল নেই, ও স্কুলে যেতে চায়, কিছু একটা ব্যবস্থা আর না করলেই নয়।

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়েছে ভিটো, বলেছে, 'ব্যাপারটা নিয়ে ডিনারের পর আলোচনা করব। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

মা-বাবা দু'জনেই যে স্নায়ুযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ডিনারে বসে সেটা টের পেয়ে গেল লুবনা। তার অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু পরিবেশ অনুমতি না দেয়ায় চুপচাপই থাকল। ডিনার শেষ হতে না হতেই উঠে দাঁড়াল সে, মা-বাবাকে চুমো খেল, অভিযোগের সুরে বলল, 'ঘরের ভেতর বসে থাকতে থাকতে আমার মাথা ধরে গেছে, আমি শুতে যাচ্ছি।'

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা পিছনে রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লুবনা।

খানিক পর নিস্তব্ধতা ভাঙলো লরা, 'গভর্নেসকে ওর পছন্দ নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল ভিটো। 'আসল সমস্যা সেটা নয়। ওর কোন বন্ধু নেই। আমরাও ওকে সঙ্গ দিতে পারি না। এই বয়সে মেয়েরা খেলতে চায়, বেড়াতে যেতে চায়। স্কুলে গেলে তবু বান্ধবীদের সাথে দেখা হত...' উঠে দাঁড়িয়ে বার-এর সামনে চলে এল সে, গ্লাসে খানিকটা কনিয়াক ঢেলে ছোট্ট করে চুমুক দিল। টেবিল পরিষ্কার করছে মেইড, তার বিদায় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হবার পর আবার সে মুখ খুলল, 'লরা, কিছু কিছু বিষয় আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমি চাই আলোচনাটা যেন যুক্তির বাইরে না যায়।'

চেহারায় বিরূপ কোন ভাব তো নেই-ই, স্বামীর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে লরা, চোখে কৌতুক মেশানো প্রশ্রয়।

লরার এইভাব লক্ষ্য করে মনে মনে শঙ্কিত হল ভিটো। বুঝল, তর্ক-যুদ্ধে জেতার জন্যে নিশ্চয়ই কোন কৌশল ঠিক করে ফেলেছে লরা। সেটা কি, বুঝতে না পেরে তার অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল।

'দুটো ব্যাপারে কথা বলতে চাই আমি,' গ্লাসে আরেকটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল ভিটো। 'এক, লুবনাকে স্কুলে পাঠাতে হবে। আর দুই, তোমার বাজে খরচ

কমাতে হবে।'

'আমার বাজে খরচ?' চোখের কৌতুক লরার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

'এ-মাসেই তুমি নতুন ডিনার সেট আর অ্যান্টিকস কিনে নব্বই লাখ লিরা খরচ করেছ—কোন মানে হয়?'

'কিন্তু ভিটো, বাজারে ওগুলো এই প্রথম এল, কিনব না?' বিস্মিত দেখাল লরাকে।

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল ভিটো। 'তার আগে আমাদের সামর্থ্যের কথা ভেবে দেখবে। তুমি তো জান ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে। শ্রমিক অসন্তোষের কারণে আমাদের প্রোডাকশন কস্ট অনেক বেড়ে গেছে, তার ওপর সস্তা বোটে ছেয়ে গেছে ওয়ার্ল্ড মার্কেট। এ-বছর যা প্রোডাকশন দিয়েছি তার সিকি ভাগও বিক্রি করতে পারব না। অনেক মিলিয়ন লিরা লোকসান দিতে হবে। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আমি একবারে ডুবে আছি।'

'কত লোন নিয়েছ?'

'বারো শো মিলিয়ন লিরা,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল ভিটো।

'বাবা বলত, একজন মানুষের ওজন বোঝা যায় তার সম্পদ দেখে, নয়ত তার দেনা দেখে। শুধু পরিমাণটাই আসল কথা।'

রেগে উঠল ভিটো। 'তোমার বাবা অন্য এক জগতে বাস করতেন। তোমার ভায়েরা সমস্ত দেনা শোধ করতে পেরেছিল বলে, নয়ত বেঁচে থাকলে তোমার বাবাকে দেশের সেরা দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হত।'

ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি নিয়ে লরা বলল, 'বাবার সময়জ্ঞান ছিল টনটনে, মরার সময় সেটা দেখিয়ে গেছে। আমার কি ধারণা জান? যে যত বড়, তার ভার সহ্য করার ক্ষমতাও তত বেশি। তুমি খুব বড় পরিবার থেকে এসেছ, দেশের সেরা ধনী পরিবারের একটা থেকে, মাত্র বারো শো মিলিয়ন লোন করে ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন?'

নিজেকে সামলে নিল ভিটো। 'ব্যাপারটা আর হালকা চোখে দেখার পর্যায়ে নেই, লরা। বাস্তবকে তোমার মেনে নিতে হবে। দু'এক মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট না হলে সত্যিই আমি খুব বিপদে পড়ব।'

স্থির হয়ে সোফায় বসে থাকল লরা। খানিক চিন্তা করে জানতে চাইল, 'তা কি করবে বলে ঠিক করেছ?'

খুব সাবধানে উত্তর দিল ভিটো। 'সমস্যার দুটো দিক। এক, ছোট বোটের একচেটিয়া বাজার আমরা হারাচ্ছি। প্রতিযোগিতা করতে হলে শৌখিন বড়লোকদের জন্যে দামি ইয়ট তৈরি করতে হবে। একমাত্র উপায় দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়ে চড়া দাম আদায় করা, সস্তাদরের বোটের বাজার যার খুশি দখল করুক গে।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল লরা, ভিটো থামতেই জানতে চাইল, 'বেশ, তাই কর, কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে?'

'ডকইয়ার্ড,' বলল ভিটো। 'লীজের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, কাজেই এটা ছেড়ে দিয়ে নতুন ডকইয়ার্ড ভাড়া নিতে হবে। নতুন কিছু মেশিনপত্রও দরকার হবে আমাদের। সব মিলিয়ে এখনি তিনশো মিলিয়ন লিরা চাই আমার।'

'কিন্তু ব্যাঙ্ক সাহায্য করতে চাইছে না?'

বার-এর দিকে ফিরল ভিটো, গ্লাসে আরও খানিকটা কনিয়াক ঢালল। স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল, 'এখানেই সমস্যার আরেক দিক। জমি ছাড়া ডকইয়ার্ডের সমস্ত কিছু এরইমধ্যে মর্টগেজ রাখা হয়েছে, এই বাড়ি আর রোমের অ্যাপার্টমেন্ট সহ। নতুন লোন আমাকে নিতেই হবে, অথচ মর্টগেজ রাখার মত আর কিছু নেই আমার। অন্য পথে চেষ্টা করছি, কিন্তু কতদূর কি করতে পারব জানি না।'

'লোরানের সাথে কথা বলেছ?'

'না,' মুহূর্তের জন্যে একটু অন্যমনস্ক দেখাল ভিটোকে। 'আগামী হপ্তায় একসাথে লাঞ্চ খাব আমরা, তখন আলোচনা হবে। লরা, আমি চাইছি, আমরা সমস্যায় পড়েছি এটা শুধু তুমি মনে রাখ।'

হাসিটা আবার লুবনার মুখে ফিরে এসেছে, তাতে বিদ্রূপের ছিটেফোঁটাও নেই। 'ভিটো, প্লীজ, আমাকেও খানিকটা কনিয়াক দাও।'

স্ত্রীর জন্যে ড্রিঙ্ক নিয়ে এগিয়ে এল ভিটো, তার পিছনে দাঁড়াল। হাতের গ্লাসটা রাখার জন্যে লরার কাঁধের ওপর দিয়ে টেবিলের দিকে ঝুঁকল সে। একেবারে স্থির বসে থাকল লরা, গ্লাসটা ছেড়ে দিয়ে তার চুলের ভেতর, গলার পিছনে চলে এল ভিটোর হাত। স্বামীর হাতের ওপর হাত রাখল লরা, তার আঙুলের ওপর চাপ দিল। মাথাটা ভিটোর পেটে ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে ওপর-নিচে ঘষতে লাগল সে।

ভুলে গেছে, সমস্যার কথা এখন আর ভাবছে না ভিটো।

দাঁড়াল লরা, চেয়ারটাকে পাশ কাটিয়ে একটু সরে এসে চুমো খেল ভিটোর চোখে আর গালে। ঠিক চুমো নয়, কোমল ঠোঁটের আলতো স্পর্শ মাত্র। ভিটো জানে, এভাবেই তাকে অস্থির করে তোলে লরা, অস্থির করে তুলে মজা পায়। সে যত ব্যগ্র হয়ে উঠবে, লরা ততই ধীর লয়ে উন্মুক্ত করবে নিজেকে। এটাই তার রীতি।

স্বামীর হাত দুটো নিজের হাতে আটকে রেখেছে লরা। ভিটোর গালে ঠোঁট বুলাতে বুলাতে বলল, 'চিন্তা কোরো না, লোরান একটা উপায় ঠিকই বের করবে।'

স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বেডরূমে এল লরা। বিছানায় উঠে অনেকক্ষণ একাই ব্যস্ত হয়ে থাকল সে। ভিটো যখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না, শুধু তখনই নিজেকে তার হাতে তুলে দিল সে।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে দম নিল ভিটো। কাপড় না পরেই নিচতলায় নেমে গেছে লরা, কনিয়াক আর সিগারেট আনার জন্যে। ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে আছে ভিটোর ঠোঁটে, স্ত্রীর কথা ভাবছে। প্রেম করার এই রীতি লরার একান্ত

নিজস্ব। সে-ই প্রথমে উদ্যোগী হয়, সে-ই গাইড করে, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত নারী-সুলভ আচরণ বিসর্জন দেয় না, একটু দেরিতে হলেও ঠিকই আত্মসমর্পণ করে। মিলন পর্ব সমাধা হলে নিজেকে ভিটোর নির্জীব, নিঃশেষিত বলে মনে না হলেও দুর্বল লাগে তার-- যেন একটা ভায়োলিন অতিরিক্ত বাজানো হয়েছে, ফলে ঢিল হয়ে গেছে তারগুলো।

এক হাতে বেলুন গ্লাসে কনিয়াক, আরেক হাতে সিগারেট নিয়ে ফিরে এল লরা। গ্লাসটা স্বামীর হাতে দিয়ে বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে দুটো সিগারেটে আগুন ধরাল সে। নিরাবরণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভিটোর মনে হল, এখনও ও যেন সদ্য ফোটা একটা গোলাপ, কিন্তু সবগুলো কাঁটাসহ। লরার ঘামের গন্ধ ঢুকল তার নাকে। বাস্তবে ফিরে আসতে মনের ওপর জোর খাটাতে হল ভিটোকে।

'লুবনা···,' খানিক ইতস্তত করে সরাসরি প্রসঙ্গটা পাড়ল সে, 'ওকে আবার স্কুলে পাঠানো দরকার। গভর্নেস বদলালেও বাড়িতে বসে ওর লেখাপড়া হবে না। বারোয় পা দিয়েছে ও, তাই না, কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে।'

বিছানায় উঠল লরা, স্বামীর হাতে একটা সিগারেট দিল। ভিটোকে অবাক করে দিয়ে বলল সে, শুধু বারোয় পা দেয়নি, দিনে দিনে আমাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে আর বাড়িতে আটকে রাখা চলে না। কালই তো লোরান আর অলিভার সাথে কথা হচ্ছিল। জান, ওরা আরাসিয়া আর কালডোকে জেনেভায় পাঠাচ্ছে। স্কুলটা নাকি খুব ভাল, লেখাপড়াও শেখানো হয় আমাদের ভাষায়। ইতালীর অনেক ছেলেমেয়ে পড়ে ওখানে।'

বসে পড়ল ভিটো। 'কিন্তু লরা, এর কোন মানে হয় না। লোরান দেশের একজন নামকরা লইয়ার, আমার মত শিল্পপতিকে দু'দশবার কিনতে পারে সে। বিদেশী ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা আছে তার। তাছাড়া, বছরে দু'একবার জেনেভায় এমনিতেও বেড়াতে যায় ওরা, ওদের ছেলেময়েরা ওখানে পড়তেই পারে। তাই বলে···'

শান্ত ভাবে সিগারেটে টান দিল লরা। তাকে বিচলিত হতে না দেখে আবার মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল ভিটো। 'ভিটো,' বলল লরা। 'আমি কি ঠিক করেছি, বলি তোমাকে। রোমের অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করে দেব আমরা। রোম আমার কাছে একঘেয়ে লাগে। ঠিক এই সময় ভাল দামও পাওয়া যাবে। ওই টাকা দিয়ে জেনেভায় একটা বাড়ি কিনব। মিলান থেকে প্লেনে মাত্র ত্রিশ মিনিটের পথ, কোনমতেই দূর বলতে পার না। মিলান থেকে গাড়িতে করে এখানে পৌছুতেও ওই আধ ঘন্টাই লাগে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভিটো, কিন্তু লরা থামল না। 'তাছাড়া, শীতের সময়টা তুমি এত বেশি বাইরে বাইরে থাক যে আমারও এখানে সময় কাটতে চায় না। জেনেভায় আমার সময় কাটানর কোন সমস্যা হবে না। হপ্তা শেষে মিলান থেকে

যাবে তুমি, লুবনাকেও আনিয়ে নেব…'

'লরা,' ধৈর্য হারিয়ে বাধা দিল ভিটো, 'তোমাকে আমি বলেছি রোমের অ্যাপার্টমেন্ট মর্টগেজ রাখা হয়েছে। ওটা যদি বিক্রি করি, সব টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। আর ভুলে যাচ্ছ, রোমের চেয়ে জেনেভায় বাড়ির দাম অনেক বেশি, প্রায় ডাব্‌ল।'

ব্যাপারটা হজম করতে অনেক সময় নিল লরা। এক সময় শুয়ে পড়ল সে, গায়ে চাদর টানল। 'ঠিক আছে, ভেবেচিন্তে অন্য কোন উপায় বের করতে হবে। আমার মেয়ের নিরাপত্তার দিকটা সবচেয়ে আগে দেখব আমি। ওকে আমি বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। মন্তে ফ্যাকন-এর ছেলের কি হল দেখলে তো! স্কুলের গেট থেকে তাকে ধরে নিয়ে গেল।' তার গলা চড়ল, 'স্কুলের গেট থেকে, ভর দুপুরবেলা! মিলানের মত শহরে! আশ্চর্য, তুমি কি তোমার নিজের মেয়ের নিরাপত্তার দিকটাও চিন্তা করবে না!'

অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল ভিটো। 'লরা, এসব নিয়ে আগেও আমরা আলোচনা করেছি। মন্তে ফ্যাকন মিলানের সবচেয়ে ধনী তিনজনের একজন। তোমার লুবনাকে কেউ কিডন্যাপ করতে যাচ্ছে না। এসব কাজ যারা করে তারা জানে কার আর্থিক অবস্থা কেমন যাচ্ছে।' শেষদিকে তার সুরে তিক্ততা প্রকাশ পেল। সে জানে, ব্যবসায়ী মহলে তার আর্থিক দুরবস্থার কথা গোপন নেই।

তর্ক ছাড়ল না লরা। যারা কিডন্যাপ করে তারা অ্যামেচার নয়। কিডন্যাপিং বিশাল এক জটিল ব্যাপার, শুধু প্রফেশনালরাই জড়িত। ইনফরমেশন পাবার বহু উৎস আছে ওদের। দেউলিয়া হতে বসেছে এমন বাপের মেয়েকে কিডন্যাপ করে ওরা সময় আর এনার্জি নষ্ট করবে না।'

'তাহলে বল টারকোর মেয়েটাকে কিডন্যাপ করা হল কেন?'

বেছে বেছে ঠিক প্রশ্নটাই করেছে লরা। আট বছরের টারকো নোবিলিকে ছ'মাস আগে কিডন্যাপ করা হয়। টারকো পরিবার নির্মাণ ব্যবসায় আছে, কিন্তু তাদের ব্যবসা মন্দা যাচ্ছিল। মেয়েটাকে দু'মাস আটক রাখা হয়, এই দু'মাসে কিডন্যাপাররা তাদের প্রথম দাবি এক বিলিয়ন লিরা থেকে নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত দু'শো মিলিয়ন লিরায় এসে ঠেকে। অনেক কষ্টে টাকাটা জোগাড় করে মেয়েকে উদ্ধার করে টারকো পরিবার। 'ওটা একটা আলাদা ব্যাপার ছিল,' বলল ভিটো। 'কিডন্যাপাররা ছিল ফ্রেঞ্চ, মার্সেলেস থেকে এসেছিল। টারকো পরিবার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত না তারা। তাছাড়া, ওরা ঠিক প্রফেশনালও ছিল না। টাকা পাবার দু'হপ্তার মধ্যে ধরা পড়ে যায়।'

'হয়ত তাই,' বলল লরা। 'কিন্তু বাচ্চা মেয়েটার একটা আঙুল কেটে নিয়েছিল ওরা, সেই থেকে বেচারি একটা মেন্টাল কেস হয়ে গেছে। তুমি চাও লুবনার সেরকম কিছু একটা হোক?'

এভাবে তর্ক করা কঠিন, ভিটোর রাগ বাড়তেই থাকল। স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। গায়ের চাদরটা গলা থেকে কোমরে নেমে এসেছে, চিত হয়ে শুয়ে থাকলেও লরার স্তনের আকৃতি বদলায়নি, গম্বুজের মত নিটোল আর নিভাঁজ। স্বামী তার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে পাশ ফিরে শুলো সে।

বলল, 'মিলানের স্কুলে লুবনাকে আমি পাঠাতে পারি, কিন্তু তার আগে ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কি বলছ?' ভুরু কুঁচকে উঠল ভিটোর।

'বডিগার্ড।'

'কি?' দু'হাতে ধরে স্ত্রীকে নিজের দিকে ফেরাল ভিটো।

'বডিগার্ড।' লরার চেহারা থমথম করছে। 'এমন একজন লোক, যে লুবনার সাথে সারাক্ষণ থাকবে, বিপদ থেকে রক্ষা করবে ওকে।'

স্ত্রীকে ছেড়ে ধপাস করে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল ভিটো। আলোচনাটা সম্পূর্ণ ভুল পথে এগোচ্ছে। 'লরা, এটা কোন যুক্তির কথা হল না। একজন বডিগার্ডের বেতন কত জান তুমি? আর বডিগার্ড রাখা মানে লুবনার দিকে কিডন্যাপারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা...'

'তুমি কি শুধু খরচার দিকটাই দেখবে? আমার লুবনার নিরাপত্তার চেয়ে তোমার কাছে টাকাটাই বড় হল?'

ভিটো বুঝল, এভাবে হবে না। কিভাবে কি বললে লরা বুঝবে, ভাবছে। লরার আচরণে এমন কিছু একটা লুকিয়ে আছে যার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না সে। শান্ত ভাবে যুক্তির পথে লরাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল এবার। 'আমার টাকা নেই, এটা তোমাকে মেনে নিতে হবে। এবার তুমিই বল, বডিগার্ড রাখার মত একটা বাজে খরচ কোত্থেকে আমি যোগাব?'

স্বামীর দিকে সরাসরি তাকাল লরা। 'কি ভাষার ছিরি! মেয়ের নিরাপত্তার জন্যে কিছু টাকা খরচ হবে, সেটা তোমার কাছে বাজে খরচ হয়ে গেল? কেন, ক্যাপরোট্টা পরিবার তাদের মেয়ের জন্যে বডিগার্ড রাখেনি? মোজারেলা, মন্টিনি, পোলেন্তা—এরা? এমনকি পভেলোরাও তাদের ছেলের জন্যে বডিগার্ড রেখেছে।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি করল ভিটো। লুবনার নিরাপত্তার দিকটাই বড় কথা নয়, ওদের ছেলেমেয়েদের জন্যে বডিগার্ড আছে, কাজেই তার মেয়ের জন্যেও একটা রাখতে হবে, তা না হলে ডাঁট বজায় থাকে না। শুধু হতাশ হল ভিটো তা নয়, অসহায় বোধ করল সে। জানে, এই জেদ থেকে এক চুল নড়ানো যাবে না লরাকে।

ক্লান্তবোধ করল সে। বলল, 'এ নিয়ে পরে কথা বলব আমরা।'

'এ-ব্যাপারে লোরানের সাথে কথা বলতে পার,' বলল লরা।

'এ-সব ব্যাপার ভাল বোঝে সে, লোকে তার কাছে পরামর্শ চায়।'

চোখ মেলে দ্রুত জানতে চাইল ভিটো, 'বডিগার্ডের কথা লোরানকে বলেছ তুমি?'

'না। তবে কাল লাঞ্চে বসে অলিভা বলল, মোজারেলা বডিগার্ড রাখার জন্যে লোরানের কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিল। সবাই জানে, সব ধরনের লোকের সাথে যোগাযোগ আছে লোরানের। ওর ফার্ম ছোট বড় কোন কাজই ফিরিয়ে দেয় না।'

ভিটো চুপ করে থাকল, চিন্তা করছে।

'কি, রাগ করলে?' স্বামীর গায়ের কাছে সরে এল লরা।

'না।'

'লোরানের সাথে তাহলে কথা বলবে?'

'ঠিক আছে।'

ভিটোর গলায় গাল ঘষল লরা। বিজয়ের আনন্দে আপন মনে হাসছে। জেনেভার কথা তুলে চমকে দিয়েছিল ভিটোকে, ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আর তাই দ্বিতীয় দাবিটা আদায় করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। নির্জীব সুইসদের মাঝখানে বসবাস করার কোন ইচ্ছেই তার নেই।

তিন

প্রেজো ফিসো বোর্ডিং হাউজ অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট।

ভোরের আলো মাত্র ফুটতে শুরু করেছে। প্রেজো ফিসোর মালিক, ভিটেলা রেমারিক, চোরের মত পা টিপে টিপে বারান্দা ধরে নিজের অফিস ঘরের দিকে এগোল। ত্রিশ বছর বয়স, সুঠাম স্বাস্থ্য, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। কিন্তু এই মুহূর্তে তার ভুরু কুঁচকে আছে, দৃষ্টিতে বিস্ময় মেশান উদ্বেগ। দূর থেকেই দেখা গেল, দরজা হাঁ-হাঁ করছে।

দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে, সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতর তাকাল। ভেতরের অস্পষ্ট আলোয় পরিষ্কার কিছুই দেখা গেল না। চারকোনা একটা কালো কাঠামো, ওটা নিশ্চয়ই ডেস্ক। লম্বা আরও একটা আকৃতি, ওটা আলমিরা। ডেস্কের সামনে কালো আরও একটা কি যেন রয়েছে—চেয়ার। ঘরের ভেতর থেকে ভারি নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ আসছে।

কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে থাকার পর ভিটেলা রেমারিক বুঝল, চেয়ারটা সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে কেউ একজন বসে আছে ওতে। আলো আরও একটু না ফুটলে লোকটাকে পরিষ্কার দেখা যাবে না। তারমানে এখানেই তাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

পজিটানো-য় অসুস্থ মাকে দেখতে গিয়েছিল ভিটেলা রেমারিক। রাত বারোটায় এখান থেকে তাকে ফোন করে ফুরেলা জানায়, একজন আগন্তুক

এসেছেন, নাম বলছেন ইমরুল হাসান, তার অনুমতি না নিয়েই মালিকের অফিস ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার দখল করে বসে আছেন।

ইমরুল হাসান! স্মৃতির পাতা উল্টে এই নামের কাউকে চিনতে পারেনি ভিটেলা রেমারিক। খানিক চিন্তাভাবনা করার পর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল তার মনে। আমি একটা বোকা, নিজেকে তিরস্কার করল সে। লোকটা অনুমতির ধার না ধেরে সোজা তার ঘরে ঢুকে পড়েছে, এ থেকেই কি তার পরিচয় বেরিয়ে আসে না?

এরপর অসুস্থ মাকে চুমো খেয়ে বেরিয়ে পড়ে সে।

দিনের আলো একটু একটু করে বাড়ছে, সেই সাথে পরিষ্কার হচ্ছে লোকটার চেহারা। উঁহুঁ, এ লোক মাসুদ রানা নয়। মুখ ভরা আধ ইঞ্চি লম্বা কালো দাড়ি, বাঁ চোখের নিচে আর কপালের ডান দিক ঘেঁষে দুটো কাটা দাগ, মাথাভর্তি এলোমেলো চুল, মুখটা ভরাট, চোখের নিচে পোঁটলা। ঘর থেকে ভুর ভুর করে হুইস্কির গন্ধ বেরিয়ে আসছে।

আজ পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে কি একটা মানুষ এত বদলাতে পারে? নাহ্, কোথায় সেই একহারা গড়ন, মেদহীন পেটা শরীর? চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে ওটা একটা পাঁড় মাতাল, কিন্তু ও জানে, মাসুদ রানা মদ স্পর্শ করে না। তাছাড়া, রানার চেয়ে এই লোকের বয়স অনেক বেশি—পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশও হতে পারে।

দিনের আলো পরিষ্কার হল। চেয়ারের পাশে হুইস্কির একটা খালি বোতলও এখন দেখতে পাচ্ছে ভিটেলা রেমারিক। একটা ভুল ভাঙলো তার, লোকটা ঘুমাচ্ছে না। চোখ জোড়া বড় বড়, ভারি পাতা, জানালা দিয়ে সাগর আর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

এই চোখ জোড়াই ভুল ভেঙে দিল তার। মায়াভরা এই চোখ কি ভোলা যায়! বয়স আর চেহারা মেলে না, তার কারণটাও পরিষ্কার হল। রানা ছদ্মবেশ নিয়ে আছে।

বন্ধুকে চিনতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেল ভিটেলা রেমারিক। এক নিমেষে বহু কিছু বুঝে নিল সে। হতভম্ব ভাবটা দূর হল, তার জায়গায় দেখা দিল সতর্কতা। ঘরে ঢুকল না সে, শুধু দোরগোড়ায় দাঁড়াল।

দিগন্তরেখায় তখন উঁকি দিচ্ছে নতুন সূর্য। সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকলেও আগেই টের পেয়েছে রানা, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। এবার সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরে চেয়ারের ওপর সিধে হয়ে বসল ও, বলল, 'আমি হাসান। কেমন আছ, দোস্ত?'

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রেমারিক। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল সে। বন্ধুর সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'সে তাহলে লুকিয়ে পড়েছে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'হ্যাঁ।'

দুই বন্ধু সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দেখছে। প্রথমে ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল সেই হাসি। বন্ধু বিপদে পড়েছে, এটুকু বুঝতে পেরেছে রেমারিক, সেজন্যে শরীরের সমস্ত পেশী টান টান হয়ে আছে তার। মুখে হাসি ফুটতে তাই একটু দেরি হল। পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা। বুকে বুক ঠেকিয়ে দু'জন দু'জনকে যেন পিষছে। কোন কারণ নেই, আবার আরেক অর্থে কারণের কোন অভাব নেই, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল রেমারিকের। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করল সে, 'কফি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কিন্তু ছেড়ে দেয়ার আগে লম্বা করা হাত দুটো বন্ধুর কাঁধে রেখে খুঁটিয়ে তাকে দেখল আরেকবার। তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে।

বোর্ডিং, রেস্তোরাঁ আর অফিস, বিল্ডিংটা এই তিন ভাগে ভাগ করা। অফিসের পাশে রেমারিকের জন্যে একটা শোবার ঘর আর খুদে একটা কিচেনও আছে। সেই কিচেনে এসে ঢুকল রেমারিক, ভারি উদ্বিগ্ন। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই রানার, এ থেকে বোঝা যায় ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছে। তার বন্ধু নিজেকে সুস্থ আর সবল রাখার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করত, অথচ আজ সে মদ খায়, শরীরে মেদ জমেছে। রেমারিক জানে, ইচ্ছে বা দরকার না হলে নিজের বিপদের কথা প্রকাশ করবে না রানা। ওদের বন্ধুত্বটা এমনই, রানা না বললে সে-ও কিছু জানতে চাইবে না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে অতীত রোমন্থন করল রেমারিক। রানার অনেক কিছুই জানে না সে, তার কাছে ও এক রহস্যময় চরিত্র। কিন্তু না জানা ব্যাপারগুলো তাকে কখনও বিরক্ত বা কৌতূহলী করে তোলে না। রানাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া সাতজন্মের ভাগ্য, সেটা পেয়েই কৃতজ্ঞ সে। মনে পড়ল, শেষবার দু'জনের দেখা হয়েছিল জেসমিনের মৃত্যুর পর।

তারপর পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। কি ঘটেছে এই পাঁচ বছরে?

সেবার দু'হপ্তা এখানে ছিল রানা, বরাবরের মত শান্ত আর চুপচাপ। কিন্তু রানার নিরুপদ্রব উপস্থিতি প্রয়োজনের সময় বরাবরের মতই শক্তি যুগিয়েছে তাকে, গিঁট দিয়েছে ছিঁড়ে যাওয়া সুতোয়।

পাহাড়ের পাশে, চূড়োর কাছাকাছি উঠে এসেছে সূর্য। অফিস ঘরে ফিরে এল রেমারিক। বাথরূমের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। জানালা দিয়ে দেখা গেল, নেপলস জেগে উঠছে। বে-তে নোঙর ফেলেছে একটা যুদ্ধ জাহাজ, আরও সামনে বিশাল একটা লাইনারের পিছন দিকটা দেখা গেল। টেবিলে ট্রে রেখে অপেক্ষা করছে রেমারিক।

বাথরূম থেকে বেরিয়ে এসে ডেস্কের পিছনের চেয়ারটায় বসল রানা। পট থেকে কফি ঢেলে দুধ চিনি মেশাল রেমারিক। চুপচাপ বসে কফির কাপে চুমুক

দিল দু'জন। দু'জনেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানাই, 'অসুবিধে করলাম?'

ম্লান একটু হাসল রেমারিক। 'মা। তার সেই রহস্যময় অসুস্থতা।'

'দু'একমাস পর পর হাঁটুতে আর কোমরে ব্যথা, হেঁটে চার্চে যেতে পারে না বলে কান্নাকাটি।' হাসছে রানা।

'হ্যাঁ।'

'বাত,' বলল রানা। 'নতুন একটা ওষুধ বেরিয়েছে, জেনেভা থেকে নিয়ে এসেছি আমি। ফেলে চলে এলে কেন?'

'আজ সকালে মিলান থেকে রিসো আসছে,' বলল রেমারিক। 'বলছ বটে বাত, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। যখনই মনে হয় তার প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে, তখনই এই অসুস্থতা দেখা দেয়। আমার জন্যে তেমন সমস্যা নয়, মাত্র চল্লিশ মিনিটের পথ। কিন্তু রিসোর বারোটা বেজে যায়।'

'কেমন আছে রিসো?'

'ভাল। গত বছর ওর কোম্পানি ওকে পার্টনার করে নিয়েছে। আরেকটা বাচ্চা হয়েছে ওর– ছেলে।'

আবার কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল ওরা। প্রশান্ত নিস্তব্ধতা, শুধুমাত্র দীর্ঘদিনের প্রিয় দুই বন্ধুর উপস্থিতিতেই সম্ভব, যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে মুখ না খুললেও ওদের চলে। লাইনারটা যখন প্রায় দিগন্ত রেখায় পৌঁছে গেছে, আবার কথা বলল রেমারিক। 'তুমি ক্লান্ত। এস, বিছানাটা দেখিয়ে দিই।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'আর তুমি? তুমিও তো সারারাত ঘুমাওনি।'

'লাঞ্চের পর ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে নিলেই আমার চলবে। কিছুদিন থাকতে পারবে তো, নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার কোন প্ল্যান নেই, রেমারিক। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল, চলে এলাম।'

মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। 'তাহলে তো ভালই। অনেকদিন পর এলে। কোন কাজের মধ্যে আছ?'

'ছ'মাস ধরে নেই। কর্সিকা থেকে সরাসরি আসছি আমি।'

দরজার দিকে হাঁটছিল ওরা, কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রেমারিক। 'ঢাকা থেকে নয়? সরাসরি দেশ থেকে আসছ না?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'না। কোন প্রশ্ন কোরো না। শুধু জেন, বন্ধু-বান্ধব কারও সাথে আমার কোন যোগাযোগ নেই। মার্সেলেসে এসে তোমার কথা মনে পড়ল, ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম।'

রেমারিকের চোখে ঝিক করে উঠল কৌতুক। 'ঝোঁকের মাথায়? তুমি?' হাসতে লাগল সে।

রানার মুখেও ক্লান্ত হাসি দেখা গেল। 'রাতে কথা হবে। তোমার সেই বিছানাটা কোথায়?'

কিচেন টেবিলে বসে আছে রেমারিক, বাজার থেকে ফিরে আসবে ফুরেলা, তার জন্যে অপেক্ষা করছে। বোর্ডিং সেকশনে ছয়টা কামরা, সারা বছর একটাও খালি থাকে না। রেস্তোরাঁটা এই এলাকায় বেশ নাম করেছে, লাঞ্চ আর ডিনারের জন্যে প্রচুর লোক আসে। চালু করেছিল জেসমিন। সাধারণ খাবার, কিন্তু চমৎকার রান্নার জন্যে তখনই সুনাম হয়ে যায়। রান্নার মানটা আজও বজায় আছে, তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে রান্নার সময় রেমারিক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করে। একবার যদি কেউ প্রেজো ফিসোতে খায়, দ্বিতীয়বার তার ফিরে না এসে উপায় নেই।

একা বসে বন্ধুর কথা ভাবছে রেমারিক। কিছু একটা ঘটেছে ওর। রহস্যময় একটা চরিত্র, ওকে বুঝতে পারা কোনদিনই সহজ ছিল না, কিন্তু তবু অন্যের চেয়ে সে ওকে ভালভাবে চেনে। যাই ঘটুক, এর সাথে মেয়েমানুষ জড়িত বলে তার মনে হল না। রানাকে কোনদিন মেয়েদের পিছনে ছুটতে দেখেনি সে, বরং মেয়েরাই ওর পিছনে ছোটে। মেয়েদের ব্যাপারে ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়াও ওর স্বভাব নয়। এমন অনেক মেয়ে দেখেছে রেমারিক, যারা রানা বলতে অজ্ঞান ছিল, কিন্তু সময় থাকতে তারা বুঝতে পারে, এ লোককে বাঁধনে জড়ানো সম্ভব নয়।

একটা মেয়ের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে রেমারিকের। এক লেডি ডাক্তার। 'ব্যাপারটা অনেকটা যেন ভুল চাবি দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা,' মেয়েটা একদিন বলেছিল রেমারিককে। 'তালায় ঢোকে, কিন্তু ঘোরে না।'

কথাটা শোনার পর জবাবে রানা শুধু বলেছিল, 'দোষটা তালার, সন্দেহ নেই।'

রেমারিকের নিজের কামরায় এখন ঘুমাচ্ছে রানা। খানিক আগে ওকে দেখে এসেছে রেমারিক। পাশ ফিরে শুয়েছিল রানা, গায়ের চাদরটা কোমরের কাছে জড় করা। চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থেকেছে সে। রানার গায়ে সত্যি বেশ মেদ জমেছে, শরীরে অনেকগুলো কাটা-কুটির দাগ। বেশিরভাগই পুরানো, রেমারিকের পরিচিত, দু'চারটে নতুন। তিন মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল রেমারিক, তার মধ্যে বেশ কয়েকবার পাশ ফিরেছে রানা। ওর মনে শান্তি নেই, বুঝতে পেরেছে রেমারিক, ঘুমের মধ্যেও অস্থিরতায় ভুগছে।

বন্ধু বিপদে পড়েছে, সেটাই রেমারিকের উদ্বেগের কারণ। কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে নিষেধ করে দিয়েছে ও। তারমানে কোন সাহায্য চায় না। না চাইলেও, কিভাবে সাহায্য করা যায় তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে সে। বাধা পড়ল ফুরেলা ফিরে আসায়, তার দুই বগলের নিচে দুটো বাস্কেট। মালিককে দেখে অবাক হয়ে

গেল সে। এই সময় মেইন কিচেন রূমে থাকার কথা রেমারিকের।

'আপনি এখানে?' টেবিলের ওপর বাস্কেট দুটো নামিয়ে রেখে জানতে চাইল ফুরেলা।

'অনেক দিনের পুরানো বন্ধু,' বলল রেমারিক। 'প্রথম দিন ওকে আমি নিজে রান্না করে খাওয়াব।' উঠে দাঁড়িয়ে বাস্কেটের ভেতর উঁকি দিল সে।

মালিককে দেখাবার জন্যে বাস্কেট থেকে ফল-পাকড়, তরিতরকারি, মাছ-মাংস ইত্যাদি নামাতে শুরু করল ফুরেলা। 'অসুস্থ মাকে ফেলে চলে এলেন। কি রকম বন্ধু?'

'সে তুমি বুঝবে না,' মুচকি হাসল রেমারিক। 'ও এখন আমার ঘরে ঘুমাচ্ছে।'

ফুরেলাকে কৌতূহলে পেয়ে বসল।

আজ চার বছর রেমারিকের কাছে আছে ছেলেটা। রেমারিকের গাড়ি থেকে ভিউ মিরর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় সে। রেমারিক তাকে প্রথমে বেদম মারধর করে, তারপর একশো একটা প্রশ্নের জবাব চেয়ে বসে। সে নিরাশ্রয় আর এতিম জানার পর রাস্তা থেকে তাকে তুলে নিয়ে এসে বোর্ডিঙে জায়গা দেয়, খেতে দেয় পেট ভরে। বিনিময়ে তাকে কোন কাজ করতে দেয়নি সে। কিন্তু দু'দিন পর ফুরেলা নিজেই ছোটখাট কাজে রেমারিককে সাহায্য করার আগ্রহ দেখায়। সেই থেকে রয়ে গেছে ছেলেটা।

তখনও ফুরেলা জানত না, আজও জানে না, সেই প্রথম দিন ফুরেলার মধ্যে নিজের ছেলেবেলা দেখতে পেয়েছিল রেমারিক।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ফুরেলার সাথে একই আচরণ করে আসছে রেমারিক—রূঢ়, কর্কশ, কোন রকম স্নেহ-ভালবাসা প্রকাশ পায় না। আর ফুরেলাও তার স্বভাব বজায় রেখেছে—উদ্ধত, ঘাড়-ত্যাড়া, মালিকের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। দু'জনেই জানে স্নেহ আর শ্রদ্ধার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কখনোই সে-সবের প্রকাশ ঘটে না। আশ্চর্য একটা সম্পর্ক, ইটালিয়ানদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। সময়ের সাথে সাথে রেমারিকের ডান হাত হয়ে উঠেছে ছেলেটা, সততা আর বিশ্বস্ততার অনেক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উতরে গেছে।

রেমারিকের কাছে এতদিন থেকেও তার অতীত সম্পর্কে কিছুই জানে না ফুরেলা। বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে রেমারিকের মা প্রেজো ফিসোতে আসে বটে, কিন্তু বুড়ি নিজের ছোট ছেলে রিসো, বড় ছেলের নিহত বউ জেসমিনের গল্প করেই থেমে যায়। বড় ছেলে রেমারিকের অতীত সম্পর্কে ভুলেও একটা শব্দ উচ্চারণ করে না। ফুরেলা জানে, রেমারিক অনর্গল আরবী বলতে পারে, আফ্রিকান দু'একটা ভাষাও তার জানা আছে, আর ফ্রেঞ্চ তো জানেই। বোঝা যায়, অনেক ঘাটের পানি খাওয়া লোক। প্রশ্ন করে জেনে নেবে, সে সাহস তার হয়নি কখনও। সম্পর্কটা

সেরকম নয়।

সেজন্যেই নতুন লোকের আগমন তাকে বিস্মিত করে তুলেছে। মাঝরাতের ঠিক আগের মুহূর্তে যখন কলিংবেল বাজল, সে ধরে নিয়েছিল রেমারিক তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। দরজা খোলার পর অচেনা লোকটাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে।

'রেমারিক আছে?' লোকটা জানতে চায়। কথায় নিয়াপলিটান টান পরিষ্কার।

কথা না বলে ফুরেলা শুধু মাথা নাড়ে।

'কখন ফিরবে সে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফুরেলা। লক্ষ্য করল, তার সহযোগিতা না পেয়ে লোকটা অবাক হয়নি।

'আমি অপেক্ষা করব,' বলে ফুরেলাকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে আগন্তুক, রিসেপশনে ঢুকে বোর্ড থেকে চাবি নিয়ে সোজা উঠে যায় দোতলায়। পিছু পিছু ওপরে উঠে এসে ফুরেলা দেখে অফিস কামরার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে লোকটা, চেয়ারে বসে পা দুটো লম্বা করে দিয়েছে। রাগ হয় ফুরেলার, ব্যাখ্যা দাবি করার ইচ্ছে জাগে, কিন্তু লোকটাকে তখন আর তার ভয় করছে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শহরের আলো দেখছিল লোকটা, এই জগতেই যেন নেই। কেন যেন ফুরেলার রাগ পানি হয়ে গেল। মৃদু সুরে সে জানতে চাইল, তার কিছু লাগবে কিনা।

'যদি থাকে,' বলল লোকটা। 'এক বোতল স্কচ।'

একটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে এল ফুরেলা। আরও খানিক চিন্তা-ভাবনা করে আগন্তুকের নাম জানতে চাইল সে।

'ইমরুল হাসান,' বলল লোকটা। 'তুমি?'

'ফুরেলা কালমাট। মালিকের আমি ডান হাত।'

বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে চুমুক দিল লোকটা। তারপর কটমট করে তাকাল ফুরেলার দিকে। 'যাও, শুয়ে পড়। আমি কিছু চুরি করব না।'

লাঞ্চ তৈরি করছিল ওরা, এই সময় ছেলেটাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ কথাটা বলল রেমারিক, 'ও বাংলাদেশী।'

'কে?'

একটা হাত তুলে সিলিঙের দিকে আঙুল তাক করল রেমারিক। 'আমার বন্ধু। হাসান।'

'কিন্তু উনি তো খাঁটি ইটালিয়ান বলেন।'

মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। 'আমি শিখিয়েছি।'

ফুরেলার বিস্ময় বাড়তেই লাগল। মালিকের এই নরম সুর তার কাছে সম্পূর্ণ

অপরিচিত। যে লোক ধমক আর হুমকি ছাড়া কথা বলে না, আজ সে তাকে গল্প শোনাতে বসেছে। কৌতূহলে মরে যাচ্ছিল ফুরেলা, কিন্তু নিজে থেকে কোন প্রশ্ন করেনি সে।

'আমরা দু'জন যুদ্ধে ছিলাম,' আবার বলল রেমারিক। 'বিয়ে করার পর যুদ্ধ ছেড়ে দিলাম আমি। সে আজ আট বছর আগের কথা।'

'যুদ্ধে ছিলেন?' বড় বড় হয়ে উঠল ফুরেলার চোখ। 'কোথায়?'

হাসছে রেমারিক। 'লেবাননে যুদ্ধ করেছি আমরা, মুসলিম ফিলিস্তিনীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। যুদ্ধ করেছি জিম্বাবুই-য়ে।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল ফুরেলা। 'কি বলছেন? ফিলিস্তিনীদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন? আপনি? একজন শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান? তারপর আবার স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে রোডেশিয়ায়? কালোদের পক্ষে?'

'কালো কি গোরা, মুসলিম কি খ্রিস্টান সে সব আমি বিচার করিনি,' বলল রেমারিক। 'আমি বিচার করেছিলাম ন্যায় কি অন্যায়। ভাড়াটে যোদ্ধা হিসেবে নাম লেখাই আমি। ভাড়াটে যোদ্ধারা ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না, যারা টাকা দেয় তাদের পক্ষেই যুদ্ধ করে। কিন্তু আমার বন্ধু আমার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধটা জাগিয়ে দেয়। তারপর থেকে আমি আর অন্যায়ের পথে যেতে পারিনি।' একটু থামল রেমারিক। তারপর চুপ হয়ে গেল।

অনেক কথা ভিড় করছে আজ তার মনে।

মারা গেছে বাবা। পনেরো বছরের সুন্দরী বোন, লম্পট সমাজপতিরা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ছয় বছরের ছোট ভাই, খিদের জ্বালায় সারা দিন ঘ্যান ঘ্যান করে বেড়ায়। কঙ্কালসার মা, অদৃষ্টে বিশ্বাসী, পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় চার্চে, যেন প্রার্থনা করলেই আকাশ থেকে রুটি পড়বে।

বোনটা একদিন পালিয়ে গেল। আর কোনদিন ফেরেনি সে। বহু বছর পর একদিন তার সাথে দেখা হয়েছিল রেমারিকের। কিন্তু দেখা না হলেই ভাল হত।

বোন পালাবার দু'দিন পর পেটে তিন দিনের খিদে নিয়ে এগারো বছরের রেমারিকও বাড়ি ছাড়ল। পঞ্চাশ কিলোমিটার হেঁটে নেপলসে চলে এল সে। জানে, নেপলস শহরে ধনী লোকজন আছে, আর তাদের টাকা পয়সা কেড়ে নেয়ার জন্যে আছে গুণ্ডা-বদমাশ, তারও একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

বুদ্ধি ছিল রেমারিকের। হাত পাতার সময় চোখে মরিচের গুঁড়ো ঘষে সাগর বইয়ে দিত, দুঃখ-দুর্দশায় ভরা এমন সব গল্প ফাঁদতো মহাকাব্যকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। তবু ভিক্ষা পাওয়া যেত না, আর ভিক্ষা না পেলে চুরি করত রেমারিক।

দেখা গেল চুরি বিদ্যায় হাত আর মাথা আরও বেশি খোলে রেমারিকের। তার

মত কয়েক শো ছেলের মধ্যে থেকে ছয়জনকে শিষ্য বানিয়ে একটা পোড়োবাড়িতে আস্তানা গাড়ল সে। নিজে থেকে সে যা শিখেছে, শিষ্যদের সেগুলো যত্নের সাথে শেখাল। মদের বোতল খালি হলে ধনীর দুলালরা উদার হয়ে পড়ে, ভিক্ষা চাওয়ার সেটাই উপযুক্ত সময়। আর ওরা যখন মেয়েমানুষের কাছে যায়, বিছানা যখন ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে থাকে, সেটাই চুরি করার আদর্শ সময়। শহরের প্রতিটি গলি উপগলি, বাঁক আর চৌরাস্তা মুখস্থ করে নিল রেমারিক। এভাবে সে টিকে গেল। সাগর ঘেঁষা রাস্তা ধরে প্রতি হপ্তায় পজিটানোয় যায় সে, পকেটে থাকে টাকা, হাতে চকলেট আর মাংসের টিন। রিসো আর খিদের জ্বালায় ঘ্যান ঘ্যান করে না। মা অবশ্য আরও ঘন ঘন চার্চে যাওয়া শুরু করেছে—তার ধারণা তার প্রার্থনার জবাবে ওপরওয়ালা মুখ তুলে চেয়েছেন।

যেখানে ক্ষুধা আর অভাব সর্বগ্রাসী, নৈতিকতা সেখানে পরাজিত সৈনিক। যে সমাজ জীবনের মৌল চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না তার আইনকে মানুষ বুড়ো আঙুল দেখাবেই। পজিটানোয় বসবাস করার জন্যে আর কখনও ফিরে যায়নি রেমারিক। নেপলস তার তীর্থস্থান হয়ে উঠল, এখানেই রয়েছে তার গুপ্তধন আর ভবিষ্যৎ। প্রথমে সে শুধু টিকে থাকার ধান্ধা করে বেড়াল। তারপর তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলল বুদ্ধি। পনেরো বছর বয়সে পৌছে রেমারিক দেখল, সমবয়েসী বারোজন শিষ্য রয়েছে তার, সবাই এক একটা পাকা চোর।

দিন বেশ ভালই কাটছিল, কিন্তু তবু মনে শান্তি ছিল না। তার একটা প্রতিজ্ঞা, পালিয়ে যাওয়া বোনকে সে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু কোথায় সে? মিলানে সে নেই, তাকে খুঁজে বের করতে শহরের প্রতিটি ইঁট শুধু খুলতে বাকি রেখেছে সে।

পচন মাথা থেকেই ধরে। তখনকার সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে দুর্নীতি, অন্যায় আর জুলুমের আশ্রয় নিল। ভাল মানুষদের ধরে ধরে জেলে ভরা হল, আর বের করে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল চোর-গুণ্ডা-বদমাশদের। সুসংগঠিত অপরাধী চক্র থাকা দরকার, তারা সাহায্য করবে সরকারকে। প্রায় রাতারাতি গোটা সমাজ চলে গেল অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে।

পেটে খিদে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত বেশ্যারা, তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে জমজমাট ব্যবসা শুরু হল। অনেক বছর পর আবার পুরোদমে মাঠে নামল সংঘবদ্ধ মাফিয়া। ছোট বড় সব ধরনের ব্যবসায়ীরা প্রস্তাব পেল, চুটিয়ে ব্যবসা করে যাও, আমরা প্রোটেকশন দেব, বিনিময়ে হপ্তায় হপ্তায় লাভের বখরা দিতে হবে। যারা রাজি হল তালিকায় নাম উঠল তাদের, আর যারা রাজি হল না তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, লাশ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল না।

এই নতুন ছকের সাথে খাপে খাপে মিলে গেল রেমারিক। সে আর তার

কিশোর দল গোটা কাঠামোর একটা অংশ হয়ে উঠল। আঞ্চলিক নেতারা তাকে চিনতে পারল, সম্ভাবনাময় একজন তরুণ হিসেবে গুরুত্ব পেল সে। ডকের পিছনে লাগিয়ে দেয়া হল তাকে, খুদে দোকানদার আর ব্যবসায়ীদের বোঝাতে হবে প্রোটেকশন না পেলে কেউ তারা বাঁচবে না। ডকের পিছনে ভাল কাজ দেখাল সে, পুরস্কার হিসেবে এবার গোটা ডকের দায়িত্ব দেয়া হল তাকে। সে আর তার দল শুধু চুরি নয়, আক্ষরিক অর্থেই লুটপাট শুরু করে দিল। বিদেশ থেকে যত কার্গো আসে, বাক্স খুলে অর্ধেক বের করে নেয় তারা। নিজের লাভের অংশ জমিয়ে একটা বাড়ি কিনল রেমারিক, সেটাই আজ প্রেজো ফিসো।

বাড়িটা মায়ের নামে কিনল রেমারিক, কারণ তখনও সে নাবালক।

এভাবে কেটে গেল আরও দুটো বছর। সতেরোয় পা দিল রেমারিক। ওপরমহল তার ওপর ভারি খুশি, নতুন আরও একটা সুযোগ এল তার হাতে। এবার মেয়েদের নিয়ে কারবার করতে হবে রেমারিককে। ডক এলাকায় মেয়েদের চাহিদা আছে, কিন্তু মেয়েদের জন্যে ভাল কোন আশ্রয়ের ব্যবস্থা নেই। ডকের কাছাকাছি গোটা একটা পাড়া খালি করতে হবে, বাইরে থেকে মেয়ে আমদানী করে ভরতে হবে ওই পাড়া। মনে মনে হিসেব করে খুশি হল রেমারিক, তিনগুণ বেড়ে যাবে তার রোজগার।

শুরু হল কাজ। শ'খানেক বাড়ি নিয়ে একটা পাড়া, খালি করা কম ঝামেলার কাজ নয়। কাজটা করতে গিয়ে উভয়পক্ষের কিছু লোক মারা গেল। তবে কাজটা দু'মাসের মধ্যেই শেষ করতে পারল রেমারিক। এবার মেয়ে জোগাড়ের পালা। দালালদের ডেকে সে জানিয়ে দিল, সুন্দরী মেয়ে চাই তার। ডক এলাকার লোকেরা মালদার মক্কেল, ভাল জিনিস দিয়ে ভাল পয়সা খসাতে চায় সে। দালালরা ব্যাপারটা বুঝল। মেয়ে না এনে তাদের ফটো তুলে নিয়ে এল তারা। রেমারিক নিজে বাছাই করুক, পরে যেন তাদের ঘাড়ে দোষ না চাপে।

মেয়েদের কয়েকশো ফটো দেখল সে, পছন্দও হল অনেককে। কিন্তু হঠাৎ একটা ফটো দেখে মাথা ঘুরে গেল তার।

ফটোটা হাতে নিয়ে আধ ঘন্টা বসে থাকল রেমারিক, এক চুল নড়ার শক্তি পেল না। ফটোর পিছনে মেয়েটার নাম লেখা রয়েছে, এমিলিয়া। ঠিকানাও আছে। তারমানে, ভাবল রেমারিক, বেলাডোনা নাম বদলেছে। তার মন ঠিকই গিয়েছিল, বরাবর কাছেপিঠেই ছিল সে। কিন্তু আশ্চর্য, তার চোখে একদিনও পড়ল না!

মনে মনে হিসেব করল রেমারিক। বেলাডোনার বয়স এখন একুশ বছর। কিন্তু ফটোতে দেখে মনে হয় ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। সেই ভরাট মুখে হাড় গজিয়েছে। গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট এখন বিবর্ণ। পটলচেরা চোখ এখন আধবোজা, ঢুলুঢুলু। ফটোটা ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে টেবিলে মাথা ঠুকতে লাগল রেমারিক। চোখ-মুখ বিকৃত করে অনেকক্ষণ ধরে ফোঁপাল।

পজিটানোয়, মার কাছে যাচ্ছে রেমারিক। অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে এল সে, এ-কথা কি করে বলবে মাকে? নিজের আস্তানায় নয়, ফটোর পিছনে লেখা ঠিকানা ধরে নেপলসের সবচেয়ে বড় বেশ্যাপাড়ায় চলে এল সে। নম্বর মিলিয়ে ছোট্ট একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। চোখ দুটো টকটকে লাল, উসকোখুসকো চুল, হাত-পা কাঁপছে।

মাত্র সন্ধে, এরই মধ্যে খদ্দেরদের ভিড় জমে উঠেছে গলির ভেতর। দু'বার হাত উঠিয়েও নামিয়ে নিল রেমারিক, নক করতে পারল না। এই এলাকায় কেউ তাকে চেনে না, এভাবে আরও কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে উপদ্রব ভেবে দালালরা ঘাড় ধরে পাড়া থেকে বের করে দিতে চাইবে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় নক করতে পারল রেমারিক। আওয়াজ হল, কিন্তু এত আস্তে যে ভেতরে কেউ থাকলে শুনতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

খানিক পর দরজা খুলে গেল। টলতে টলতে বেরিয়ে এল প্রৌঢ় এক লোক। রেমারিককে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটাল সে, সস্তা মদের গন্ধ ঢুকল তার নাকে।

'কে গো, নতুন মনে হচ্ছে?' ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজটা এল। সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু আগের চেয়ে ভোঁতা আর সুরটা অশ্লীল।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দর দর করে ঘামতে লাগল রেমারিক।

টলতে টলতে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল মেয়েটা। আলুথালু বেশ, এলোমেলো চুল, ঠোঁট জোড়া ফুলে আছে, চোখে নগ্ন আহ্বান। এ কে? একে তো রেমারিক চেনে না। ইচ্ছে হল দৌড়ে পালায়। কিন্তু নড়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে।

'বেলাডোনা!' বিড়বিড় করে বলল রেমারিক।

সাপ দেখার মত আঁতকে উঠল বেলাডোনা। 'কে?' দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে দরজার কবাট আঁকড়ে ধরল সে। চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, দৃষ্টিতে রাজ্যের অবিশ্বাস।

ছায়া থেকে আলোয় সরে এল রেমারিক। আরেকবার শিউরে উঠল বেলাডোনা।

ভাই-বোন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাইয়ের চোখে কান্না, বোনের চোখে আতঙ্ক।

'চল বাড়ি যাবে,' অনেকক্ষণ পর কথা বলতে পারল রেমারিক।

বেলাডোনার চোখে পলক নেই, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়ল সে।

ইতিমধ্যে ওদের দিকে চোখ পড়েছে লোকের। পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়াচ্ছে কেউ কেউ।

'ভেতরে আয়,' অস্ফুটে বলল বেলাডোনা।

মাথা নাড়ল রেমারিক, ভেতরে যাবে না সে। কিন্তু তারপরই কি মনে করে

এগোল। ঘরের মাঝখানে থেমে ঘুরল সে। দরজা বন্ধ করে রেমারিকের দিকে ফিরল বেলাডোনা।

'বসবি না? কেমন আছিস তোরা? মা…মা কেমন আছে? রিসো?'

'গেলেই দেখতে পাবে,' বিড়বিড় করে বলল রেমারিক। বোনের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সে, দেয়ালের দিকে তাকাল। নগ্ন, অর্ধনগ্ন মেয়েলোকের ছবি সাঁটা দেয়াল। চোখ নামিয়ে নিল সে।

'তা হয় না,' ছোট্ট করে বলল বেলাডোনা।

চমকে উঠে মুখ তুলল রেমারিক। 'মানে?'

'আমার আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।' বিস্ময় আর আতঙ্ক কাটিয়ে উঠেছে বেলাডোনা। তার চেহারায় একটা পাথুরে ভাব লক্ষ্য করে ঘাবড়ে গেল রেমারিক।

'কেন?'

'সে তুই বুঝবি না,' বলল বেলাডোনা। 'ওরা কেমন আছে বললি না?'

'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি,' জেদের সুরে বলল রেমারিক। লক্ষ্য করল, দরজার পাশের দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে বেলাডোনা, দেয়াল থেকে হাতটা একবারও নামায়নি।

'পাগলামি করিসনে,' শান্ত ভাবে বলল বেলাডোনা। এগিয়ে এল সে, একটু খোঁড়াচ্ছে। চেয়ারের পিঠ, খাটের স্ট্যাণ্ড ধরে কয়েক পা হাঁটল, তারপর বসল বিছানায়। তার পা দুটোর দিকে চোখ পড়ল রেমারিকের। জুতো পরে আছে বেলাডোনা।

'পাগলামি বলছ কেন? ফিরে যেতে অসুবিধে কি?'

রেমারিকের দিকে তাকিয়ে থাকল বেলাডোনা। কোন জবাব দিল না। হঠাৎ একটা হাত ভাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'আয়, কাছে বস।'

নড়ল না রেমারিক। 'তোমাকে এখুনি আমার সাথে যেতে হবে।'

'আয় না, বস,' আবার কাছে ডাকল বেলাডোনা।

'তুমি যাবে কিনা বল।'

'মা কেমন আছে রে?'

'ভাল। তুমি না গেলে আমি এখান থেকে যাব না।'

'রিসো?'

'পড়াশোনা করছে,' বলল রেমারিক। 'এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? কত খুঁজেছি তোমাকে…'

'জানি।' বেলাডোনার ঠোঁটে ম্লান হাসি।

'জানো?' হতভম্ব হয়ে গেল রেমারিক।

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম, তোকে দেখতে পেলেই গা ঢাকা দিতাম। মেয়েদের কাছে শুনতাম, বেলাডোনা নামে একটা মেয়েকে খুঁজছিস তুই।'

'কেন?' গলা বুজে এল রেমারিকের। 'কেন?'

'কেন সে তোকে বোঝানো যাবে না,' বলল বেলাডোনা। 'আমাকে পালিয়েই বেড়াতে হবে, রেমারিক। যদি না বসিস, চলে যা, ভাই। আর কখনও এদিকে আসবি না।'

'না।'

হাসতে লাগল বেলাডোনা। 'তুই সেই আগের মতই জেদি আছিস, নারে?'

'তুমি না গেলে আমি জোর করে তোমাকে নিয়ে যাব।'

রেমারিকের দিকে আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল বেলাডোনা। 'তোরা আমাকে ভুলতে পারিসনি, নারে?'

কি বলবে রেমারিক! তার চোখ থেকে টপ টপ করে পানির ফোঁটা পড়তে লাগল। নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত সুরে বলল সে, 'তোমার মালিক কে? তাকে ডাক। ক্ষতিপূরণ দিয়ে তোমাকে আমি এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব।'

'আমি যেতে চাই না, রেমারিক।'

'কেন?' চিৎকার করে জানতে চাইল রেমারিক।

'কেন?' পায়ের জুতো খুলে ফেলল বেলাডোনা। 'দেখ্।'

ঘা। বেলাডোনার দুই পায়ের তিনটে করে ছ'টা আঙুল নেই। ডান পায়ের পাতাও ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে। কুষ্ঠ, চিনতে পারল রেমারিক। এই রোগ আগেও দেখেছে সে।

চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে উঠল রেমারিকের। 'আমরা তোমার চিকিৎসা করাব।'

'এ যেন সারে,' বলে আবার জুতো পরল বেলাডোনা। 'এবার তুই যা, রেমারিক।'

নড়ল না রেমারিক। 'কবে থেকে?'

'তিন বছর পেরিয়ে গেছে।'

'ওষুধ?'

'কি লাভ!' ঠোঁট উল্টাল বেলাডোনা। 'সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে, কোথায় ওষুধ দেব?'

অনেকক্ষণ আর কেউ কথা বলল না। 'ঠিক আছে, আমি আবার কাল আসব,' নিস্তব্ধতা ভেঙে এক সময় বলল রেমারিক। 'তুমি আমার কাছে থাকবে। একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করব, তুমি আর আমি থাকব সেখানে। কারও সাথে তোমার দেখা হবে না, কেউ কিছু জানবে না। এতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'এ হয় না, রেমারিক।'

'কেন হয় না? এই রোগ হয়েছে জানলে লোকে তোমাকে ঘৃণা করবে, এই তো তোমার ভয়? কেউ জানবে না। কারও সাথে তোমার দেখাই হবে না।'

চুপ করে থাকল বেলাডোনা।

দরজার দিকে এগোল রেমারিক। দরজার কাছে এসে কি মনে করে ঘাড় ফেরাল সে। দেখল একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বেলাডোনা, যেন তাকে ছুঁতে চেয়েছিল। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে শুরু করতেই হাতটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়েছে।

ধীরে ধীরে ঘুরল রেমারিক। ভাইয়ের চোখে ধরা পড়ে গিয়ে মাথা নিচু করে নিয়েছে বেলাডোনা, ছুটে গিয়ে বোনের গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল রেমারিক। বেলাডোনার হাঁটুর ওপর মুখ রেখে ডুকরে উঠল। তার মাথায় একটা হাত রাখল বেলাডোনা, হাতের উল্টো পিঠে ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের পানি পড়ছে।

পরদিন বেলাডোনাকে নয়, তার লাশ নিয়ে এসে কবর দিল রেমারিক। রাতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে সে।

তিন দিন কাজে বেরুলো না রেমারিক। মা আর ভাইকে বেলাডোনার কথা কিছুই জানায়নি সে, ঠিক করল কোনদিন জানাবেও না। আরও দুটো সিদ্ধান্ত নিল রেমারিক। এক, নারী-ব্যবসার সাথে নিজেকে সে জড়াবে না, ডক এলাকায় কোন বেশ্যাপাড়াও তৈরি হতে দেবে না। দুই, কুষ্ঠ রোগীদের জন্যে একটা আশ্রম তৈরি করতে হবে তার।

ঘর-বাড়ি থেকে যাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, তাদেরকে ফিরে আসতে বলল রেমারিক। খবর পেয়ে মাফিয়া নেতা ব্যাখ্যা দাবি করে প্রতিনিধি পাঠাল। তার সাথে দেখাই করল না রেমারিক, লোক মারফত জানিয়ে দিল, ডক এলাকায় বেশ্যাপাড়া হবে না। হৈ চৈ পড়ে গেল আণ্ডারওয়ার্ল্ডে। কার এত সাহস নেতার আদেশ অমান্য করে? কে এই রেমারিক?

ঠিক এই সময় মাফিয়া নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। রেমারিকের ওপরওয়ালাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে, ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে কেউ কেউ, দেমাকে অনেকেরই মাটিতে পা পড়ে না। কে কত শক্তিশালী এটা প্রমাণ করার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। গোটা দেশ জুড়ে মাফিয়াদের একটা কাঠামো থাকলেও দুই যুগ আগের মত শক্ত আর নিরেট হয়নি তখনও। দক্ষিণের প্রবীণ নেতারা তখনও সবখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। শিল্পসমৃদ্ধ উত্তরে আর রোমে তারা সফল হলেও, নেপলসে তারা সুবিধে করতে পারছিল না। ইটালীর অবাধ্য শহর বলা হয় নেপলসকে, এখানের ক্রিমিন্যালরাও আর সবার চেয়ে এক কাঠি বাড়া। প্রবীণ মাতব্বররা সবশেষে নজর দিল নেপলসের দিকে।

ক্ষমতার ভাগ নিয়ে দুটো দলের লড়াই শুরু হল নেপলসে। যে-কোন একটা পক্ষ নিতে হবে রেমারিককে, এই পক্ষ নিতে গিয়েই জীবনের প্রথম ভুলটা করে বসল সে। গিডি নোচি নামে এক লোকের পক্ষ নিল সে। ডন নোচি নারী-ব্যবসা পছন্দ করে না, বেশ্যাদের প্রতি চিরকাল সহানুভূতি দেখিয়ে এসেছে সে, তার এই

গুণের জন্যেই রেমারিক তার সাথে হাত মেলাল। কিন্তু নোচি বুড়ো, প্রায় অথর্ব, বহু বছর জেল খেটে আত্মবিশ্বাস কমে গেছে তার। ফলে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারলেও রেমারিক আর তার দলের অপূরণীয় ক্ষতি হতে লাগল। নিচুস্তরের কর্মী বলে রেমারিকের দলকেই সামনে থেকে লড়তে হল। মাস কাটল না, দলের অর্ধেক সদস্য হয় খুন হল নাহয় দল ছেড়ে পালিয়ে গেল। শটগানের গুলি খেয়ে আহত হল রেমারিক, হাসপাতালে শুয়ে কাতরাতে লাগল ব্যথায়।

ওদিকে, তার আশা-ভরসা আর উদ্ধারকর্তা গিডি নোচি, ক্লান্ত এবং অসতর্ক, ফ্রিটো মিসটো খেতে বসে এক রেস্তোরাঁয় খুন হয়ে গেল। শোনা কথা, পুলিস নাকি তার মুখ থেকে ভাজা মাছ বের করে। আততায়ীকে দেখতেই পায়নি নোচি, শটগানের গুলিতে তার গোটা বুক গুঁড়ো হয়ে যায়।

এই পর্যায়ে ঘুম ভাঙে পুলিসের। দাপট দেখাবার জন্যে রাস্তায় নেমে আসে তারা। খবরের কাগজগুলো আর রাজনীতিকরা এসবের বিহিত দাবি করে বসে। শেষ পর্যন্ত বিজয়ীদের মধ্যে একটা শান্তি আলোচনার ব্যবস্থা হল। মাফিয়াদের তরফ থেকে উদ্যোগী হল ডন আতুনি বেরলিংগার, সরকারের পক্ষে আলোচনায় বসল পাবলিক প্রসিকিউটর। প্রমাণ আর সাক্ষী জোগাড় হল, নিচুস্তরের কিছু লোকজনকে ধরে হাজতে ভরল পুলিস। ভিটেলা রেমারিকও থাকল তাদের মধ্যে। বিচারে দু'বছরের জেল হয়ে গেল তার।

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর দু'মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকল রেমারিক। আর আমি জেলে যাব না, নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করল সে। ঠিক করল, মাস্তানি ছেড়ে দিয়ে দেখবে সৎভাবে বেঁচে থাকা যায় কিনা। মার নামে কেনা বাড়িটা খালি পড়ে ছিল, ঠিক করল ওটাকে বোর্ডিং হাউস বানাবে।

গত দু'বছরে শহরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে আতুনি বেরলিংগার। তার দলে কুখ্যাত সব মস্তানরা ভিড়েছে, পুলিস আর স্থানীয় সরকারের প্রভাবশালী অফিসাররাও এখন তার পকেটে। রেমারিক বুঝল, তাকে আবার নতুন করে শুরু করতে হলে বেরলিংগারের অনুমতি লাগবে। নেপলসে আত্মপ্রকাশ করল সে, বেরলিংগারের সাথে দেখা করার চেষ্টায় থাকল।

বেরলিংগার তখনও যুবক, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। আধুনিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অল্প যে-ক'জন নেতা উঠে এসেছিল, সে তাদেরই একজন। রক্তপাত ঘটিয়ে ক্ষমতায় এল বটে, কিন্তু চারদিক একটু গুছিয়ে নিয়েই বাস্তববাদী ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল সে। বুঝল, তার ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে গোটা দেশের সব মাফিয়া নেতাদের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে হবে তাকে। সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়ে সব বড় শহরে প্রতিনিধি পাঠাল সে। পালার্মো থেকে দূত এল তার কাছে, প্রভাব-বলয় আর ক্ষমতার আওতা নির্ধারণের জন্যে মীটিঙে বসার আমন্ত্রণ জানানো হল তাকে।

পোপ নির্বাচনে যে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়, সে-সব মীটিঙের আলোচনাও তেমনি গোপন রাখা হল। কার কতটুকু ক্ষমতা, প্রভাব-বলয়ের বিস্তৃতি, ইত্যাদি নিয়ে মতবিরোধ আর দ্বন্দ্ব দেখা দিল, কিন্তু নতুন করে কোন রক্তপাত ঘটল না। কালাব্রিয়ার পুরানো ঐতিহ্যের অনুসারীরা গোঁ ধরে বসল, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মিলান আর তুরিনের বস-রা যেন কোনভাবেই অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী না হয়। সবেচেয়ে বেশি শোরগোল তুলল নেপলস আর রোমের নেতারা, কারণ গত কয়েক যুগ ধরে তাদেরকে অবহেলা করা হয়েছে। তবে সবাই একমত হল যে গোটা দেশ জুড়ে শক্তিশালী একটা কাঠামো থাকা দরকার, নেতাদের নেতাও একজন থাকতে হবে, যার ক্ষমতা হবে সবার চেয়ে বেশি।

উত্তরের নেতারা কালাব্রিয়ানদের মধ্যে থেকে কাউকে চায় না, কালাব্রিয়ানরা উত্তরের কাউকে মেনে নেবে না। রোমের ডন পেসকাকে নরম বলে রায় দেয়া হল, আর রেলিংগারের বয়স কম।

এ-ধরনের পরিস্থিতিতে যা হয়, একটা আপোসরফায় আসতে হল সবাইকে। মীটিং আহ্বান করা হয়েছিল পালার্মো থেকে। পালার্মোর নেতা ডন বাকালাকে সাময়িকভাবে নেতাদের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হল। লোকটা মাঝারি আকৃতির, ঝানু একজন কূটনীতিক। কেউ জানত না, তার একটা প্রতিজ্ঞা ছিল, পালার্মোকে ক্ষমতার উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। লক্ষণগুলো দেখে ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে পরিষ্কার আঁচ করতে পারে সে। উপস্থিত কেউই তার কূটনৈতিক চাল পছন্দ করত না। রাজনীতিকদের সাথে তার অতিরিক্ত মাখামাখিও সন্দেহের চোখে দেখা হত। কিন্তু কেউই ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি, ডন বাকালা তার কূটনৈতিক চাল চেলেই আগামী আটটা বছর সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে। সবাই এ-কথা ভেবেই খুশি হল যে বেশ লম্বা একটা সময়ের জন্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সবার জন্যেই সেটা বিরাট লাভ হয়ে দেখা দেবে।

আতুনি বেরলিংগারের সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে মুগ্ধ হল রেমারিক। তার অফিস দেখেও প্রভাবিত হল সে। সম্পূর্ণ ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে লোকটা। দু'বছর আগের নিষ্ঠুরতা সত্যি অতীতের একটা কলঙ্ক মাত্র। যা ঘটবার ঘটে গেছে, ভুলে যাওয়াই ভাল, আশ্বাস দিয়ে বলল বেরলিংগার। পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। আরে না, রেমারিক নতুন করে ব্যবসা শুরু করলে কেউ তাকে বাধা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে রেমারিক যদি বোর্ডিং হাউসে মারিজুয়ানাও বিক্রি করে, নেতার অনুরোধ ফেলা হয়নি দেখে যারপর নাই খুশি হবে বেরলিংগার। মারিজুয়ানা কেনাবেচার জন্যে পুঁজি লাগলে তাও পেয়ে যাবে রেমারিক।

শর্তটা জুড়ে দেয়ায় একটু মনক্ষুণ্ন হলেও, আত্মবিশ্বাস নিয়েই ফিরে এল রেমারিক। ভাবল, ভাগ্যিস তাকে বেশ্যাপাড়া চালাতে বলেনি।

আসলে ডন বেরলিংগারকে চিনতে পারেনি রেমারিক। বেরলিংগার তাকে

ক্ষমা করেনি। বিরোধী পক্ষে রেমারিক আর তার দল ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক, বেশিরভাগ ক্ষয়-ক্ষতি ওদের দ্বারাই ঘটেছিল। সেই রেমারিককে ব্যবসা করে খেয়ে পরে বাঁচতে দেবে, বেরলিংগার সে লোকই নয়।

পালার্মো থেকে নির্দেশ ছিল, আঞ্চলিক গোলযোগ একেবারে কমিয়ে ফেলতে হবে। অতীত ঘটনার জের ধরে কোনরকম খুন-খারাবি চলবে না। বেরলিংগারের তখনও এতটা ক্ষমতা বা সাহস হয়নি যে ডন বাকালার নির্দেশ অমান্য করে। সহজ একটা উপায় আবিষ্কার করে সে। শুরু করুক রেমারিক। সময় আর সুযোগমত প্রোটেকশন প্রত্যাহার করে নেবে সে। যা করার, তার কাছ থেকে প্ররোচিত হয়ে পুলিসই সব করতে পারবে। বিচার বিভাগের সাথে তার দহরম-মহরম আছে, রেমারিককে লম্বা সময়ের জন্যে জেলের ঘানি টানানো কোন সমস্যাই হবে না।

একদিন রাত দুপুরে এল একটা টেলিফোন কল। কে ফোন করেছিল, আজও জানা হয়নি রেমারিকের।

গিডি নোচি আর আতুনি বেরলিংগার, দুজনকেই বাকিতে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ সরবরাহ করেছিল ভিনসেন্ট গগল নামে এক লোক। নোচি নিহত হওয়ায় পাওনা টাকা মার গেল গগলের। কিন্তু বিজয়ী বেরলিংগারের কাছ থেকেও টাকা পেল না সে। গগলকে সাধারণ একজন স্মাগলার মনে করে টাকাটা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল বেরলিংগার। কেউ ঠকালে বা শত্রুতা করলে সরাসরি আঘাত করা গগলের স্বভাব নয়। কারও সাথে প্রকাশ্যে বিরোধে জড়িয়ে পড়াও তার অপছন্দ। বেরলিংগার টাকা দিতে অস্বীকার করায় কোন প্রতিবাদই করল না সে। শুধু ঘটনার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল আর অপেক্ষায় থাকল সুযোগের।

অবৈধ অস্ত্রের যোগানদার হিসেবে নোচি আর বেরলিংগার, দু'পক্ষের লোকজনদেরই চিনত গগল। এদের মধ্যে নোচির দলের রেমারিক তার দৃষ্টি কাড়ে। রেমারিক কোত্থেকে কোথায় উঠেছে, তারপর কোথায় নেমে গেল, সব খবরই জানা ছিল তার।

নানা দেশে ব্যবসা আছে গগলের, সবখানে ঘুরে বেড়াতে হয়, তবু হাতে সময় পেলেই ইতালীতে ছুটি কাটাতে আসে সে। আর এলেই সংশ্লিষ্ট সবার খোঁজ-খবর নেয়। রেমারিক সম্পর্কে আরও কিছু খবর পেল সে। বেরলিংগারের সাথে দেখা করেছে রেমারিক, আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে ছেলেটা।

নিজের ব্যবসা বা ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বন্ধু মাসুদ রানার সাথে কখনও আলোচনা করেনি গগল, তবে রানা কি ধরনের কাহিনী শুনতে পছন্দ করে সেটা তার খুব ভাল জানা আছে। বেরলিংগার টাকা দিতে অস্বীকার করার পর রানার সাথে দেশে-বিদেশে অনেকবারই দেখা হয়েছে গগলের। গল্পচ্ছলে রানাকে

সে রেমারিকের কথাও বলেছে।

যাকে নিয়ে এত আলোচনা, সেই রেমারিক কিছুই জানল না, কিন্তু বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট এবং রানা ইনভেস্টিগেশনের চীফ মাসুদ রানা তার সম্পর্কে যা কিছু জানার প্রায় সবই জেনে ফেলল। বিমুখ পরিস্থিতির সাথে একা লড়ে রেমারিক অনেক ওপরে উঠেছে, এটা রানার ভাল লাগে। মাফিয়া নেতার কাছ থেকে নারী-ব্যবসা করার নির্দেশ পেয়েও সেটা অমান্য করার সাহস দেখিয়েছিল রেমারিক, এই ঘটনা রানার মনে একটা ছাপ ফেলে। কেন যেন রানার মনে হয়, ওখানে একজন সৎ যুবক সুযোগের অভাবে সৎ পথে আসতে পারছে না। গগলের সাথে দেখা হলে কথা প্রসঙ্গে দু'একবার জানতে চেয়েছে ও, তোমার সেই রেমারিকের খবর কি?

গগল একবার জানাল, 'বেরলিংগার তাকে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছে। তবে আমার ধারণা, সুযোগমত ঠিকই ছোবল মারবে সে।'

একটু চিন্তা করে রানা বলেছিল, 'ওর কোন সাহায্য লাগলে আমাকে জানিও। ছেলেটাকে আমার ভাল লেগেছে।'

ব্যস, এই পর্যন্তই। এরপর অনেকদিন গগলের সাথে দেখা হয়নি রানার, রেমারিকের কথাও ভুলে গেছে ও।

ব্যবসার কাজে আবার একবার মিলানে এল গগল। বেরলিংগারের দলের ভেতর নিজের লোক আছে তার, তাকে ডেকে ভেতরের সব খবর সংগ্রহ করার সময়ই সে জানতে পারল, রেমারিককে শায়েস্তা করার জন্যে প্রোটেকশন প্রত্যাহার করে নিচ্ছে বেরলিংগার। আজ রাতেই তার বোর্ডিং হাউসে হানা দেবে পুলিস।

ইনফরমারকে বিদায় করে দিয়ে চিন্তা করতে বসল গগল। রেমারিকের প্রতি সহানুভূতি জাগল তার মনে। ভাবল, রেমারিককে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে দিতে পারলে বেরলিংগার একটা চোট খাবে। কিন্তু রেমারিককে কোথায় সরাবে সে?

এই সময় রানার কথা মনে পড়ে গেল গগলের। মিলানে রানা ইনভেস্টিগেশনের শাখা আছে, কিন্তু ফোন করে সেখানে রানাকে পাওয়া গেল না। কোথায় পাওয়া যাবে ওকে, তাও বলতে পারল না শাখাপ্রধান। রিসিভার নামিয়ে রাখবে গগল, এই সময় অপরপ্রান্ত থেকে জানতে চাওয়া হল, 'মি. রানাকে কি দরকার?'

'না, মানে রেমারিক নামে এক যুবককে...'

'আপনি কে বলছেন?'

নিজের পরিচয় দিল গগল।

অপরপ্রান্ত থেকে জবাব এল, 'রেমারিককে আমাদের ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিন। বস্ তার সম্পর্কে অনেক দিন আগেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। রেমারিক এখানে পৌঁছুতে পারলে তার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের।'

এই প্রথম গগল উপলব্ধি করে, গোটা ইউরোপ জুড়ে রানা ইনভেস্টিগেশন কেন এত নাম করেছে। দায়িত্ব, তা সে যত নগণ্যই হোক, ছোট করে দেখে না ওরা। রানার আচরণও তার মনে শ্রদ্ধার একটা ভাব এনে দিল। রেমারিককে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়ে সেটা ভুলে যায়নি ও, নিজের লোকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়ে রেখেছে।

এরপর গগল ফোন করে রেমারিককে। নিজের পরিচয় না দিয়ে তাকে সে জানায়, 'বেরলিংগার প্রোটেকশন প্রত্যাহার করেছে। এক ঘন্টার মধ্যে রওনা হচ্ছে পুলিস।'

রেমারিক জানতে চায়, 'আপনি কে বলছেন?'

'একটা ঠিকানা দিচ্ছি। নিজের ব্যবস্থা নিজে যদি না করতে পার, এই ঠিকানায় গেলে ওরা তোমাকে সাহায্য করবে,' ঠিকানাটা জানিয়ে কানেকশন কেটে দিল গগল।

এই রকম একটা বিপদের জন্যে তৈরি ছিল না রেমারিক। কয়েক মিনিট পাথর হয়ে বসে থাকল সে। বেরলিংগারের শত্রুর অভাব নেই, সম্ভবত তাদেরই কেউ ফোন করেছিল। কিন্তু যেচে পড়ে সাহায্য করতে চাওয়ায় মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। ঠিকানাটার ওপর আরেকবার চোখ বুলাল সে। একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের ঠিকানা, প্রতিষ্ঠানটার নাম অনেকের মুখে শুনেছে সে।

বেরলিংগার তাকে ক্ষমা করেনি এটা পরিষ্কার। তার কি করার আছে ভাবল রেমারিক। গা ঢাকা দিতে পারে, কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়। হয় বেরলিংগার, নয় পুলিস শেষ পর্যন্ত তাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। লড়তে পারে সে, কিন্তু জেতা সম্ভব নয়। আরেক উপায় দেশ ত্যাগ করা। কিন্তু ডক এলাকায় বেরলিংগারের লোকজন যারা কাজ করছে তারা সবাই চেনে তাকে। জাহাজে ওঠার আগেই ধরা পড়ে যাবে সে। পাসপোর্টও নেই।

আবার তাকে জেলে যেতে হবে?

না। তারচেয়ে এই ঠিকানায় গিয়ে দেখবে সে। যদি ফাঁদ হয়, মেনে নেবে কপালের লিখন।

মাকে চিঠি লিখল রেমারিক। সৎ একজন উকিলের ঠিকানা দিল চিঠিতে। লিখল, এই উকিলের মাধ্যমে বোর্ডিং হাউসটা ভাড়া দিতে হবে, ভাড়ার টাকা দিয়ে ভরণপোষণ আর রিসোর লেখাপড়ার খরচ চালাতে হবে। সবশেষে লিখল, আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হচ্ছে, কবে ফিরব ঠিক নেই।

পকেটে কিছু টাকা নিয়ে একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল রেমারিক।

ওর মা পরদিন ছেলের চিঠি পেল। চিঠি পড়ে চার্চে গেল সে। সারাটা দিন প্রার্থনার মধ্যে কাটাল।

রানা ইনভেস্টিগেশনের মিলান শাখা তিন দিন লুকিয়ে রাখল রেমারিককে।

এই তিনদিনে পাসপোর্ট এবং দরকারি আরও কিছু কাগজপত্র তৈরি হল তার জন্যে। তাকে প্রস্তাব দেয়া হল, পৃথিবীর যে-কোন দেশে যেতে পারে সে, বেছে নিতে পারে যে-কোন ধরনের পেশা। এই ফার্ম তাকে বিনা ফি-তে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করবে। প্রশ্নটা চেপে রাখতে পারেনি রেমারিক—কিন্তু কেন? আমি তো তোমাদের কোন উপকার করিনি? আমার জন্যে এত কিছু…? শাখা প্রধান মুচকি হেসে বলেছে, আমাদের চীফের নির্দেশ, তার বেশি আমি নিজেও কিছু জানি না।

এই উত্তরেই সন্তুষ্ট থাকতে হল রেমারিককে। অনেক ধরনের চাকরির কথা বলা হল তাকে—বডিগার্ড, সিকিউরিটি গার্ড, ইনফরমার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চেকার, সেলসম্যান, মেসেঞ্জার, ভাড়াটে সৈনিক। ভাড়াটে সৈনিক? যুদ্ধ? কোথায়?

রেমারিককে বলা হল, আগে ট্রেনিং নিতে হবে, ট্রেনিং শেষ হলে যেখানে খুশি ভাড়ায় গিয়ে যুদ্ধ করতে পারবে সে। আগ্রহী হয়ে উঠল রেমারিক। সে দুর্বল, ভয় পেয়ে পালাচ্ছে—ট্রেনিং নিয়ে একজন যোদ্ধা হতে পারলে মন্দ হয় না। তাহলে আলজিয়ার্সে যেতে হবে তাকে। ওখানে একটা ট্রেনিং সেন্টার আছে, ট্রেনিং দিয়ে সৈনিক বানানো হয়। কিন্তু সেই সাথে সাবধান করে দেয়া হল—এ বড় কঠিন জীবন, প্রতিপদে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। গায়ে মাখল না রেমারিক।

মিলান থেকে নিরাপদেই প্লেনে চড়ে আলজিয়ার্সে চলে এল ও। মিলান এয়ারপোর্টে বেরলিংগারের একাধিক লোককে ঘুর ঘুর করতে দেখল সে, কিন্তু ছদ্মবেশ নিয়ে থাকায় ওকে দেখেও তারা কেউ চিনতে পারল না।

ট্রেনিং সেন্টারটা মরুভূমির মাঝখানে। দেড় মাসের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল রেমারিক। শুধু যে খাপ খাইয়ে নিল তাই নয়, সে আর তার ইন্সট্রাক্টর দু'জনেই আবিষ্কার করল, যুদ্ধ-কৌশল দ্রুত রপ্ত করার ব্যাপারে সে একটা প্রতিভা। একবার দেখিয়ে দিলেই যে-কোন ড্রিল বা রণ-কৌশল হুবহু অনুকরণ করতে পারে সে। টার্গেট প্র্যাকটিসে সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। তার তৈরি অ্যামবুশে সম্ভাব্য সমস্ত ফ্যাক্টর বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়, কোথাও কোন খুঁত থাকে না। তার চিন্তা-ভাবনা অঙ্কের নিয়মে বাঁধা, ঝুঁকি নেয়া চলে কিনা অঙ্ক কষে বের করে ফেলে।

এই ট্রেনিং সেন্টারে দু'জন লোকের সাথে দেখা হল রেমারিকের, দু'জনেই তাকে ভালভাবে চেনে, কিন্তু রেমারিক তাদের একজনকেও চিনতে পারল না। একজন ভিনসেন্ট গগল, অপরজন মাসুদ রানা।

ট্রেনিং চলাকালে বেশ কয়েকবারই সেন্টারে এল গগল, প্রতিবার আধুনিক অস্ত্রপাতি আর গোলাবারুদ নিয়ে এল সে। আর রানা এল ট্রেনিং শেষ হয়ে যাবার পর, ওদের বিদায় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে।

অনুষ্ঠানের মাত্র এক ঘন্টা আগে উপস্থিত হল রানা। রেমারিক লক্ষ করল,

তাদের ব্যাচের আট দশ জন যুবক এই নতুন আগন্তুককে ঘিরে ধরে প্রবল উৎসাহে কুশলাদি জানতে চাইছে। প্রায় সমবয়েসী, সুদর্শন, চেহারায় এমন অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে যে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে পারা যায় না। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না, সুযোগ পেলেই একা থাকতে ভালবাসে, কারও দিকে মাত্র একবার তাকিয়েই যেন তার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পায়। আগন্তুক সম্পর্কে প্রচণ্ড কৌতূহল জাগল রেমারিকের মনে। কিন্তু একে তাকে প্রশ্ন করে বিশেষ কিছু জানতে পারল না সে। শুধু জানল, আগন্তুক নয়জন যুবককে নিজের খরচে এখানে ট্রেনিং নিতে পাঠিয়েছিল, ট্রেনিং শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন তাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছে।

অনাড়ম্বর বিদায় অনুষ্ঠান শেষ হল। তখনও রেমারিক ঠিক করতে পারেনি কোথায় যুদ্ধ করতে যাবে সে। হঠাৎ আগন্তুককে দেখে তার সামনে দাঁড়াল সে, বলল, 'বলতে পার, যুদ্ধ করতে কোথায় আমার যাওয়া উচিত?'

'রোডেশিয়ায়,' সাথে সাথে জবাব দিল রানা। 'কিংবা লেবাননে। যদি ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করতে চাও। আমার বন্ধুরা এখানে যারা ট্রেনিং শেষ করেছে, দু'ভাগে ভাগ হয়ে লেবানন আর রোডেশিয়ায় যাচ্ছে ওরা। তুমি যে-কোন একটা দলের সাথে ভিড়ে যেতে পার।'

'তোমার নামটা আমার জানা হয়নি...'

'মাসুদ রানা।'

আর কোন আলাপের সুযোগ হল না, রানাকে নিয়ে তার বন্ধুরা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল।

পরদিন আরও চারজনের সাথে রওনা হল রেমারিক। গন্তব্য রোডেশিয়া। উদ্দেশ্য মুক্তিপাগল কালোদের সাথে স্মিথ সরকারের শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

সে যুদ্ধের স্মৃতি চিরকাল স্মরণ থাকবে রেমারিকের। মুক্তিবাহিনীর মধ্যে একমাত্র শ্বেতাঙ্গ ছিল সে, তাতে করে আশ্চর্য সব সুবিধে ভোগ করার সুযোগ এসে যায় তার। বার কয়েক শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের হাতে ধরা পড়েও তাদের ভুল বুঝিয়ে নিজেকে মুক্ত করে আনে সে।

তিনমাস পর মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিল রানা। রেমারিকের কৃতিত্বের খবর শুনে তাকে নিজের ইউনিটে টেনে নিল ও। এখানেই পরস্পরকে চিনতে শুরু করল ওরা, ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল বন্ধুত্ব।

রোডেশিয়ায় যুদ্ধ করার সময় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল রেমারিক। তার মহত্ত্ব, তার আত্মত্যাগ, তার বুদ্ধি আর সাহস তাকে একটানে তুলে নিয়ে এল রানার পাশে। কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হল সে। এমন কিছু ঘটনা ঘটল, ব্যক্তিগতভাবে রেমারিকের প্রতি চিরঋণী হয়ে থাকল রানা। আক্ষরিক অর্থেই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রানাকে ছিনিয়ে আনল রেমারিক। সেই রকম রানাও

রেমারিককে নতুন জীবন দান করল, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে শত্রুঘাটি থেকে বন্দী রেমারিককে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

পরস্পরকে সাহায্য করতে পেরেছে বলেই বন্ধুত্ব হল, ব্যাপারটা তা-ও ঠিক নয়। চরিত্রগত কিছু মিলও ছিল, মিল ছিল জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে, রুচিতে-অরুচিতে, আহারে-বিহারে। রানার কোন অহঙ্কার নেই, রেমারিকেরও নেই। শেখার আগ্রহ রেমারিকের জন্মগত, রানারও তাই। দু'জনের কেউই অন্যায় সহ্য করতে পারে না।

ইতিমধ্যে রেমারিকের সব কথা জানা হয়ে গেছে রানার। মা আর ভাই কেমন আছে জানে না রেমারিক, লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের পানিতে বালিশ ভেজায়। একদিন বেলাডোনার করুণ পরিণতির কথাও জানল রানা। জানল, আতুনি বেরলিংগার রেমারিকের সবচেয়ে বড় শত্রু। মুখে কিছু বলল না রানা, কিন্তু মনে মনে ঠিক করল, রেমারিককে আবার তার সমাজে ফিরে যেতে সাহায্য করবে ও। তাকে ও সুখী দেখতে চায়।

দেশের কাজে ঢাকায় ফিরে যেতে হল রানাকে। দেশ থেকে আবার বেরুল রানা, চলে এল ইটালীতে, কিন্তু রেমারিক সে খবর জানল না। ইটালীতে এসে মাফিয়া নেতারা কে কোথায় কি অবস্থায় আছে খোঁজ-খবর নিল রানা। আতুনি বেরলিংগার সম্পর্কে জানল, হাতে আরও টাকা আর ক্ষমতা আসায় নিজের হেডকোয়ার্টার নেপলস থেকে রোমে সরিয়ে নিয়ে গেছে লোকটা। নেপলসের বিধাতা এখন অন্য একজন ডন, যদিও বেরলিংগারেরই লোক সে। উত্তর থেকে এসেছে লোকটা, এখানকার অতীত সম্পর্কে তার বিশেষ কোন আগ্রহ নেই।

মাফিয়া মহলে প্রভাবশালী দু'একজন নেতার সাথে পরিচয় ছিল রানার। তাদের একজনের সাথে দেখা করল ও। দীর্ঘ আলাপের পর রানাকে কথা দেয়া হল, ভিটেলা রেমারিক আবার নেপলসে ফিরে এসে বসবাস শুরু করলে বেরলিংগার বা আর কেউ তাকে কোন রকম বিরক্ত করবে না।

তখন লেবাননে যুদ্ধ করছে রেমারিক, তাকে নিয়ে আবার নেপলসে ফিরে এল রানা। মার নামে কেনা বাড়িটা অক্ষতই আছে, একটা চার্চকে ভাড়া দেয়া হয়েছে সেটা। কুমারী মাতারা থাকে সেখানে। পজিটানোয় মা আর ভাইয়ের সাথে দেখা করতে গেল রেমারিক, সাথে রানা। ওরা ভাল আছে, সে-খবর রানার কাছ থেকে আগেই পেয়েছিল রেমারিক।

রিসো, তার ছোট ভাই, রোম ইউনিভার্সিটির শেষ বর্ষের ছাত্র তখন, ইকনমিক্স্ পড়ছে সে। মার বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও খটখটে। ছেলের ফিরে আসা উপলক্ষে চার্চে গেল সে, বারোটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে এল।

ব্যস, এখানেই রেমারিকের সৈনিক জীবনের ইতি হল। এরপর মাল্টায় গেল ও রানার সাথে, বিয়ে করল। বউ নিয়ে এখানেই ফিরে এসেছিল ও।—মস্ত একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমারিক। কী হতে পারত, আর কী হয়ে গেল! জীবনটা কী!

চার

ভিটো আভান্তি তার আইনবিদ বন্ধু আলবারগো লোরানকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে বসেছে। প্রথমশ্রেণীর রেস্তোরাঁ গিদা'স, মিলানে কখনও এলে এখানেই ডিনার খায় সোফিয়া লোরেন।

ফ্লোরেনটিনার অর্ডার দিল লোরান। ফ্লোরেনটিনা গিদা'স-এর স্পেশাল। জিনিসটা গ্রিল্ড স্টেক, ফ্লোরেনটিনা পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়—তেল, রসুন, পার্সলি শাক, মরিচ আর শূকরের মাংস দিয়ে। এক বোতল স্কচ হুইস্কির জন্যে বলা হল।

আলবারগো লোরান স্থূলদেহী, কিন্তু চটপটে। বয়স চল্লিশ এখনও পেরোয়নি অথচ গোটা দেশে আইন-ব্যবসায়ী হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্মুখেরা অবশ্য বলে, লোরান মামলায় জেতে ঝানু উকিল বলে নয়, বিচার বিভাগের হোমরাচোমরাদের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে। লোরান কিন্তু এ-সব অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করে না। তবে মাফিয়াদের সাথে তার যে ভাল যোগাযোগ আছে তা সে প্রকাশ্যেই বলে বেড়ায়। এরই মধ্যে বেঢপ আকৃতির একটা ভুঁড়ি বাগিয়েছে সে, মাথার পিছনে উঁকি দিতে শুরু করেছে চকচকে টাক। তার চোখ দুটো অস্থির, সারাক্ষণ যেন সুযোগের খোঁজে আছে। দামি কাপড়চোপড় পরে সে, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি কেনে প্রতি বছর।

ভিটোর আর্থিক অবস্থা নিয়ে কথা হল। কৌতুকভরা মিটিমিটি হাসি দেখা গেল লোরানের মুখে। বন্ধুকে বারবার অভয় দিল সে। ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে। ঠিক আছে, ব্যাংক ম্যানেজারদের সাথে নিজে কথা বলবে সে। ভিটোর এতটা ভেঙে পড়া উচিত নয়।

লোরান শুধু ভিটোর আইন উপদেষ্টাই নয়, পারিবারিক বন্ধুও বটে, কাজেই দ্বিতীয় সমস্যা লরার কথাও তুলল সে। লরা অযথা লুবনার নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে।

কুঁতকুঁতে চোখে সকৌতুক হাসি নিয়ে ভিটোর কথা শুনল লোরান। বলল, 'প্রতিটি সমস্যার ভেতর কিছু সুযোগ-সুবিধে থাকে, সেগুলো দেখতে পাওয়া চাই, ভিটো। তোমার এই সমস্যাগুলো নিতান্তই সামান্য, কিন্তু এগুলোর ভেতর যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে সেগুলো অসামান্য।'

'কি রকম?'

প্লেটে ফর্ক রেখে বাঁ হাত ওপরে তুলল লোরান, আঙুলগুলো ছড়ানো। 'এক,' আঙুলের গিট গুনতে শুরু করল সে, 'আভান্তি পরিবারের একটা খ্যাতি আছে,

কাজেই ব্যাংক তোমার কাছ থেকে যত টাকাই পাওনা হোক, তোমার অবস্থা না ফেরা পর্যন্ত ওরা তোমাকে সাহায্য করে যাবে।'

'আভান্তি পরিবারের খ্যাতি মানে আমার বাবার খ্যাতি,' প্রতিবাদ করে বলল ভিটো। 'কিন্তু তুমি তো জান লরাকে বিয়ে করার পর বাবার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

লোরান কাঁধ ঝাঁকাল। 'দুই, লেক কোমোতে তোমার অ্যাপার্টমেন্টটা। আট বছর আগে আশি মিলিয়ন লিরা দিয়ে কিনেছ, এখন সেটার দাম আড়াই শো মিলিয়ন। প্রতিদিন আরও বাড়ছে।'

বিরক্ত হল ভিটো। লোরানের মাথা আজ মোটেও খুলছে না। 'তুমি আমার আইন উপদেষ্টা, তোমাকেও কি আমার মনে করিয়ে দিতে হবে যে ওই অ্যাপার্টমেন্টও ব্যাংকের কাছে দুশো মিলিয়ন লিরায় বন্ধক দেয়া হয়েছে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল লোরান। 'তিন, কিছু মনে কোরো না, খোলাখুলি বলছি, তোমার বউ অর্থাৎ ভাবী, এ-দেশের সেরা সুন্দরীদের একজন। সুন্দরী বউ, এরচেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কি আছে হে?' বলে কর্কশ গলায় হো হো করে হাসতে লাগল সে।

গম্ভীর হয়ে বসে থাকল ভিটো। লোরান আজ তাকে হতাশ করছে।

ভিটোর মনের অবস্থা বুঝতে পারল লোরান। বন্ধুর গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দিল সে। তারপর বলল, 'এমিলিটা কিডন্যাপিং-এর পর লুবনার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করাটাই তোমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে, বুঝলে!'

'আমি? আমি তো তখন নিউইয়র্কে। এটাও তোমার ভাবীর কীর্তি। ফিরে এসে দেখলাম গভর্নেস পর্যন্ত রাখা হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, এ-কথা সত্যি, কিছু কিছু কাজ ভাবী ঝোঁকের মাথায় করে বসে। আবার যদি সে লুবনাকে স্কুলে পাঠাতে রাজি হয়, তার মানেই দাঁড়ায় তার ভুল হয়েছিল এটা স্বীকার করা। এবার বল, ভাবী কখনও নিজের ভুল স্বীকার করেছে?'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল ভিটোর ঠোঁটে।

'কাজেই,' বলে চলল লোরান, 'চীনারা যেমন বলে, তাকে তোমার মুখ রক্ষা করার সুযোগ দিতে হবে।'

'কিভাবে তা সম্ভব?' জানতে চাইল ভিটো।

একদিকের কাঁধ ঝাঁকাল লোরান। 'একজন বডিগার্ড রাখ।'

'ধেত্তেরি, তোমার আজ হয়েছে কি!' ঝাঁঝের সাথে বলল ভিটো। 'আধ ঘন্টা ধরে ব্যাখ্যা করলাম আমার টাকা নেই, অথচ তুমিও লরার মত বাজে খরচ বাড়াতে বলছ! আমি চেয়েছিলাম লরার সাথে কথা বলবে তুমি, তোমার কথা শোনে ও...'

বন্ধুর হাত চাপড়ে দিল লোরান। 'ভাবীকে আমি যাই বলি না কেন, তাতে

তার মুখ রক্ষা হবে না। তার সম্মান বাঁচানটাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাছাড়া, ঠিক কি ধরনের বডিগার্ডের কথা বলছি আমি, শুনলে বুঝবে···।'

ওয়েটার কফি নিয়ে এল।

'কি ধরনের বডিগার্ড?' ওয়েটার চলে যেতে জিজ্ঞেস করল ভিটো।

বন্ধুর দিকে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল লোরান, তার গলা একেবারে খাদে নেমে এল, যেন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। 'ভিটো, এই কিডন্যাপিং-এর অনেকগুলো দিক আর সম্ভাবনা আছে। গোটা ব্যাপারটা ভারি গোছাল, কারণ এর পিছনে রয়েছে অত্যন্ত দক্ষ আর প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী একটা মহল। বিশাল একটা ব্যবসা দিচ্ছে এই কিডন্যাপিং—গত বছর লোকের পকেট থেকে বেরিয়ে গেছে আঠারো শো বিলিয়ন লিরা।'

'হ্যাঁ, জানি,' গম্ভীর সুরে বলল ভিটো। 'ব্যবসাটা মাফিয়ারা করছে।'

চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল লোরানের, কেউ যেন তাকে লক্ষ্য করে পচা ডিম ছুঁড়েছে। 'কি বাজে একটা শব্দ! ওই শব্দটা দিয়ে লোকে বোঝাতে চায় মাফিয়া মানে চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমাশ, মাস্তান আর খুনে। কিন্তু দিনকাল বদলেছে, ভিটো। ওরা এখন ঝানু ব্যবসায়ী।' ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, কনিয়াক আনতে বলল। পকেট থেকে দুটো হাভানা সিগার বের করে বন্ধুকে দিল একটা। খুদে একটা সোনালি গিলোটিন দিয়ে সিগারের মুণ্ডচ্ছেদ করা হল। গিলোটিনটা ভিটোকে দিল সে। কনিয়াক রেখে বিদায় হল ওয়েটার।

'ছেলেমেয়ের কিডন্যাপ হবার ভয় থাকলে মা-বাপ কি করে?' কনিয়াকের গ্লাসে আয়েশ করে চুমুক দিল লোরান। 'বিদেশে পাঠিয়ে দেয়, সাধারণত সুইটজারল্যাণ্ডে। কিংবা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, সশস্ত্র গার্ড আছে এ-ধরনের স্কুলে পাঠায়, বুলেট-প্রুফ গাড়ি কেনে। আর, অবশ্যই, বডিগার্ড রাখে।'

'তাহলে স্বীকার করছ বডিগার্ড রাখা খরচের ব্যাপার?'

'বছরে প্রায় তিরিশ মিলিয়ন লিরা। সমস্ত খরচ বাবার।'

'তাহলে?'

'এ-ধরনের বডিগার্ড স্পেশালাইজড এজেন্সিগুলো যোগান দেয়, দুনিয়ার সব বড় বড় শহরে তাদের শাখা অফিস আছে। ইউরোপে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দেয়ায় বডিগার্ডের ভারি অভাব দেখা দিয়েছে। সত্যিকার যোগ্য বডিগার্ড এখন পাওয়াই মুশকিল, তাই দিনে দিনে ওদের দামও বাড়ছে।'

'এসব আমি জানি,' বলল ভিটো। 'পার তো আমার সমস্যা নিয়ে একটু মাথা···।'

ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলে বিটোকে থামিয়ে দিল লোরান। 'ধীরে, বৎস, ধীরে। আমি তোমার সমস্যা নিয়েই কথা বলছি।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে অসহায় ভঙ্গিতে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল ভিটো।

'এবার কিডন্যাপিং-এর সম্ভাবনার দিকটা তোমাকে বলি,' বলে চলল লোরান। 'তুমি জান কিডন্যাপারদের টাকার দাবি মেটাবার জন্যে ধনী পরিবারগুলো ইনস্যুরেন্স করে?'

মাথা ঝাঁকাল ভিটো।

'এ-ধরনের পলিসি ইটালিয়ান বীমা কোম্পানিগুলো বিক্রি করতে পারে না,' বলল লোরান। 'সরকার নিষেধ করে দিয়েছে। সরকারের ধারণা, সেটা ভুলও বলা চলে না, এতে করে কিডন্যাপারদের উৎসাহ দেয়া হবে। কিন্তু বিদেশী বীমা কোম্পানির ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এ-ব্যাপারে লণ্ডনের লয়েড'স সবচেয়ে ভাল ব্যবসা করছে। গত বছর তাদের প্রিমিয়াম আদায় হয়েছে একশো মিলিয়ন পাউণ্ড। ওদের নিজস্ব এজেন্ট আছে, বললে তারা এমনকি কিডন্যাপারদের সাথে দর কষাকষির দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করে। পলিসি কেনার দুটো শর্ত। প্রিমিয়াম দিতে হবে ইটালির বাইরে। আর প্রকাশ করতে পারবে না যে তুমি বীমা করেছ। কারণটা পরিষ্কার।'

একঘেয়ে লাগছে ভিটোর। 'জ্ঞান কিছুটা বাড়ল, সেজন্যে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ-সবের সাথে আমার সমস্যার কি সম্পর্ক?'

হাতের সিগার ভিটোর দিকে তাক করল লোরান। 'তোমার ডকইয়ার্ডের সমস্ত মেশিনপত্র বীমা করা আছে?'

'অবশ্যই, কিন্তু বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক।'

'বেশ,' বলল লোরান। 'প্রিমিয়াম নিয়ে আলোচনার সময় রেট ঠিক করা হয়েছিল সিকিউরিটির জন্যে তুমি কি খরচ করছ তার ওপর নির্ভর করে, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল ভিটো।

'নিয়মটা তাহলে তোমার জানা আছে,' বলল লোরান। নিরাপত্তার জন্যে তুমি যদি সিকিউরিটি গার্ড, ট্রেনিং পাওয়া কুকুর ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখতে চাও, প্রিমিয়াম অনেক কমে যাবে। কিডন্যাপ প্রিমিয়ামের ব্যাপারেও সেই একই নিয়ম। এখানে পলিসি যেহেতু অস্বাভাবিক মোটা অঙ্কের, তাই রেটের সামান্য হেরফের বিরাট সাশ্রয় এনে দিতে পারে।'

ভিটোকে কথা বলতে দিল না লোরান, এখনও তার কথা শেষ হয়নি। 'সাধারণ একটা কেসের কথা ধর। একজন শিল্পপতি এক বিলিয়ন লিরা কিডন্যাপ ইনস্যুরেন্স করলেন। রেট হতে পারে শতকরা পাঁচ ভাগ, অর্থাৎ পঞ্চাশ মিলিয়ন। কিন্তু তিনি যদি একজন ফুলটাইম বডিগার্ড রাখেন তাহলে প্রিমিয়াম নেমে আসতে পারে শতকরা তিন ভাগে অর্থাৎ ত্রিশ মিলিয়ন লিরায়। এভাবে তিনি বিশ মিলিয়ন বাঁচালেন।'

'কিন্তু এইমাত্র তুমি বললে একজন বডিগার্ডের বেতন বছরে ত্রিশ মিলিয়ন

লিরা। তাহলে সাশ্রয় হল কোথায়?'

লোরান হাসল। 'সে তো সেরা জাতের বডিগার্ডদের বেতন। "প্রিমিয়াম বডিগার্ড"-ও পাওয়া যায়, তুমি জান না। প্রিমিয়াম বডিগার্ড কিডন্যাপিং হয়ত ঠেকাতে পারবে না, কিন্তু তাকে দেখিয়ে প্রিমিয়ামের রেট কমিয়ে আনা যাবে। ওরা কম বেতনে কাজ করে। বছরে সাত মিলিয়ন লিরার বেশি নয়।'

'কিন্তু লোরান,' বিটো বলল। 'আমার মেয়েকে কেউ কিডন্যাপ করতে যাচ্ছে না...' কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ করেই তাৎপর্যটা উপলব্ধি করল সে।

বন্ধুর চেহারা বদলে যেতে দেখে হেসে উঠল লোরান। 'এই তো বুঝেছ! সস্তায় একজন প্রিমিয়াম বডিগার্ড রাখ, দু'এক মাস পর ফাঁকিবাজ বা অযোগ্য বলে বিদায় করে দাও। ইতিমধ্যে লুবনার স্কুলে যাওয়া শুরু হবে, ভাবীরও মুখ রক্ষার ব্যবস্থা হবে।'

চুপচাপ বসে কয়েক মিনিট চিন্তা কল ভিটো, তারপর জানতে চাইল, 'এ-ধরনের লোক কোথায় পাব আমি?'

লোরানের কুঁতকুঁতে চোখে বিজয়ীর হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। 'প্রথমে তুমি, দোস্ত, আমাদের লাঞ্চের বিলটা মিটিয়ে দাও। তারপর আমার অফিসে চল, একটা এজেন্সির ঠিকানা পেয়ে যাবে। খোদ মিলানেও ওদের অফিস আছে।'

নেপলস কোস্ট রোড ছেড়ে সরু মেঠো পথে নেমে এল রেমারিকের গাড়ি। মাউন্ট ভিসুভিয়াসের নিচের দিকের ঢালে জলপাই বাগান আছে, এঁকেবেঁকে সেদিকে চলে গেছে পথটা। বাগানের ঠিক নিচেই পাথুরে পাহাড়ের ইতি, পথটা হারিয়ে গেছে সবুজ ঘাস মোড়া একটা ঢালে, ওখান থেকে নেপলস আর একঝলক আলোর মত সাগরের খানিকটা বিস্তৃতি দেখা যায়। গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল রেমারিক, নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। সময়টা শেষ বিকেল, রক্ত-লাল সূর্য দিগন্তরেখার দিকে নামছে।

মাকে আবার দেখতে গিয়েছিল রেমারিক। দুই ছেলের উপস্থিতি তাকে সুস্থ করে তুলেছে। দেড় দু'মাসের জন্যে আর কোন চিন্তা নেই, এরমধ্যে লক্ষণগুলো ফিরে আসবে না। রানার কথা মার কাছে সম্পূর্ণ চেপে গেছে রেমারিক, শুনলেই দেখার জন্যে কেঁদেকেটে অস্থির হবে।

আড়ালে ডেকে নিয়ে ছোট ভাই রিসোকে রানার কথা বলেছে রেমারিক। শুনেই খুশিতে লাফিয়ে উঠেছিল রিসো। নেপলসে আসার জন্যে তখুনি সে রওনা হতে চায়, রানার সাথে দেখা করবে। কিন্তু রেমারিক তাকে হতাশ করে। তিন দিন আগে পৌঁচেছে রানা, ছদ্মবেশ নিয়ে আছে ও, মনের অবস্থা ভাল না। ওর জন্যে একটা কাজ দরকার।

খানিক চিন্তা করে রিসো জানিয়েছে, কাজ একটা জুটিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু

দরকারি কাগজপত্র আছে তো? না থাকলে একটু অসুবিধে হবে। রেমারিক তাকে বলেছে, হাসান নামে বাংলাদেশী এক মার্সেনারি ছিল, বহু দেশে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ছিল তার, লোকটা দেশেই একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, কিন্তু সে খবর খুব কম লোকই জানে। এই হাসানের চেহারা আর কাগজপত্র নিয়ে এসেছে রানা।

শুনে অস্থায়ী একটা কাজের প্রস্তাব দিয়েছে রিসো। সেটা নিয়েই নির্জনে বসে চিন্তা-ভাবনা করতে চায় রেমারিক।

যেদিন পৌঁছুল তার পরদিন রাতেই রানার সাথে আলাপ হয়েছে রেমারিকের। আলাপ মানে ভাল লাগার অনুভূতি নিয়ে ঘন্টা কয়েক চুপচাপ বসে থাকা আর অনেকক্ষণ পর পর দু'একটা শব্দ উচ্চারণ করা। সব মিলিয়ে শুধু এটুকু জানতে পেরেছে রেমারিক, খুন করার জন্যে কয়েকটা দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে রানাকে। তার মধ্যে একটা আবার সুপার পাওয়ার। সাথে সাথে বুঝে নিয়েছে রেমারিক, রানা তার প্রেজো ফিসোয় অলস সময় কাটালে লোকের মনে সন্দেহ দেখা দেবে। তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয়, ওর জন্যে একটা কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

রিসো কাজের যে প্রস্তাবটা দিয়েছে, রানার জন্যে সেটা হাস্যকর, রেমারিক জানে। রানার সম্পূর্ণ পরিচয় সে না জানলেও, ও যে একটা বিখ্যাত ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের চীফ, এটুকু তার জানা আছে। এরচেয়ে কত ভাল চাকরি শয়ে শয়ে লোককে দিয়ে বেড়ায় রানা নিজেই, আজ কি এই রকম একটা চাকরি করতে চাইবে ও?

হয়ত চাইবে না, আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেভাবে হোক রানাকে রাজি করাতে হবে। এই মুহূর্তে আর কিছু নয়, ওকে শুধু ওর নিরাপত্তার কথাটা ভাবতে হবে। আপনমনে হাসল রেমারিক, নিজের ওপর তার আস্থা আছে, রানাকে সে রাজি করাতে পারবে।

সিদ্ধান্ত নিতে পেরে মনটা খুশি হয়ে উঠবে, তা না, কেমন যেন বিষণ্ন বোধ করল রেমারিক। গোধূলি লগ্ন, সাগর ছুঁই ছুঁই করছে লাল সূর্য, ঝটপট পাখা ঝাপটে বাগানে ফিরছে নিঃসঙ্গ পাখি, সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে সাদা ধবধবে একটা খরগোস ছুটে গেল, তার মনটাও সেই সাথে ফিরে গেল অতীতে।

রানা তাকে মাল্টায় না নিয়ে গেলে জেসমিনের সাথে তার দেখা হত না। পজিটানোয় দু'হপ্তা মার কাছে কাটিয়ে রানার সাথে মাল্টায় চলে এল সে। ছুটিতে ছিল রানা, উদ্দেশ্য বেড়ানো, মাল্টা থেকে সহোদরা দ্বীপ গোজোয় চলে এল ওরা। জেলেপাড়ার ছোট্ট একটা হোটেলে ঠাঁই পাওয়া গেল। চমৎকার আবহাওয়া, আকাশে চাঁদ উঠলে খোলা মাঠে দল বেঁধে খিলখিল করে বেড়ায় কুমারী মেয়েরা, যুবকরা মদ খেয়ে গান জুড়ে দেয়। গেঁয়ো লোকগুলো সবাই দিনভর খাটে আর

অর্ধেক রাত পর্যন্ত ফুর্তি করে। সহজ সরল শান্তির জীবন।

ওই হোটেলেরই রিসেপশনিস্ট ছিল জেসমিন। রেমারিক তাকে দেখেই পাগল হয়ে গেল। এই মেয়েকে তার চাই-ই।

কিন্তু খোঁজ খবর নিতে গিয়ে ঘাবড়ে গেল রেমারিক। জানল, গ্রামে এমন কোন যুবক নেই যে বিয়ে করতে চায়নি জেসমিনকে, কিন্তু মেয়েটা সবাইকে হতাশ করেছে। মেয়েটা যে অহঙ্কারী তাও নয়, বরং ঠিক উল্টো। গ্রামের সবার সাথে তার ভাব আছে, ছোটবড় সবাই তাকে একটু যেন সমীহ করেই চলে। নিয়মিত চার্চে যায় জেসমিন, আবার বান্ধবীদের সাথে নেচেও বেড়ায়। শুধু কোন যুবক বেশি মাখামাখি করার চেষ্টা করলে কৌশলে সরে যায়, কোনমতে ধরা দেয় না।

রানার কাছে ধরনা দিল রেমারিক। 'দোস্ত, তোমার সেই কৌশলটা আমাকে শিখিয়ে দাও।'

'কি কৌশল?' রানা অবাক।

'কি জাদু জান তুমি যে মেয়েরা তোমার পেছনে ছোটে?'

'কেন ছোটে সে আমি নিজেও জানি না। তোমার সমস্যাটা বল। জেসমিন?'

'মারা যাব, সত্যিই মারা যাব,' কাতরাতে থাকে রেমারিক।

'বুদ্ধি নেবার জন্যে তুমি ভুল লোককে ধরেছ,' বলল রানা। ঠোঁটে মুচকি হাসি। 'কোথাও বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিয়ে দেখ কি হয়—কাজ না হলে একটা বুদ্ধি বাতলে দেব।'

প্রস্তাব দিতেই একটু ইতস্তত করে রেমারিকের সাথে বেড়াতে যেতে রাজি হয়ে গেল জেসমিন। কিন্তু সেই সাথে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'এখনও আমি ভার্জিন, থাকতেও চাই। শুধু বেড়ানো ছাড়া আর কিছু আশা করলে হতাশ হবে।' এমন সরাসরি কথা বলতে শুনে একটুও অবাক হয়নি রেমারিক, এই দ্বীপবাসীদের সবারই এটা বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু অস্বস্তিবোধ করেছিল রেমারিক। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অল্প বয়সেই লায়েক হয়ে গিয়েছিল সে, আর পেশাটাও ছিল এমন যে হাত বাড়ালেই নারীদেহ পাওয়া যেত। সত্যিকার কুমারী কোন মেয়ে দেখেনি সে, এরকম কেউ থাকতে পারে বলে ধারণাও ছিল না তার।

গোজোয় আরও ক'টা দিন রানাকে থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করল রেমারিক। মুচকি হেসে রাজি হল রানা, বলল, 'গাঁথা চাই কিন্তু!'

তিন হপ্তা পর বিজয় সম্পূর্ণ হল রেমারিকের, কিন্তু যেভাবে কল্পনা করেছিল সেভাবে নয়। সেদিন বেশ রাত করে বেরিয়েছিল ওরা, রেমারিক আর জেসমিন, দু'জনেরই ইচ্ছে রামলা বে-তে সাঁতার কাটবে। সাঁতার কাটার পর লালচে বালিতে বসে নিজের কথা বলতে শুরু করল জেসমিন। অতি সাধারণ এক মেয়ে সে, ওদের

পরিবার বহু যুগ ধরে কৃষক। তারপর জেসমিন একসময় থেমেছে, বলতে শুরু করেছে রেমারিক। আপন খেয়ালে বয়ে গেছে সময়। পুবের চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। বেলাডোনার কথা শুনে ফুঁপিয়ে উঠেছে জেসমিন, আবার যুদ্ধের বর্ণনা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠেছে। আকাশ আর সাগরের মাঝখানে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, এই সময় থামল ওরা। রেমারিক তিরস্কার করল নিজেকে, রাত কাবার হয়ে গেল অথচ আসল কথাটা বলা হয়নি। জেসমিন বলল, তার বাড়ির সবাই খুব আঘাত পাবে। কোন মেয়ে সারারাত বাইরে কাটালে গোজোর লোকেরা সেটাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখে।

'কিন্তু আমরা তো অন্যায় কিছুই করিনি,' বলল রেমারিক। দেখল, হঠাৎ কি এক প্রত্যাশায় ঝিক্ করে উঠল জেসমিনের চোখ। তার মনে প্রশ্ন জাগল, ব্যাপারটা আসলে কি, আমি ওকে নাকি ও আমাকে পটাচ্ছে?

সৈকতে প্রেম করল ওরা। ভোরের প্রথম আলোয় মুখ তুলে তাকিয়েছিল জেসমিন, হেসেছিল--লাজুক কিন্তু গর্বমাখা হাসি।

হাত ধরাধরি করে পাহাড় টপকাল ওরা, নাদুর হয়ে চলে এল জেসমিনদের ক্ষেতে। জেসমিনের বাবা আলের উপর দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখল, এক চুল নড়ল না।

'ও রেমারিক,' বাবাকে বলল জেসমিন। 'আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাজে ফিরে গেল বাবা। মেয়েকে তার চেনা আছে। বাইরে একটা রাত কাটানো মানেই জামাই।

নাদুর-এ, সেন্ট পিটার আর সেন্ট পলে বিয়ে হল ওদের। বিয়ে পড়াল যুবা বয়সের একজন প্রিস্ট। লোকটা যেমন লম্বা তেমনি শক্তিশালী, মেজাজও খুব তিরিক্ষি। কিন্তু নাদুরে লোকজন তাকে খুব পছন্দ করে। গোজোয় সবার একটা করে ডাক নাম আছে, গ্রামের লোকেরা তাকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলে ডাকে।

এই বিয়েতে রানার কি প্রতিক্রিয়া হবে ঠিক বুঝতে না পেরে উদ্বেগের মধ্যে ছিল রেমারিক। এক সাথে অনেকগুলো দিন কাটিয়েছে ওরা, দু'জনের বন্ধুত্বে এতদিন বাইরে থেকে কেউ ভাগ বসাতে আসেনি। কিন্তু রানা আসলে খুশিই হয়েছিল। মেয়েটা যে রেমারিককে ভালবাসে সেটা আগেই বুঝতে পারে ও। জেসমিনকে ওর পছন্দ হয়।

বরযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিল রানা। চুপচাপ আর গম্ভীর, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতই। বিবাহ-উত্তর উৎসবে রেমারিকের অনুরোধে গোজোর কড়া মদেও ছোট্ট একটা চুমুক দিয়েছিল ও।

কেউ কিছু বলেনি, নিজের বুদ্ধিতেই ওদের বন্ধুত্বের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে জেসমিন। ব্যাপারটাকে সে সহজভাবে মেনে নেয়। যদিও রানাকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হল তার, ফলে স্নেহের চেয়ে শ্রদ্ধা আর সমীহের ভাবই

বেশি করে জাগল মনে। সেই সাথে একটু গর্ব, ক'জনার স্বামী এমন বন্ধু পায়! নেপলসে ফেরার জন্যে রওনা হল ওরা, ওদেরকে এয়ারপোর্টে নিয়ে এল রানা। জেসমিন ওর দু'হাত ধরল, ধরে রাখল অনেকক্ষণ, তারপর যখন ছেড়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে রানা তার চোখে পানি দেখল।

'আমাদের ভুলে যাবেন না,' অস্ফুটে বলেছিল জেসমিন। 'আমরা আপনার জন্যে একটা ঘর খালি রাখব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, চেহারা স্থির আর থমথমে, বলল, 'রাতে ওর যদি নাক ডাকে, শিস দিয়ো, থেমে যাবে।'

বছরে ছ'মাসে নেপলসে ওদের কাছে এসেছে রানা। চিঠিও দিত না, ফোনও করত না, উদয় হত হঠাৎ করে। প্রতিবারই জেসমিনের জন্যে কিছু না কিছু একটা নিয়ে আসত। একবার এক জোড়া জামদানী নিয়ে এল, আরেকবার ইন্দোনেশিয়া থেকে আনল বাটিক পেইন্টিং। বোঝাই যায়, তাড়াহুড়ো করে কেনা নয়, নির্বাচনে সময় ব্যয় করা হয়েছে, যে দেবে আর যাকে দেবে দু'জনের রুচি বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়েছে। জিনিসগুলোর মূল্য আর সৌন্দর্য যতটুকু আনন্দ দিয়েছে, এটা বুঝতে পেরে তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছে জেসমিন।

দুই কি তিন দিনের বেশি কখনও থাকত না রানা। আগে থেকে কিছুই বলত না, হঠাৎ রাতে খেতে বসে জানিয়ে দিত, কাল আমি চলে যাচ্ছি। তবে শেষবার প্রায় বিশ দিনের মত ছিল রানা।

ডিনার সেরে শেষ খদ্দেরটা চলে যাবার পর বড় কিচেন টেবিলে বসত ওরা। টেলিভিশন দেখত, বই পড়ত কিংবা টুকটাক কথা বলত। ওদের দু'জনের কথা শুনে হাসত জেসমিন, কেউই পুরো একটা বাক্য উচ্চারণ করত না। রেমারিক হয়ত পুরানো কোন বন্ধুর কথা জানতে চাইল।

'শফিক?'

'কাতাঙ্গা।'

'প্রেমরোগ?'

'তুঙ্গে।'

'কিন্তু এখনও শক্ত?'

'একটা রড।'

'স্টেনগানটা?'

'রডে গাঁথা।'

ওদের বেশিরভাগ কথাই বুঝত না জেসমিন, বিশেষ করে ওরা যখন অস্ত্র আর গোলা-বারুদ নিয়ে আলাপ করত। প্রথম দু'বার রানা ঘুরে যাবার পর দিন কয়েক অস্থিরতায় ভুগেছে রেমারিক, কিন্তু জেসমিন কিছু বলেনি। পরে ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যায়।

তারপর একদিন স্থানীয় ফুটবল টিম শেষ খেলায় জিতে চ্যাম্পিয়ন হল, সমর্থক আর ভক্তরা খেলোয়াড়দের নিয়ে শহরে বিজয় মিছিল বের করল। পনেরো বিশটা ট্রাক, মাইকে গান বাজছে, হর্নগুলো মুহূর্তের জন্যেও থামছে না, ছেলেদের হাতে পতাকা আর মুখে মদের গন্ধ। সামনের ট্রাকটা চালাচ্ছিল সতেরো বছরের এক ছেলে, তার বড় ভাই দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড, তার গোলেই টিম জিতেছে। ছেলেটার এক হাতে স্টিয়ারিং আরেক হাতে মদের বোতল। হঠাৎ করেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল সে। একটা দেয়ালের সাথে পিষে দিল জেসমিনকে। মার্কেটিং করতে বেরিয়ে তার আর ফেরা হল না।

রানা পৌঁছুল এক হপ্তা পর, অনেক দূর থেকে এসে ক্লান্ত। কিভাবে জানল রানা, কথাটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিল রেমারিক।

সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু আলো এখনও ফুরোয়নি। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রেমারিক। আজই সে কথা বলবে রানার সাথে।

•

হাসানের চরিত্র অনুকরণ করতে গিয়ে মদ ধরতে হয়েছে রানাকে, পরতে হয়েছে গাম্ভীর্যের মুখোশ। মাঝেমধ্যে সিগারেটও খাচ্ছে ও। কিন্তু এ-সবই যে ছদ্মবেশের কারণে তা নয়, ওর মনও ভাল নেই।

রাশিয়া থেকে এয়ারকিং (মিগ-৩১) হাইজ্যাক করে ঢাকায় পৌঁছায় ও, কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকেই নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়তে হয় ওকে। এয়ারকিং চুরি করার প্ল্যানটা ছিল জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স আর সি. আই. এ.-র, তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে আনে ও। আক্ষরিক অর্থেই পাগলা কুকুর হয়ে গিয়েছিল সি. আই. এ., দেখামাত্র রানাকে খুন কর‍ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এজেন্টদের। গা ঢাকা না দিয়ে উপায় ছিল না ওর।

অ্যামফিবিয়ান প্লেন নিয়ে ঢাকা ছাড়ে রানা, মাঝ সাগরে বাংলাদেশী একটা জাহাজ থেকে ফুয়েল নিয়ে পৌঁছে যায় শ্রীলংকার উপকূলে। রাতের অন্ধকারে প্লেন ফেলে সৈকতে উঠে আসে, শহরে ঢুকে মিশে যায় জনারণ্যে। প্লেনে প্রচুর কাগজপত্র আর সরঞ্জাম ছিল, চেহারা আর পরিচয় বদল করতে কোন অসুবিধে হয়নি। শ্রীলংকা থেকে লেবানন, লেবানন থেকে সুইটজারল্যাণ্ড।

তিন মাস পর পরিস্থিতি জানার জন্যে জেনেভায় একজন বি. সি. আই. এজেন্টের সাথে গোপনে দেখা করেছিল রানা। হেডকোয়ার্টার থেকে ওর জন্যে নতুন নির্দেশ ছিল, আরও দু'মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে ওকে। আরও জানতে পারল ও, একজন রুশ বৈমানিক মিগ-৩১ ফিরিয়ে নিয়ে গেছে রাশিয়ায়। ঢাকার সাথে এখন মস্কোর সম্পর্ক যে-কোন সময়ের চেয়ে ভাল।

দু'মাস পর আবার বি. সি. আই.-র সাথে যোগাযোগ করে নতুন নির্দেশ পেয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়ে ও। সি. আই. এ. এখনও পাগলা কুকুর হয়ে আছে,

আত্মপ্রকাশ করা রানার জন্যে নিরাপদ নয়, অনির্দিষ্ট কালের জন্যে লুকিয়ে থাকতে হবে ওকে।

পরিচিত একটা ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে নিজের চেহারা সামান্য বদলে নিল রানা, মুখের কাটা দুটো দাগ তারই ফলশ্রুতি। এরপর ও ফ্রান্স হয়ে সিসিলিতে চলে আসে।

স্বাধীনচেতা পুরুষ, কখনও কারও কাছে মাথা নত করেনি। পালিয়ে বেড়ানো ওর স্বভাব নয়। সঙ্কট যত বড়ই হোক, বুকে সাহস নিয়ে বিপদের সামনে দাঁড়িয়েছে চিরকাল। তাকেই এখন চোরের মত এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। মন সায় দেয় না, সমগ্র অস্তিত্ব বিদ্রোহ করতে চায়।

কিছু বন্ধু থাকে, যারা একসাথে হেঁটে কবর পর্যন্ত যেতেও দ্বিধা করে না। রেমারিক তাদের একজন। রেমারিককে ও ভালবাসে, আর সেজন্যেই নিজের বিপদের মধ্যে তাকে টেনে আনতে চায় না। মনে মনে ঠিক করা আছে, এখানেও বেশিদিন ওর থাকা চলবে না। কিন্তু এরপর কোথায় যাবে জানা নেই।

এই অবস্থায় কার মনই বা ভাল থাকে। মদের বোতলটা টেনে নিল রানা। জানে, মদ খেয়ে শরীরের বারোটা বাজাচ্ছে, কিন্তু নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই ওর, কি করবে!

'বডিগার্ডের চাকরি,' বলল রেমারিক।

শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রানা।

কিচেনে বসে আছে ওরা। রিসোর প্রস্তাবটা তুলল রেমারিক। তার ভাই রিসো উন্নতি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে অ্যাকাউনট্যান্ট হিসেবে মিলানের একটা অডিট ফার্মে জয়েন করে সে। ওর মেধা আর যোগ্যতা দেখে মালিক তাকে ফার্মের পার্টনার করে নেয়। রিসো রেমারিককে জানিয়েছে, এই সিকিউরিটি এজেন্সি ওদেরই ফার্মের ক্লায়েন্ট। এজেন্সির কাজ শিল্পপতিদের বডিগার্ড যোগান দেয়া। বডিগার্ডের চাহিদা খুব বেশি, কিন্তু ট্রেনিং পাওয়া লোক আজকাল পাওয়াই মুশকিল। রেমারিক দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। শরীরের বারোটা বাজিয়েছে রানা, তাছাড়া ও এখন একটা মাতাল। যারা বডিগার্ড খুঁজছে তারা ওকে পছন্দই করবে না। এরপর রিসো তাকে 'প্রিমিয়াম বডিগার্ড'-এর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলে। আগ্রহী হয়ে ওঠে রেমারিক। বেতন খুবই কম, তাতে কিছু আসে যায় না, ছদ্মবেশের সাথে যাতে মানিয়ে যায় এমন একটা কাজ দরকার, টাকার কোন অভাব নেই রানার। অভাব যদি দেখা দেয়ও, তার সমস্ত সঞ্চয় রানার হাতে তুলে দেবে রেমারিক।

'কি?' জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

'পাগল,' জবাব দিল রানা। 'আমার যা অবস্থা, তাতে একটা লাশকেও পাহারা

দিতে পারব না।'

প্রিমিয়াম বডিগার্ডের কথা ব্যাখ্যা করল রেমারিক। কিন্তু রানা মাথা নাড়ল।

'একটা মাতালকে কেউ রাখবে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রেমারিক। 'প্রিমিয়াম রেট কমাবার জন্যে স্রেফ একটা দু'পেয়ে দরকার ওদের, সে মাতাল কি উন্মাদ তা ওরা দেখতে চাইবে না। যাকে তুমি পাহারা দেবে তার কিডন্যাপ হবার কোনই সম্ভাবনা নেই।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

'তোমাকে অবশ্য মদ আরও কম খেতে হবে। রাতে খাও। এখানে তো তাই খাচ্ছ, কই, দিনের বেলা তো তোমাকে দেখে কিছু মনে হয় না।'

'বলছ সম্ভাবনা নেই, তবু যদি কেউ কিডন্যাপ করতে চেষ্টা করে?'

'সাধ্যমত ঠেকাবার চেষ্টা করবে। যা বেতন, তুমি জাদু দেখাবে এটা কেউ আশা করবে না।'

চিন্তা করল রানা। বিপদ একটা ঘটার আগেই রেমারিকের কাছ থেকে সরে যাওয়ার এটা হয়ত একটা সুযোগ। তাছাড়া, একটা কাজের মধ্যে থাকলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণও খানিকটা ফিরে আসতে পারে। তবু দ্বিধা যায় না। বলল, 'বডিগার্ড মানে সব সময় একজনের কাছে থাকা। আমার যা মনের অবস্থা, আমি কাউকে সহ্য করতে পারব বলে মনে হয় না।'

মুচকি হাসল রেমারিক। 'ঠিক আছে, তুমি নাহয় বোবা বডিগার্ড হবে। ওরা হয়ত এটা তোমার একটা বাড়তি গুণ বলে ধরে নেবে।'

আরও অনেক সমস্যার কথা ভাবল রানা, কিন্তু নরম ভঙ্গিতে একটু একটু করে চাপ বাড়াতে থাকল রেমারিক। রিসো খুব করে ধরেছে, রানা যেন মিলানে তার বাড়িতে দিন কয়েক কাটিয়ে আসে। 'যাও না, দুটো দিন থেকে এস ওর কাছে। মন ভাল লাগবে।'

খানিক ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল রানা। আর কোন ধরনের কাজ পাওয়া যায় কিনা রিসোর সাথে আলাপ করা যাবে। এরপর শুতে গেল ও, যাবার আগে বলল, 'শেষ পর্যন্ত বডিগার্ড!'

কিচেন থেকে রানা বেরিয়ে যেতেই কলম বের করে কাগজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিসোকে চিঠি লিখতে বসল রেমারিক। সে জানে, এজেন্সি থেকে প্রার্থীর যোগ্যতা জানতে চাওয়া হবে, কিন্তু রানাকে লিখতে বলা হলে বিস্তারিত কিছুই লিখবে না। হাসানের পরিচয়পত্র, সার্টিফিকেট ইত্যাদি আগেই মুখস্থ করে রেখেছে রেমারিক। কোথায় ক'টা পদক পেয়েছে হাসান, তাও লিখতে ভুলল না সে।

চিঠিটা এনভেলাপে ভরে টেবিলেই রাখল রেমারিক, একটা নোট লিখে ফুরেলাকে নির্দেশ দিল, কাল সকালেই যেন ডাকবাক্সে ফেলা হয় চিঠি। রানা আসার পর আজ এই প্রথম মনে খানিকটা স্বস্তি নিয়ে ঘুমাতে গেল রেমারিক।

পাঁচ

লোরান যেমন আশা দিয়েছিল, বডিগার্ড পাওয়া ভিটোর জন্যে তেমন সহজ হয়নি। লরার পছন্দ হবে এই রকম একজনকে বেছে বের করতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তার।

বড়িগার্ডের ব্যবস্থা হবে, এই কথা শোনার সাথে সাথে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল বাড়িতে, বডিগার্ড যেন নতুন একটা গাড়ি বা এক সেট অলঙ্কার। তখুনি প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে বসে যায় লরা। অনেক তর্কাতর্কির পর তার সিদ্ধান্তই বহাল থাকল, বডিগার্ড বাড়ির ওপরতলায় বড় একটা কামরায় থাকবে। লরা আর লুবনা নিজেরাই ধরাধরি করে কিছু অতিরিক্ত ফার্নিচার নিয়ে গেল সেই ঘরে। দু'জনেরই কনুই আর আঙুল ছড়ে গেল। মেহগনি কাঠের বিশাল একটা খাট আগে থেকেই ছিল ওখানে, এবার জায়গা পেল বড় একটা ইজি চেয়ার, ছোট একটা টেবিল, একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার, একটা ওঅরড্রোব। ঠিক হল বডিগার্ড আথিয়া আর লার্দোর সাথে কিচেনে বসে খাবে।

বডিগার্ডের কি কি কাজ হবে তারও একটা তালিকা তৈরি করে ফেলল লরা। লুবনাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আর বিকেলবেলা ফিরিয়ে নিয়ে আসা, এটাই তার সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ কাজ । এই দুটো কাজের মাঝখানে লরাকে সে মার্কেটে বা লাঞ্চ খেতে নিয়ে যাবে।

লোকটাকে কেমন হতে হবে তারও একটা রূপরেখা তৈরি করে দিল লরা। লোকজনের সামনে তাকে যেন বের করা যায়। আদবকায়দা জানতে হবে তার, হতে হবে ভদ্র আর বিনয়ী। আর একেবারে গুণ্ডা-পাণ্ডা মার্কা চেহারা হলে চলবে না। আদেশ নয়, স্বামীর হাত ধরে অনুনয়-বিনয় করে বলল সে, একটু যেন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হয়। লুবনার নতুন স্কুল টার্ম শুরু হতে যাচ্ছে, তাছাড়া, ভিটোর সাথে এবার সে-ও প্যারিসে যেতে চায়।

এসবই সমস্যা হয়ে দেখা দিল। প্রথম দু'জন প্রার্থীকে দেখামাত্র বিদায় করে দিল ভিটো। দু'জনেই রাস্তা থেকে উঠে আসা গুণ্ডা, লরা ওদেরকে দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেবে না। তৃতীয় লোকটা বুড়ো, চার নাম্বার প্রার্থীর বাঁ চোখ নেই। এজেন্সি অফিসে ফোন করে ভিটো অভিযোগ করল, বেছে বেছে শুধু আজেবাজে লোককে পাঠাবার মানে কি। জবাব এল, বডিগার্ডের এখন খুব অভাব, তাছাড়া, এই বেতনে এর চেয়ে ভাল কোন লোক কাজটা নিতে চাইছে না।

পরদিন এজেন্সি থেকে একটা ফোন পেল ভিটো। আরও একটা লোককে পাঠাচ্ছে ওরা। সে একজন বাংলাদেশী।

তেমন উৎসাহ বোধ করেনি ভিটো। বাড়িতে একজন বিদেশী লোক থাকবে,

এর জন্যে সে মানসিকভাবে তৈরি ছিল না। মনে মনে লোকটার একটা ছবি আঁকল সে। কালো মোষের মত চেহারা, চোখ দুটো টকটকে লাল, সারাক্ষণ চুইংগাম চিবাচ্ছে।

তাই লোকটাকে যখন তার অফিসে হাজির করা হল, একাধারে খুশি আর বিস্মিত হল ভিটো। নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, মুখে থমথমে গাম্ভীর্য, কিন্তু চোখ দুটোয় মায়া আছে। সবচেয়ে ভাল লাগল লোকটার রুচি। পরনে ঘন নীল সুট, পপলিনের সাদা শার্ট। হাতে একটা বড় এনভেলাপ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ভিটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে কাছে ডাকল ভিটো, এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে ডেস্কের সামনে বসল রানা। তারপর এনভেলাপটা বাড়িয়ে দিল। 'এজেন্সি থেকে আপনাকে এটা পাঠিয়েছে।'

খুশির মাত্রা আরও একটু বাড়ল ভিটোর। লোকটা বিশুদ্ধ ইটালীয়ান বলে। এনভেলাপটা নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কফি?' এর আগে যারা এসেছে তাদের সে কফি খেতে বলেনি।

মাথা নাড়ল রানা।

সীল ভেঙে এনভেলাপ খুলল ভিটো। ভেতরে অনেকগুলো কাগজ। পড়তে শুরু করল সে। ইমরুল হাসানের কোয়ালিফিকেশন আর ইতিহাস। রেমারিকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো সাজিয়ে লিখে পাঠিয়েছে এজেন্সি।

পড়া শেষ করে মুখ তুলল ভিটো। রানার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। রানাও তাকিয়ে আছে, চোখে কোন ভাষা নেই।

'অসুবিধেটা কি?' জানতে চাইল ভিটো। অসুবিধে যে একটা কিছু আছে, এ-ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই। ওর যা কোয়ালিফিকেশন, ওকে একটা দুর্গ পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অথচ সামান্য বেতনে একটা মেয়েকে পাহারা দেয়ার কাজ করতে চাইছে।

'আমি মদ খাই,' সোজা-সাপ্টা স্বীকার করল রানা।

ব্যাপারটা হজম করতে একটু সময় নিল ভিটো। আবার সে কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলাল। 'খারাপ দিকটা কি?'

চোখ কুঁচকে চিন্তা করল রানা, ভিটো অনুভব করল খাঁটি সত্যি কথাই শুনতে পাবে সে।

'হয়ত আমার রিয়্যাকশন টাইম ঠিক থাকবে না। ঝট্ করে গুলি করতে হতে পারে, আমি হয়ত একটু দেরি করে ফেলব। দূর থেকে মাথায় গুলি করলাম, কিন্তু লাগল হয়ত বুকে। আপনার জায়গায় আমি হলে, আর আমি যদি জানতাম আমার পরিবারের ওপর হামলা হতে পারে, এই রকম একটা লোককে চাকরি দিতাম না।'

ভিটো জানতে চাইল, 'মদ খেয়ে···মানে, লোক হাসান?'

মাথা নাড়ল রানা। 'টেরও পাবেন না। আমি শুধু রাতে খাই। সকালে আমার খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু দেখে কিছু বোঝা যাবে না।'

আরেকবার কাগজগুলোর ওপর চোখ বুলাল ভিটো। লরা যদি মদ খাওয়ার কথাটা না জানে, আর তো কোন সমস্যা নেই। 'বেতন কিন্তু খুব কম।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনার মেয়েকে যদি টপ প্রফেশন্যালরা কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে, বেতনের চেয়ে কম সার্ভিস পাবেন না।'

'কিন্তু যদি অ্যামেচাররা চেষ্টা করে?'

'ওরা যদি সত্যি অ্যামেচার হয়, স্রেফ ভয় দেখিয়েই ভাগিয়ে দিতে পারব, কিংবা হয়ত খুন হয়ে যাবে। সেরকম কোন ভয় আদৌ আছে নাকি?'

মাথা নাড়ল ভিটো। 'বোধহয় নেই। আসলে, ভয়টা আমার স্ত্রীর। ইদানীং অনেকগুলো ছেলেমেয়ে কিডন্যাপ হল তো, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ভাল কথা, ওকে এখানে-সেখানে আনা-নেয়া করাও আপনার ডিউটির মধ্যে পড়বে। ওর নিজের গাড়ি আছে।' কাগজগুলোর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভাবল সে, ভাড়াটে যোদ্ধা ছিল এই লোক, কয়শো লোককে খুন করেছে কে জানে! 'আরেকটা কথা, আপনাকে কিন্তু একটু ঘরমুখো হতে হবে।' ইঙ্গিতে কাগজগুলো দেখাল সে। 'এখানে দেখছি আপনি শুধু বাইরে বাইরে ছুটে বেড়িয়েছেন।'

'ওটা কোন সমস্যা হবে না,' বলল রানা। 'তবে, আমি ঠিক সামাজিক নই। কাজটা করব, যতটা ভালভাবে পারি, তার বেশি আমার কাছ থেকে কিছু আশা করবেন না।'

'বেশ,' বলল ভিটো। 'তাড়াতাড়ি জয়েন করতে পারবেন তো?' হঠাৎ একটা চিন্তা এল। 'আপনার আর্মস আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এজেন্সি থেকে দেবে। ওদেরকে আপনার একটা চিঠি দিতে হবে। পুলিস পারমিটের ব্যবস্থা করবে ওরা। এর জন্যে বিল করবে এজেন্সি, আপনি দেবেন।' উঠে দাঁড়াল ও। 'যে-কোন সময় জয়েন করতে পারি আমি।'

রানার সাথে ভিটোও দরজা পর্যন্ত এল। 'হপ্তার ছুটিতে কাল আমি কোমোয় যাব। জিনিসপত্র নিয়ে দয়া করে কাল ছ'টায় চলে আসুন এখানে। ভাল কথা, আপনার মদ খাওয়ার কথা কারও জানার দরকার নেই, আমার স্ত্রীরও না।'

রানার সাথে করমর্দন করল ভিটো।

'ধন্যবাদ।'

ভিটো বলল, 'চাকরির মেয়াদ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারছি না। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। তবে এজেন্সির সাথে আমার তিন মাসের কথা হয়েছে, এই তিনমাসকে ট্রায়াল পিরিয়ড হিসেবে ধরা হবে। তারপর আমরা দু'জনেই নতুন করে চিন্তা করব। এমনও তো হতে পারে, চাকরিটা হয়ত আপনার ভাল লাগল না।'

*

লাউঞ্জে রয়েছে লরা, ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর সামনে। সাদামাঠা একটা কালো ড্রেস পরে আছে সে, মুখ কালো চুলের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা একটা চাঁদের আকৃতি। ভেতরে ঢুকল ওরা, ভিটোর পাশে দাঁড়াল রানা। ভিটোর চেয়ে অনেক লম্বা ও।

ধীরে ধীরে ফিরল লরা, স্বামীর দিকে এক সেকেণ্ডের জন্যে তাকাল, তারপর রানার ওপর আটকে গেল দৃষ্টি। রানাকে আপাদ মস্তক দেখছে সে, ভিটো পরিচয় করিয়ে দিল। লরার মনের ভাব চেহারায় ফুটল না, মৃদু গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে ড্রিঙ্ক দেব?'

'ধন্যবাদ—স্কচ, সামান্য পানি।'

বারের দিকে এগোল লরা, ওরা দু'জন ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর সামনে এসে দাঁড়াল। লেকের দিকে তাকিয়ে রানা ভাবল, লোকটা ঠিক সহজ হতে পারছে না, কারণটা কি? ওর জন্যে স্কচ আর স্বামীর জন্যে মার্টিনি নিয়ে ফিরে এল লরা।

'নামটা ভাল করে শুনতে পাইনি।'

'হাসান।'

'আপনি ইটালিয়ান নন,' বলল লরা। কোন্ দেশের লোক, বুঝতে পারছি না।

'বাংলাদেশী।'

ভুরু একটু কুঁচকে উঠল লরার, স্বামীর দিকে একবার তাকাল।

'কিন্তু উনি খুব ভাল ইটালিয়ান বলতে পারেন,' তাড়াতাড়ি বলল ভিটো।

তথ্যটা লরাকে স্পর্শ করল বলে মনে হল না। 'আগে কখনও এই কাজ করেছেন?'

'না।'

লরার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে দেখে হড়বড় করে ভিটো বলল, 'উনি একজন যোদ্ধা ছিলেন। এত জায়গায় যুদ্ধ করেছেন, তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

লোকটাকে রানার আত্মবিশ্বাসী আর নিজের ব্যাপারে নিঃসংশয় বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন তাকে বেশ খানিকটা অসহায় দেখাল। পরাজয়টা হয়ত স্ত্রীর রূপের কাছে, নাকি ব্যক্তিত্বের কাছে?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রানাকে লক্ষ করছে লরা। কাপড়ের কাটছাঁট বা রঙ চিৎকার করে কিছু বলছে না, এটা তার ভাল লাগল। গ্লাস ধরা হাতের উল্টোপিঠে একটা কাটা দাগ। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল, অনেক লম্বা। কিন্তু বয়সটা আন্দাজ করতে গিয়ে হোঁচট খেল সে। পঁয়তাল্লিশ, নাকি আরও বেশি? চোখের পাতা জোড়া ভারি, চোখ দুটো সুন্দর, কিন্তু অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফুটে আছে, সাপের মত। গা শির শির করে উঠল তার। লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে যে-কেউ ভয় পাবে।

এখানেই একটা ধাক্কা খেল লরা। পুরুষমানুষ দেখে ভয় পাবার মেয়ে নয়

সে। দেখামাত্র এই প্রথম কোন পুরুষ ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল ভিটো। 'লুবনা কোথায়, ডারলিং?'

বাস্তবে ফিরে এল লরা। 'ওপরে। এখুনি নামবে ও।'

ভিটো লক্ষ করল, লরার ইতস্তত ভাবটা আর নেই, কিন্তু তার জায়গায় বিমূঢ় একটা ভাব দেখা যাচ্ছে।

ক্ষীণ একটু হাসল লরা, রানাকে বলল, 'আমার মেয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। বডিগার্ড ওর কাছে একটা খেলনার মত।'

'আমিই প্রথম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। আপনি সুন্দর ইটালিয়ান বলেন—নিয়াপলিটানদের মত।'

'ওদের একজনের কাছ থেকেই শিখেছি।'

'ওখানে আপনি ছিলেন?'

'না, আসা-যাওয়া ছিল।'

দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে ঘুরল রানা।

মেয়েটা সাদা টি-শার্ট আর জিনস পরে আছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রানাকে দেখছে সে।

ওর মা বলল, 'লুবনা, ইনি মি. ইমরুল হাসান।'

ধীর পায়ে হেঁটে এল সে, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিল হাতটা। তাকে ছোট মনে করে কেউ যেন হালকা চোখে না দেখে, ভাবটা এই রকম। মেয়েটা রানার বুক পর্যন্ত লম্বা। ছোট্ট হাতটা ওর হাতের ভেতর হারিয়ে গেল, সেটা ধরে নাড়ার সময় তার চোখে খুশির ঝিলিক আর চাপা উত্তেজনা দেখল রানা।

'মি. হাসানকে তার কামরাটা দেখিয়ে দেবে?' লরা বলল।

গ্লাসটা খালি করল রানা, ভক্তি মেশানো গাম্ভীর্যের সাথে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল লুবনা।

দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় কান পাতল ভিটো। কিন্তু টুঁ-শব্দটিও না করে নিজের গ্লাসে চুমুক দিল লরা।

'লোকটা কিন্তু খুব অভিজ্ঞ,' বলল ভিটো।

লরা নিরুত্তর।

'বিদেশী, এই যা,' আবার বলল ভিটো। 'কিন্তু ভাল ইটালিয়ান বলে, আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।'

'ইটালিতে আগে কখনও কাজ করেছে?' লরা জানতে চাইল।

'না।' ব্রিফকেস খুলে এজেন্সির দেয়া রিপোর্টটা স্ত্রীকে দিল ভিটো। 'ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড।'

সোফায় বসে কাগজগুলো দেখল লরা। বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ভিটো,

আরেকটা মার্টিনি বানাল। পড়া শেষ করে কাগজগুলো কফি টেবিলে রাখল লরা। 'লোকটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।'

ঝট করে স্ত্রীর দিকে ফিরল ভিটো। 'কি বললে?'

মৃদু হাসল লরা। 'বিদেশী হওয়াতে বরং সুবিধে হয়েছে, আমাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করার স্বপ্ন দেখবে না। অত সাহসই হবে না ওর।'

'কিন্তু তোমার ভয় লাগছে কেন?'

কি যেন চিন্তা করল লরা। 'কি জানি।' কাগজগুলোর দিকে তাকাল সে। 'উত্তরটা হয়ত এগুলোর মধ্যে আছে। আসলে, তুমি একটা খুনেকে বাড়িতে নিয়ে এসেছ। কত লোককে খুন করেছে ও...'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গেল ভিটো, কিন্তু আবার মৃদু হাসি দেখা গেল লরার ঠোঁটে।

'তবে দেখতে শুনতে ভাল...সুপুরুষ, তাই না? লোকের সামনে বের করতে লজ্জায় পড়তে হবে না।'

ভিটো স্বস্তিবোধ করলেও তাকে বিমূঢ় দেখাল। বোঝা যাচ্ছে, হাসানকে বাতিল করা হয়নি।

উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর গালে চুমো খেল লরা। 'ধন্যবাদ, ডারলিং, এখন আমি খুশি।'

ডিনারের পর পিস্তলটা পরিষ্কার করতে বসল রানা। দীর্ঘদিনের অভ্যেস, আপনা থেকেই হাত চলছে, মনে সন্ধেবেলার ঘটনা আর লোকজন।

ভিটো আভান্তি অন্যমনস্ক ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে।

লরার কথা ভাবল রানা। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে ওর ওপর লরার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল। মেয়েদের মধ্যে যা যা দেখলে ও খুশি হয় তার অনেকগুলোই লরার মধ্যে রয়েছে। সাদামাঠা সাজ, বাড়াবাড়ি নেই; নাক, চোখ, ভুরু, কপাল, ঠোঁট সব একই কারিগরের হাতে গড়া—ফলে একটার সাথে আরেকটার সামঞ্জস্য আছে; মেকআপের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তার চুল স্বাভাবিক ভাবে ঝুলে আছে, হাতের নখ লম্বা, রঙ করা নয়। তার কোন সাহায্যের দরকার হয় না, এমনকি পারফিউমও লাগে না। স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নারী। আর তার ব্যক্তিত্ব, আলাদা কিছু নয়, রূপেরই একটা প্রসারিত শাখা মাত্র।

এই জাতের মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের নিয়ে খেলতে ভালবাসে, ভেড়া বানিয়ে মজা পায়। নিজেকে সাবধান করে দিল ও, বুঝে শুনে পা ফেল চাঁদ!

পিস্তলটা পরিষ্কার করার পর ট্রিগার মেকানিজম আর ম্যাগাজিন রিলিজ ক্যাচে তেল দিল রানা। আথিয়া আর লার্দোর কথা ভাবল ও। বিশাল কিচেনে বসে ডিনার

খাওয়ার সময় তেমন কথাবার্তা বলেনি ওরা, রানাও কোন রকম উৎসাহ দেয়নি। ও যে একটু দূরে দূরে থাকতে পছন্দ করবে সেটা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, ওর উপস্থিতিতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলে আবার নিজেদের আগের আলাপের ঢং ফিরে আসবে।

পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়স হবে আথিয়ার, সদা হাস্যময়ী, দশজনের খাটুনি একাই খাটতে পারে। রানার ব্যাপারে তার কৌতূহল পরিষ্কার বোঝা যায়। লার্দোর বয়স সত্তর তো হবেই, আশিও হতে পারে। ভিটোর বাপের মালি ছিল সে, পুরানো লোক বলে তাকে বাদ দিয়ে কম বয়সী মালি রাখা হয়নি। তামাটে রঙের চোখা মুখ, চোখে নিষ্পাপ সরলতা। রানার দিকে বারবার এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন বলতে চায় এখানে তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

এ বাড়ির রান্নাবান্না ভাল। প্রথমে এল ভেজিটেবল সুপ আর গ্রিসিনি (রুটি), তারপর বিসটেকা (বীফ স্টেক), গোরগোনজোলা (ভেড়ীর দুধ থেকে তৈরি হলদেটে সাদা পনির), রিসো (চাল আর সেল-ফিশ সহযোগে রান্না, বাঙালী রসনার জন্যে ভারি সুস্বাদু), সবশেষে ডোলসি (মিষ্টি আর ফল)।

ইটালিয়ান খাবার পছন্দ করে রানা, পরিচয়ও অনেক দিনের। চুপ করে থাকলে অন্যায় করা হবে, তাই আথিয়ার একটু প্রশংসা করতে হল, 'চমৎকার রাঁধো তুমি।'

চেহারা দেখেই বুঝল, আথিয়ার মুখে খই ফুটতে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি লার্দোর দিকে ফিরল ও, বলল, 'বাড়ির চারদিকটা কাল আমাকে দেখাবে তুমি। লে-আউটটা আমার জানা দরকার।' এরপর উঠে নিজের ঘরে চলে আসে ও।

পিস্তলের ম্যাগাজিন থেকে নাইন এম এম বুলেট বের করে স্প্রিং চেক করল রানা। স্পেয়ার দুটোও পরীক্ষা করল। একটা বাক্স খুলে তিনটে ম্যাগাজিনেই গুলি ভরল। নতুন শোল্ডার হোলস্টারে তেল ঘষল, আরও নরম করার জন্যে।

লুবনা—সে-ই হবে সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাকে পাহারা দেয়ার জন্যেই ওকে রাখা। মন-মেজাজ ভাল থাকলে মেয়েটার সঙ্গ খারাপ লাগত না। কিন্তু এই বয়সের মেয়েরা কি রকম হয় জানা আছে ওর, ভয়টা সেজন্যেই। নিশ্চয়ই খুব ছটফটে মেয়ে, ঠোঁটে এক কোটি প্রশ্ন নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রথম একবার দেখে সব বোঝা যায় না, কিন্তু রানার মনে হয়েছে মেয়েটা মায়ের ঠিক উল্টো স্বভাব পেয়েছে, অথচ চেহারায় মায়ের আদল অনেকখানিই আছে, তবে মায়ের চেয়েও সুন্দরী।

রানাকে ওপরতলায় নিয়ে এসে ঘর দেখিয়ে দিয়েই চলে যায়নি লুবনা, ভেতরে ঢুকে রানার পিছনে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। খোলা সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বের করে ওঅরড্রোবে সাজাচ্ছিল রানা, থেমে থেমে এক-আধটা প্রশ্ন করছিল মেয়েটা। বোঝাই যাচ্ছিল, রানার আগমন ওর জীবনে বিরাট একটা

ঘটনা। বাড়িতে ওর বয়েসী আর কেউ নেই, স্কুলে যাওয়া বন্ধ, মা তার নিজের রূপ-যৌবন আর সোসাইটি নিয়ে ব্যস্ত। রানার জানা আছে, এ-ধরনের মায়েরা নিজের মেয়েকেও প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। ওর ধারণা হল মেয়েটার বোধহয় খুব একঘেয়ে জীবন। তা যদি হয়, বিচ্ছিরি একটা ঝামেলা হয়ে দেখা দেবে লুবনা। বডিগার্ডকে স্রেফ রক্ষক বলে মনে করবে না, তার কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করবে। বন্ধুত্ব চাইবে।

লুবনার প্রথম প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশকে নিয়ে। এক কথায় জবাব দিয়েছিল রানা, অনেকদিন দেশে ফেরেনি ও। কিন্তু তবু তাকে নিরুৎসাহিত করা যায়নি। বাংলাদেশের সীমা কি? ওটা কি ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য? বাংলাদেশীরা কি খেতে ভালবাসে? রয়েল বেঙ্গল টাইগার কত বড় হয়? বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছে রানা, তাতেও কাজ হচ্ছে না দেখে বলেছে, আমি এখন ক্লান্ত। অনেকক্ষণ কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে চলে গেছে।

হোলস্টারে তেল মাখানো শেষ করে তাতে বেরেটা ভরল রানা। খাটের স্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে রাখল সেটা, বাঁটটা বালিশের কাছাকাছি থাকল। টেবিলের কাছে ফিরে এসে একটা রোড ম্যাপ খুলল, মিলান আর কোমোর মাঝখানের রাস্তাটা দেখানো হয়েছে তাতে। কাজের টেকনিক্যাল দিকগুলো জেনে নিতে চায় রানা। গোটা ব্যাপারটাকে সামরিক দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করল। একটা 'সম্পদ'কে রক্ষা করতে হবে তার। শক্তিশালী এক শত্রু এটা দখল করার চেষ্টা করতে পারে। তার 'সম্পদ' ওরা দখল করার জন্যে ঘাঁটিতে হামলা চালাতে পারে, তারমানে বাড়িতে; কিংবা ঘাঁটির বাইরে, হয় প্রায়ই যাওয়া হয় এমন কোন ঠিকানায় বা আসা-যাওয়ার পথের মাঝখানে কোথাও, তারমানে স্কুলে অথবা রাস্তায়।

ঠিক হয়েছে সকালে বাড়ির ভেতর-বার সব ঘুরিয়ে দেখানো হবে ওকে। আর লুবনা ওকে স্কুল দেখিয়ে আনবে। স্কুলের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট জানতে হবে ওকে। তবে, ওর ধারণা, কিডন্যাপ করার চেষ্টা হলে রাস্তাতেই কোথাও হবে, কাজেই কোন ছক না রেখে যখন খুশি ইচ্ছেমত রাস্তা বদল করে আসা-যাওয়া করাটা জরুরি। ম্যাপ দেখে জানা গেল, স্কুলে যাওয়ার জন্যে ক'টা রাস্তা ব্যবহার করা সম্ভব। মার্জিনে কিছু নোট লিখল রানা।

এরপর ওঅরড্রোব থেকে সুটকেসটা নামাল ও। ভেতরে কাগজে মোড়া কয়েকটা বোতল রয়েছে। একটা গ্লাস খুঁজে নিয়ে তাতে খানিকটা হুইস্কি ঢালল।

ইজি চেয়ারে বসে খাচ্ছে রানা। রাত অনেক হল। এক সময় পুরো বোতলটাই খালি করল ও। বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে সংশয় কোনমতে কাটতে চায় না।

*

'জানো, লোকটাকে লুবনার পছন্দ হয়েছে।'

মাথা নাড়ল ভিটো। 'গভর্নেস থাকবে না, তাতেই ও আত্মহারা। লোকটা যদি কাউন্ট ড্রাকুলা হত তাও তাকে পছন্দ করত ও।'

'উঁহুঁ, তুমি জান না,' বলল লরা। 'শুতে যাবার আগে লুবনার সাথে আমার কথা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি রে, তোর বডিগার্ড লোক কেমন? ঠোঁট উল্টে কি বলল জান? বলল ভারি অহঙ্কারী।'

'তাহলে যে বলছ পছন্দ হয়েছে ওর?'

'তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, অহঙ্কারী বলছিস কেন? লুবনা বলল, আমার দিকে একবার ভাল করে তাকালও না। দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম, হুঁ-হ্যাঁ করে রয়ে গেল। এরপর আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি লুবনাকে,' বলল লরা। 'লুবনা নিজেই বলল, লোকটা আসলে পাক্কা অভিনেতা। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানালার পর্দা একটু সরিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। দেখি, খানিক পর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আমাকে না দেখে কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল চেহারা, চোখে অপরাধ অপরাধ ভাব। গম্ভীর না ছাই, আসলে প্রথম প্রথম তো, একটু ডাঁট দেখাচ্ছে।'

সশব্দে হেসে উঠল ভিটো। 'তোমার মেয়েও তো দেখছি কম অভিনয় জানে না!'

'কিন্তু আমি ভাবছি, এত থাকতে বডিগার্ডের চাকরি করতে এল কেন?' যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করল লরা। 'এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।'

'রহস্য আবার কি থাকবে,' বলল ভিটো। 'আজকাল ভাল একটা চাকরি পাওয়া খুব কঠিন।'

'ওর কি বিয়ে হয়েছে? কোথাও বাড়িঘর আছে?'

'কি জানি।'

'ঘাপলা একটা না থেকেই পারে না,' বলল লরা। 'কি যেন একটা ধরতে পারছি না। আত্মবিশ্বাসী লোক, সন্দেহ নেই, কিন্তু বেশিদিন হয়নি কোথাও একটা ধাক্কা খেয়েছে বলে মনে হয়। হয়ত কোন মেয়ে ধোঁকা দিয়েছে।'

ভিটো হাসল। 'মেয়েলি অনুমান এরচেয়ে ভাল আর কি হবে।'

'না,' মাথা নাড়ল লরা। 'আমারই ভুল। মেয়ে-টেয়ের ব্যাপার নয়। ওর ব্যক্তিত্বের একটা অংশ যেন হারিয়ে গেছে। যাই বল, লোকটা আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে।'

ভিটো খুশি আর তৃপ্ত। লরা লোকটার প্রতি আকৃষ্ট হবে, এ আশঙ্কা তার নেই। স্ত্রীকে সে অনেক দিন থেকে চেনে, অনেক আগেই এ-ধরনের ভয় তাকে ছেড়ে গেছে। জানে, পুরুষমানুষ লরার একটা প্রিয় সাবজেক্ট, স্টাডি করতে পছন্দ

করে। কে কোন্ প্রকৃতির মানুষ, আবিষ্কার করতে ওর মজা লাগে।

'কিন্তু তুমি আমাকে বললে ও নাকি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ। ভয় শব্দটা বোধহয় ভুল। এক অর্থে, সত্যি ও একটা হুমকির মত। বুনো একটা জানোয়ার, কিন্তু পোষ মেনেছে। তবু এদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হয়। আতিনিদের অ্যালসেশিয়ানটার কথা মনে আছে তোমার? পাঁচ বছর থাকার পর খোদ মালিককেই একদিন কামড়ে দিল।'

'ও কুকুর নয়, লরা!'

'আমি শুধু একটা উদারহরণ দিলাম। লোকটার মনে কি যেন একটা আছে। ভেব না আমি বিপদের আশঙ্কা করছি। হয়ত এটাই ওর ভঙ্গি। তবে, ওর সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে। ওর অতীত, ওর স্বভাব, অনুভূতি—সব।'

ছয়

সামনের সিটে রানার পাশে বসেছে লুবনা। কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে রানা, রাস্তার ওপর নজর রাখতে হবে ওকে। একটু অবাকই হয়েছে লুবনা, কারণ মেইন কোমো-মিলান রোডে রয়েছে ওরা, গাড়ি চালানো খুব সহজ, পথ ভুল হবারও কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রানার উদ্দেশ্য, সহজে চোখে পড়ে না অথচ বিপদ আসতে পারে এই রকম জায়গাগুলো আবিষ্কার করা—যেখানে গাড়ির গতি কমাতে হবে বা বাঁক নিতে হবে, অথবা যে-সব জায়গায় কাছেপিঠে বিল্ডিং নেই। বেশ কয়েকটা স্পট আবিষ্কার করল ও, ম্যাপে নোট করল সেগুলো। আধ ঘন্টা পর শেষ বাঁকটা দেখাল লুবনা, কয়েক মিনিট পর স্কুল গেটের সামনে থামল গাড়ি। লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে দেয়ালের সাথে আটকানো একটা পিতলের হাতল ধরে টানল লুবনা। গাড়িতে বসে উঁচু পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় সার সার বর্শা আকৃতির লোহার পাত লক্ষ করল রানা। দেখল ভারি গেটের সামনে কোন রকম আড়াল নেই।

লুবনার চোখ বরাবর গেটের গায়ে একটা শাটার খুলে গেল। ভেতর থেকে কেউ দেখল ওকে। দু'একটা কথা হল। তারপর প্রৌঢ় এক দারোয়ান ধীরে ধীরে খুলে দিল গেট। হাত ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল লুবনা, গেট পেরিয়ে এগোল, গাড়ি নিয়ে তার পিছু নিল রানা। ভেতরে একটাই বিল্ডিং, হলুদ আর সবুজ লতাগাছে ঢাকা। চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে। শেডে গাড়ি থামিয়ে লুবনাকে অনুসরণ করল রানা। আঙুল দিয়ে এটা-সেটা দেখাল লুবনা। খেলার মাঠ, মাঠকে ঘিরে থাকা রানিং ট্র্যাক, বিল্ডিংটার বাঁ দিকে ছোট্ট একটা বাগান, বাউণ্ডারি ওয়ালের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে। সুইমিং পুলও আছে, সেটা পিছন দিকে।

চারদিক একবার ঘুরে দেখে নিয়ে স্কুল-ভবনের সামনে চলে এল ওরা। স্কুলের ভেতরটা মোটামুটি নিরাপদ লাগল। সারা মুখে পবিত্র হাসি নিয়ে বয়স্কা এক

মহিলা বেরিয়ে এলেন, সব চুল সাদা। ছুটে গিয়ে তাঁর দুই গালে চুমো খেল লুবনা, হাত ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে এল রানার সামনে। 'ইনি সিনোরা মিরিয়াম, আমাদের হেডমিসট্রেস,' রানাকে বলল সে। তারপর বৃদ্ধার দিকে ফিরল, চেহারায় উথলে ওঠা গর্ব। 'ও হাসান, আমার বডিগার্ড।'

'মি. হাসান,' শুদ্ধ করে দিলেন হেডমিসট্রেস।

মাথা নাড়ল লুবনা, হাত ঝাপটা দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল। 'ও আমাকে শুধু হাসান বলতে বলেছে।'

করমর্দন করল ওরা, হেডমিসট্রেস ওদেরকে কফি খাওয়ার জন্যে ভেতরে ডাকলেন। একেবারে ওপরতলায় ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে ভদ্রমহিলার। অনেক আসবাবপত্র, কিন্তু সবই খুব হালকা। মেঝে ছাড়া প্রতিটি সমতল জায়গায় ফ্রেমে বাঁধানো গ্রুপ ফটোগ্রাফ রয়েছে। ছবিগুলো রানা দেখছে লক্ষ করে হেডমিসট্রেস বললেন, 'ওরা সবাই আমার ছেলেমেয়ে। কয়েক শো হবে। এখন ওরা বড় হয়ে গেছে, কিন্তু আমার কাছে চিরকাল ওরা খোকা-খুকুই রয়েছে।'

পরিবশেটা খুব ভাল লাগল রানার। স্কুল যে এত ঘরোয়া হতে পারে, ভাবা যায় না। আসতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠেছিল লুবনা, কারণটা বোঝা গেল।

মধ্যবয়েসী এক মেয়েলোক রূপালি একটা ট্রে নিয়ে এল। হেড মিসট্রেস নিজের হাতে পট থেকে কাপে কফি ঢেলে পরিবেশন করলেন। লুবনার সাথে আলাপ করছেন তিনি। তারপর, রানাকে অবহেলা করা হচ্ছে মনে করে, ফিরলেন ওর দিকে। 'এ-ধরনের কাজে অনেক দিন ধরে আছেন আপনি, মি. হাসান?'

'বডিগার্ড কখনও ছিলাম না,' বলল রানা। 'কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে।'

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'কি দিনকাল পড়েছে। আমারও দুটো মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছিল। এখান থেকে নয়, ওরা আহতও হয়নি, আবার স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লেগেছে ওদের।' লুবনার হাঁটুতে হাত রাখলেন তিনি। 'আমাদের লুবনাকে আপনি দেখবেন। ও স্কুলে আসবে শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'আর ক'দিন বাড়িতে থাকলে দম আটকে মরেই যেতাম,' বলল লুবনা। বন্দী জীবনের বর্ণনা দিল সবিস্তারে। আপন মনে বকবক করে চলেছে লুবনা, হাসিমুখে শুনছেন বৃদ্ধা, একটা দুটো কথা যোগ করছেন তিনিও। গোটা পরিবেশটা চমৎকার লাগল রানার কাছে। কেমন যেন শান্তি রয়েছে মহিলার মধ্যে।

মিনিট কয়েক পর রানার সাথে লুবনার চোখাচোখি হল, দু'জন একসাথে উঠে দাঁড়াল ওরা। গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্যে ওদের সাথে সাথে হেডমিসট্রেসও এলেন। 'আপনি ইটালিয়ান নন,' বললেন তিনি।

'ও বাংলাদেশী, দেশটা নয় মাস যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে,' বলে উঠল লুবনা। 'সে যুদ্ধে হাসানও ছিল।'

অবাক হয়ে গেল রানা, এসব লুবনা জানল কিভাবে? দেখল, আড়চোখে ওর

দিকে তাকিয়ে ওর প্রতিক্রিয়া উপভোগ করছে লুবনা আর মুচকি মুচকি হাসছে। সাথে সাথে চেহারা গম্ভীর করে ফেলল রানা।

'আপনি এত ভাল ইটালিয়ান বলেন! নিশ্চয়ই নেপলসে শিখেছেন?'

'হ্যাঁ, একজন নিয়াপলিটানের কাছে।'

'তাই তো বলি!' সন্তুষ্ট দেখাল তাঁকে। স্কুল-ভবনের পিছন দিকের একটা দরজা দেখালেন তিনি। 'ওটা কিচেন। ছেলেমেয়েদের আমরা ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করি, তবু যদি আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়, মেইডকে বললেই কফি পাবেন।' বিষণ্ন হাসি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে। 'এখন তো বেশ অনেকের সাথেই বডিগার্ড আসছে।'

রানা ধন্যবাদ জানাল। লুবনা তাঁর গালে চুমো খেল।

ফেরার সময় অন্য রাস্তা ধরল রানা।

লুবনাকে এবারও কথা বলতে নিষেধ করল ও। কিছুক্ষণ চুপ করেই থাকল সে, কিন্তু স্কুল আর হেডমিসট্রেসকে দেখার পর উত্তেজিত হয়ে আছে, বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছে রানার দিকে। এক সময় আর নিজেকে সামলাতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'স্কুল তোমার কেমন লাগত, হাসান?'

'ভাল না।'

'ওমা, সেকি!' বিস্ফারিত চোখে তাকাল লুবনা। 'কেন? তুমি বুঝি পড়া পারতে না?'

রানা চুপ। ভাবল, উত্তর না পেলে হয়ত দমে যাবে।

'হাসান, এটা কি তোমার ডাক নাম?'

'না।'

'কি সেটা?'

'নেই।'

এবার লুবনা কোন রকম বিস্ময় প্রকাশ করল না। 'স্কুল তোমার ভাল লাগত না—তারমানে তুমি খুব অসুখী ছিলে, না?'

বিরক্তি চেপে শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'সুখী হওয়াটা মনের একটা অবস্থা। ব্যাপারটা আমি কখনও পাত্তাই দিইনি।'

স্টিয়ারিং হুইল ধরা রানার হাতের দিকে চোখ আটকে গেল লুবনার। শুকনো কাটা দাগটা ওকে যেন জাদু করেছে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দাগটা ছুঁলো সে। 'কি করে হল এটা?'

ঝাঁকি খেয়ে সরে গেল রানা, তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'গাড়ি চালাবার সময় আমাকে ছোঁবে না।' কয়েকমুহূর্ত পর সিদ্ধান্তে পৌঁছুল ও, এখুনি ফয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার। 'আর শোনো, সারাক্ষণ বক বক করবে না। আমি গল্প করার জন্যে আসিনি। আমার সব কথা তোমার জানার দরকার নেই। বিপদ হলে তোমাকে

আমি রক্ষা করব—ব্যস।' সুরটা রুক্ষ, চাবুকের মত আঘাত করল লুবনাকে।

কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লুবনা। তারপর সরে গিয়ে যতটা সম্ভব জানালা ঘেঁষে বসল।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল রানা। সরাসরি রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে লুবনা, ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে শক্তভাবে চেপে আছে, চিবুক কাঁপছে। 'আর, দয়া করে কাঁদতে শুরু কোরো না!' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা, কেন কে জানে নিজের ওপর রেগে গেছে ও।

নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠলে নিজের ওপর রাগ আরও বাড়ল রানার। 'আমি একটা দায়িত্ব নিয়েছি, সেদিকে আমার মনোযোগ থাকতে হবে। কেউ যদি সারাক্ষণ কানের কাছে বক বক করে, তাহলে কি করে হয়!' স্টিয়ারিং হুইল থেকে একটা হাত তুলে বাইরেটা দেখাল ও। 'সম্ভব-অসম্ভব সব রকম জগৎ রয়েছে ওখানে। সব রকম। সুখী আর অসুখী, ওখানে শুধু এই দু'দল লোক বাস করছে না। খারাপ মানুষও আছে। খারাপ কিছুও ঘটতে পারে। বড় হও, তখন বুঝবে।'

'এখন আর আমি ছোট নই।' দপ্ করে জ্বলে উঠল লুবনা। 'আমিও জানি খারাপ কিছু ঘটতে পারে। এমন কিছু অন্যায় করিনি যে এত কথা শুনতে হবে আমাকে। আর জেনে রাখ, আমি কাঁদছি না। ওই বয়সটা আমি পেরিয়ে এসেছি।'

কিন্তু লুবনার চোখে পানি ছলছল করছে, যদিও রানার দিকে স্থির হয়ে আছে তার অগ্নিদৃষ্টি।

রাস্তার পাশে গাড়ি সরিয়ে আনল রানা, থামল। চিন্তা করছে ও, নিস্তব্ধতার মাঝখানে শুধু লুবনার নাক টানার আওয়াজ শোনা গেল। 'শোন,' এক সময় বলল রানা। 'আমি আসলে এই রকমই। দরকার ছাড়া কথা বলি না, কেউ বললে বিরক্ত হই। এটা তোমাকে বুঝতে হবে, আর তা না হলে তোমার বাবাকে বলে আরেকজন লোকের ব্যবস্থা কোরো।'

নাক টানার আওয়াজ থেমে গেল। স্থির হয়ে বসে আছে, সরাসরি সামনে তাকিয়ে। আচমকা দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে গেল সে, তারপর পিছনের দরজা খুলে ব্যাক সিটে উঠে বসল। 'আপনি আমাকে এখন বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন, মি. ইমরুল হাসান।' মিস্টারের ওপর খুব জোর দিল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। ওর দিকে তাকাবে না লুবনা। পিঠ সোজা করে বসে থাকল, রাগে নাকের ফুটো দুটো কাঁপছে।

গাড়ি ছাড়ল রানা। মন একটু খারাপ হয়ে গেছে। মেয়েটাকে আঘাত দিতে চায়নি। কিন্তু ওর খেলার সাথী হবার জন্যে চাকরিটা নেয়নি সে। কথাগুলো এক সময় না একময় বলতেই হত। ওর মা-বাবার বোঝা উচিত,ওর এখন একজন বন্ধু দরকার।

রবিবার। ডিনারের পর নিজের ঘরে বসে বই পড়ছে রানা। দরজায় নক হল।

শরীরটা ভাল লাগছে না। আগের রাতে একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিল। প্রায় সারাদিনই ঘর থেকে বের হয়নি। ধরে নিয়েছিল লরা বা ভিটো কেউ একজন আসবে।

লরা।

'জানতে এলাম যা যা দরকার সব আপনি পেয়েছেন কিনা,' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে বলল সে।

হাতের বই টেবিলে নামিয়ে রাখল রানা। 'না, আর কিছুর আমার দরকার নেই।'

ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল লরা। 'খাবার ঠিক আছে তো? আথিয়া বলছিল সারাদিন প্রায় না খেয়ে আছেন আপনি।'

'রান্না তো খুবই ভাল। শরীর একটু খারাপ ছিল। এখন ভাল আছি।'

ঘরের একটু ভেতরে ঢুকল লরা। 'আপনার সাথে কিছু কথা ছিল···।'

চেয়ার খালি করে দিয়ে বিছানায় বসল রানা। এগিয়ে এল লরা। তার হাঁটার ভঙ্গি ভাল লাগল রানার—নর্তকীর মত, সাবলীল, যেন বাতাসে ভেসে এল। চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিল সে। তার হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা আছে মোজায়। গায়ের রঙের সাথে মিশে গেছে, ভাল করে লক্ষ না করলে বোঝাই যায় না মোজা পরে আছে।

'লুবনা কি আপনাকে খুব বিরক্ত করছে?' হঠাৎ জানতে চাইল লরা।

'ওকে বুঝতে হবে যে আমি নতুন কোন খেলনা নই,' স্পষ্ট করে বলল রানা।

মৃদু হাসি দেখা গেল লরার ঠোঁটে। 'একটু উত্তেজনা তো থাকবেই—বডিগার্ড পেয়েছে, আবার স্কুলে যাচ্ছে। মাস কয়েক খুব একঘেয়ে সময় কেটেছে ওর, আপনি যদি একটু সয়ে নেন খুব ভাল হয়।'

'কিন্তু আমাকে রাখা হয়েছে ওর নিরাপত্তার দিকটা দেখার জন্যে, ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে নয়।'

সায় দিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল লরা। 'ওকে কিছু বলেছেন নাকি? আমাকে তো কিছু বলবে না ও, কিন্তু কাল রাতে খুব চুপচাপ দেখলাম ওকে, মনে হল রাগ করেছে।'

বিছানা থেকে নেমে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'দেখুন, আমাকে দিয়ে বোধহয় হবে না। আমি ঠিক সামাজিক লোক নই। আপনার স্বামীকে অন্য মানুষ দেখতে বলুন।'

লরার দিকে ফিরল রানা, দেখল এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। 'না, আপনার কথাই ঠিক। আপনি শুধু ওর নিরাপত্তার দিকটা দেখবেন। আর তাতেই আমরা খুশি।' হোলস্টারে ভরা পিস্তলটা তার দৃষ্টি কেড়ে নিল। খাটের স্ট্যাণ্ডের সাথে ঝুলছে ওটা। 'আপনার সাথে আর্মস আছে জানতাম না তো!' হাসল সে। 'জানি

বোকার মত হয়ে গেল কথাটা, কিন্তু ছোট্ট একটা জিনিস গোটা ব্যাপারটাকে কি রকম সিরিয়াস করে তুলেছে!'

রানা কিছু বলল না।

'আমি ভেবেছিলাম কারাতে বা ওই ধরনের কিছুতেই এক্সপার্ট হবেন আপনি।' হঠাৎ হাসানের ব্যাকগ্রাউণ্ড মনে পড়ে গেল তার। 'আন-আর্মড কমব্যাট, তাই না? আপনি তো একজন ইনস্ট্রাকটর ছিলেন।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তবে অনেক সময় আর্মড কমব্যাটের বিকল্প হয় না। পিস্তলটা হাতের কাছে থাকা ভাল, ব্যবহার করতে হোক বা না হোক।'

কথাটা ভাবল লরা। 'কিন্তু দরকার পড়লে ব্যবহার করবেন, তাই না, লুবনা যদি বিপদে পড়ে?'

'অবশ্যই।'

লরার কৌতূহল টের পেয়ে গেল রানা, বুঝল এরপর কি আসছে।

'আপনি তো যোদ্ধা ছিলেন, আর যুদ্ধ মানেই মানুষ মারার প্রতিযোগিতা—তা···মানে, কত লোককে মারতে হয়েছে আপনার?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লরা। 'আমি তো কল্পনাই করতে পারি না। যুদ্ধের সময় অবশ্য দূর থেকে গুলি করে মানুষ মারা হয়। কিন্তু কাছ থেকে, সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে মারা, নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা?'

'অভ্যেস হয়ে যায়। আর এই অভ্যেস যার হয়ে গেছে সে কিভাবে একটা নাবালিকা মেয়েকে সঙ্গ দেবে?'

হেসে উঠল লরা। 'আমি এই জন্যে খুশি যে লুবনার বডিগার্ড মোমের পুতুল নয়।' হঠাৎ করেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে, 'নিচে একটা অতিরিক্ত টু-ইন-ওয়ান আছে। আথিয়াকে বলব, নিয়ে এসে দেবে আপনাকে। গান আপনার ভাল লাগে?'

'কিছু কিছু গান।'

'কি ধরনের?'

'দেশী আর কান্ট্রি সঙস্।'

'দেশী মানে কি রবীন্দ্রসঙ্গীত?'

সরাসরি তাকাল রানা। 'হ্যাঁ, রবীন্দ্রসঙ্গীতও। কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে?'

'আমি না, আমার স্বামী,' উঠে দাঁড়াল লরা। এশিয়ায় তো ওকে প্রায়ই যেতে হয়। একবার নাকি ঢাকাতেও গেছে। কোথাও গেলে কোন খবর জানতে আর বাকি রাখে না ও। সেদিন দেখি লুবনা ওর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে সব জেনে নিচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত বা কান্ট্রির ক্যাসেট তো নেই আমাদের।'

দরজার কাছে পৌছে ঘুরল সে। 'তবে মিলানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কাল আমরা যাচ্ছি ওখানে। লাঞ্চ আছে।'

রানাকে আরও ক'সেকেণ্ড দেখল লরা। তারপর আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল, বলল, 'ঠিক আছে, লুবনাকে আমি বলে দেব। আসলে আমাদের আরও ছেলেমেয়ে থাকলে ভাল হত। বেচারি একেবারে একা পড়ে গেছে।'

লরা বিদায় হতে চেয়ারে বসে বইটা তুলে নিল রানা। কিন্তু পড়ায় আর মন বসল না। ওঅরড্রোব খুলে সুটকেস থেকে একটা বোতল বের করল।

আউন্স দুয়েক হুইস্কি খেয়ে আবার বইটা নিয়ে চেষ্টা করল রানা। কিন্তু কাজ হল না। লরা এসে সব গোলমাল করে দিয়ে গেছে। অমোঘ মহিলার রূপের টান।

'আড়াইটার দিকে বেরিয়ে আসব,' বলল লরা। রেস্তোরাঁর পাশের সরু গলিটা দেখাল সে। 'ওখানে পার্ক করবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, বলল, 'পুলিস যদি আমাকে সরিয়ে দেয়, একটা চক্কর দিয়ে আবার ফিরে আসব। আপনি মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পেরোল লরা।

হাতঘড়ি দেখল রানা। দু'ঘন্টা কাটাতে হবে।

মা আর মেয়েকে ব্যাক সিটে নিয়ে সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে রানা। গাড়িতে উঠে লরা ওকে বলল, টু-ইন-ওয়ান আথিয়াকে দেয়া হয়েছে। স্কুলে যাবার পথে আর কোন কথা হয়নি। সারাটা পথ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রানাকে এড়িয়ে গেছে লুবনা।

স্কুল গেটের বাইরে ইউনিফর্ম পরা একজন সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়ি থামতে জানালা দিয়ে উঁকি দিল সে, লরা তাকে হাসানের পরিচয় জানাল। কয়েক মুহূর্ত রানাকে দেখল গার্ড, চেহারাটা স্মৃতিতে গেঁথে নিল। একটু ফাঁক করা ছিল গেট, লুবনা নামতে যাচ্ছে দেখেই দ্রুত বাধা দিল রানা, 'নড়বে না!'

গাড়ি থেকে নেমে গার্ডকে পাশ কাটাল রানা, গেটের ভেতরটা ভাল করে দেখল। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এল ও. গাড়ির পিছনের দরজা খুলে ইঙ্গিতে নামতে বলল লুবনাকে। মাকে চুমো খেয়ে লাফ দিয়ে নামল লুবনা। রানার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় সোজা নাক বরাবর তাকিয়ে থাকল সে, যেন ওর অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না। গার্ড লোকটা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, কিন্তু কিছু বলল না। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'আপনি খুব সাবধানী,' মন্তব্য করল লরা।

'অভ্যেস।'

'লুবনার সাথে কথা বলেছি আমি। বলেছি, আপনাকে যেন বিরক্ত না করে।'

'ধন্যবাদ।'

'কাল রাতে আপনার সাথে কি কথা হয়েছে, ওকে বলিনি। শুধু বলেছি, আপনার মন ভাল নেই, তাই আপনার সাথে বেশি কথা না বলাই ভাল। ও আপনাকে ভয় পাক বা খারাপ চোখে দেখুক সেটা আমরা চাই না।'

লরা রেস্তোরাঁর ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাবার পর গাড়ি নিয়ে রেল স্টেশনে চলে এল রানা। একটা বুকস্টল থেকে কয়েকটা বই কিনল, অবসরের সঙ্গী। তারপর টেলিফোন অফিসে এসে ফোন করল রেমারিককে।

হ্যাঁ, কাজ শুরু করেছে সে; কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত কেমন লাগবে এখনও ঠিক বলতে পারছে না। তবে, ওদের বাড়ির রান্নাটা ভাল। এরপর রিসোকে ফোন করে আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানাল রানা। বলল, হপ্তা দুয়েক পর রিসো আর জুলিয়ানাকে ডিনার খাওয়াতে চায় ও।

দিন দুয়েক ওদের বাড়িতে বেড়িয়ে এসেছে রানা। রেমারিকের আর সব আত্মীয়স্বজনদের মত রিসো আর জুলিয়ানাও ওকে নিকটতম আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ওদের খুব সুখের সংসার, তার স্পর্শ রানাও পেয়েছে। জুলিয়ানা রোমের মেয়ে, খুব লম্বা। রিসোর সাথে তার পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। মেয়েটা যেমন হাসতে পারে, তেমনি হাসাতেও পারে।

স্টেশনের লাগোয়া দোকানগুলোয় ঢুঁ মারল রানা। একটা দোকানে হিন্দী গানের কিছু ক্যাসেট পাওয়া গেল, কিন্তু বাংলা কোন ক্যাসেট নেই। কেনি রজার্স, জনি ক্যাশ আর ড. হুক-এর কয়েকটা ক্যাসেট কিনল ও। লিণ্ডা রনস্ট্যাণ্ড আর ডলি পারটন-এর ক্যাসেট মাত্র একটা দোকানে পাওয়া গেল। সায়গলের একটা ক্যাসেটও কিনল ও, 'সো যা রাজকুমারী' গানটা আছে ওতে। কেন কিনল, নিজেও বলতে পারবে না।

আড়াইটা থেকে অপেক্ষার পালা শুরু হল। রেস্তোরাঁ থেকে লরা বেরুল তিনটের সময়, সাথে একটা লোক আর তার স্ত্রী। সবাই খুব হাসিখুশি। গাড়ি থেকে নামল রানা, দু'জনের সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দিল লরা।

'এঁরা আলবারগো লোরান আর অলিভা লোরান—হাসান।'

লোরানকে পছন্দ হল না রানার। তার কুঁতকুঁতে চোখ, অস্থির দৃষ্টি দেখে মনে হল লোকটা সুযোগসন্ধানী, মানুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে বেশভূষায় খুব পরিপাটি, যদিও কাপড় ঠেলে বেরিয়ে থাকা ভুঁড়িটা রীতিমত অশ্লীল। আর অলিভা লোরানকে সাদামাঠা মহিলা বলে মনে হল—খায়, ঘুমোয় আর মার্কেটিং করে বেড়ায়।

লোরান ওকে খুঁটিয়ে দেখল। 'শুনলাম আপনি নাকি প্যালেস্টাইনীদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ইসরায়েলিরা আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?'

আবার মাথা ঝাঁকাল রানা।

'নিশ্চয়ই সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না?'

মাথা নাড়ল রানা। মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে ফেলল অলিভা, লরার কানে কানে ফিসফিস করল, 'আদৌ কথা বলে?'

'কি বলছ!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল লরা। লোকটার দিকে ফিরে তার গালে চুমো খেল সে। 'লাঞ্চের জন্যে ধন্যবাদ, লোরান। কথা দিচ্ছি, অলিভাকে বেশি খরচ করতে দেব না।' অলিভাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল সে। লোরানের দিকে তাকিয়ে আবার একবার মাথা ঝাঁকাল রানা, ছেড়ে দিল গাড়ি। গাড়ির দিকে তাকিয়ে ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকল লোরান। ভিউ মিররে তাকে দেখতে পেল রানা।

লোকটাকে ওর অন্যমনস্ক বলে মনে হল।

পরবর্তী দেড়ঘন্টা কেনাকাটা করল ওরা। তারপর রানা লুবনার কথা মনে করিয়ে দিল লরাকে।

আঁতকে উঠল লরা। 'সেকি, এরই মধ্যে পাঁচটা বেজে গেল! ঠিক আছে, আপনি যান। ভিটোকে ফোন করব, নিয়ে যাবে আমাদের।'

স্কুলের ভেতর ঢুকে শেডে গাড়ি থামাল রানা। আরও অনেকগুলো গাড়ি রয়েছে শেডে। কিছু কিছু ছেলেমেয়ে এদিকে আসতেও শুরু করেছে। গাড়ি থেকে নামল না রানা। লুবনাকে এখনও দেখতে পায়নি ও।

মিনিট পাঁচেক পর আরও দুটো মেয়ের সাথে দেখা গেল লুবনাকে, স্কুল ভবনের পিছন দিক থেকে সামনের দিকে বেরিয়ে এল ওরা। দাঁড়িয়ে পড়ে গল্প করছে তিনজন, বার কয়েক রানার দিকে তাকাল। তারপর ভেঙে গেল দলটা, মেয়ে দুটো একটা মার্সিডিজের দিকে এগিয়ে এল, লুবনা আবার সুইমিং পুলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়ে দুটোকে নিয়ে চলে গেল মার্সিডিজ। বিশ মিনিট পর আবার দেখা গেল লুবনাকে, ক্লাস রূম থেকে বইয়ের ব্যাগটা নিয়ে এসেছে। গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজা খুলে দিল রানা। ওর পাশ ঘেঁষে যাবার সময় হাতের ব্যাগটা নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিল লুবনা। স্ট্র্যাপ ধরে ব্যাগটা নিল রানা।

'মা এল না?'

'তোমার মা তোমার বাবার সাথে ফিরবেন,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল লুবনা। দরজা বন্ধ করে দিল রানা।

পথে কোন কথা হল না। কিন্তু বারবার চোখাচোখি হল ওদের রিয়ার ভিউ মিররে। মনে মনে হাসল রানা, কথা বলার জন্যে মরে যাচ্ছে লুবনা, রানার দিক থেকে সামান্য সাড়া পেলেই ছুটিয়ে দেবে তুবড়ি।

রাতে ডিনার খেতে বসে আজও আবার আথিয়ার প্রশংসা করতে হল

রানাকে। রানার কাছ থেকে মাত্র একবার শুনেই চমৎকার খিচুড়ি রেঁধেছে সে, সাথে ভাজা ইলিশ। আজকের ইটালিয়ান পদগুলোও নতুন, একেকটার এক-একরকম স্বাদ।

প্রশংসাটুকু নিঃশব্দে উপভোগ করল আথিয়া। ইতিমধ্যে সে জেনেছে, এই বিদেশী লোকটা বাচালতা একেবারেই পছন্দ করে না।

ডিনার শেষ করেই উঠে পড়া দৃষ্টিকটু, তাই বই নিয়ে বসল রানা। পোপকে নিয়ে আলোচনা শুরু করল আথিয়া আর লার্দো। রানার নির্বাক উপস্থিতি মেনে নিয়েছে ওরা। কিচেনের পরিবেশ শান্ত।

নিজের কামরায় ফিরে এসে টু-ইন-ওয়ানে একটা ক্যাসেট ভরল রানা। ড. হুক প্রেম আর অতীত নিয়ে গাইল। বোতল বের করে গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি নিল রানা। দিনটার কথা ভাবল ও। খুব খারাপ কাটেনি। অন্তত, তার কাছ থেকে কি আশা করা যাবে আর কি আশা করা যাবে না, এটা সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া গেছে।

একতলা। নিচে বিছানায় শুয়ে জেগে আছে লুবনা। ঘরের জানালা খোলা, গানের মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে। খানিক পর গানটা থেমে গেল। নতুন একটা ক্যাসেট শুরু হল এবার। ভরাট, ভারি, একটু নাকা গলা। কিন্তু ইটালিয়ান নয়, ইংরেজিও নয়, এই ভাষা আগে কখনও শোনেনি লুবনা। একের পর এক গান বাজছে। কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল সে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর শেষ গানের প্রথম কয়েকটা শব্দ যেন ধরতে পারল। সো যা রাজকুমারী···এর মানে কি?

গানটা শুনছে লুবনা, আর তার চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। একবার সে ভাবল, এটা কি ঘুমপাড়ানি গান? হঠাৎ তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল। গান থেমে গেছে। কিন্তু আবার বাজল ক্যাসেট। আবার সেই একই গান, সো যা রাজকুমারী··· শুনতে শুনতে এবার ঘুমিয়ে পড়ল লুবনা।

সাত

লুবনাকে দেখার জন্যে বাড়িতে লোক রয়েছে, কাজেই স্বামীর সাথে এখন আবার বিদেশে যেতে পারে লরা। এশিয়া বা আফ্রিকা ভ্রমণে তার তেমন কোন উৎসাহ নেই, কিন্তু ভিটো ইউরোপের কোন শহরে বা আমেরিকায় গেলে সাথে যাবার সুযোগটা কখনও ছাড়েনি সে। স্ত্রী সাথে গেলে ভিটোও খুব খুশি হয়। সাধারণত বোটের বাজার ধরতে যায় সে, লরার রূপ আর ব্যক্তিত্ব তার বিক্রি অনেক বাড়িয়ে দেয়।

হাসানের ছুটিছাটার ব্যাপারটা কি রকম হবে আলোচনা করতে ভুলে গেছে ভিটো। তারা স্বামী-স্ত্রী দেশের বাইরে গেলে লুবনার সাথে থাকতে হবে হাসানকে।

আলোচনার দয়িত্ব স্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিল ভিটো, বলতেই হাসান রাজি হয়ে গেল দেখে স্বস্তিবোধ করল লরা। ছুটির ব্যাপারে রানা কিছু ভাবেইনি। লরাকে সে বলেছে, মাঝেমধ্যে তাকে বাইরে ডিনার খেতে হতে পারে, তবে সেটা ওরা যখন বাড়িতে থাকবে তখন। লরা উপলব্ধি করল, লোকটার কোন সংসার বা বাঁধন না থাকায় মস্ত সুবিধে হয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে প্যারিসে চলে গেল ওরা।

ডকইয়ার্ডের জন্যে নতুন মেশিনপত্র কেনার ব্যাপারে আলোচনা করতে যাচ্ছে ভিটো। মেশিনগুলোর দাম পড়বে প্রায় চারশো মিলিয়ন লিরা। ফ্রেঞ্চরা যদি মোটা অঙ্কের বাকি না দেয়, হতাশ হয়ে ফিরতে হবে তাকে। নিজের ওপর তার আস্থা আছে, ওদেরকে রাজি করাতে পারবে বলে বিশ্বাস করে। তাছাড়া, সাথে একটা জাদুর কাঠি অর্থাৎ লরা থাকছে। ও যদি কোম্পানির ডিরেক্টরদের দু'একজনকে মুগ্ধ করতে পারে, তাতেই নব্বই ভাগ কাজ হয়ে যাবে।

মা-বাবার অনুপস্থিতি মানে কিচেনে বসে খাবে লুবনা। লুবনার আচরণে রানা খুশি—মেয়েটা ওকে এড়িয়ে চলে। রানার ওপর রাগ দেখায় না সে, চেহারা থেকে অভিমানের ছাপটুকুও মুছে ফেলেছে। ভাবটা যেন কিছুই ঘটেনি বা ঘটছে না, রানা যেন একটা দরকারি কিন্তু একঘেয়ে জীব।

কাজেই খেতে বসে তার কথা বলার লোক বলতে আথিয়া আর লার্দো। খুব আদরের সাথে তাকে উপদেশ দেয় আথিয়া, 'এত কম খায় না, মা-মণি। তোমার এখন উঠতি বয়স, সামনে যা দেয়া হবে গোগ্রাসে গিলে ফেলবে...।'

রানা না থাকলে আথিয়ার সাথে কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু করে দিত লুবনা। কিন্তু এখন সে শুধু চুপচাপ থাকে, মুখ তুলে তাকায়ও না। বুড়ো লার্দোর সাথে তার ভারি ভাব, শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে কথা বলে। পাল্টা কোন জবাব না পেয়ে উপদেশ দেয়ার উৎসাহ এক সময় হারিয়ে ফেলে আথিয়া, আর তখনই আলাপ শুরু করে লুবনা। সে, লার্দো আর আথিয়া গল্প করতে থাকে। রানা লক্ষ্য করেছে, ওরা দু'জনেই মেয়েটাকে খুব ভালবাসে, ওদের সাথে লুবনা খাচ্ছে দেখে দু'জনেরই আনন্দের সীমা নেই।

কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই আসলে লুবনার একটা চাল। মায়ের মতই মেয়ের মধ্যেও রয়েছে স্বভাবসুলভ অভিনয় প্রতিভা। রানার প্রতি তার আচরণ একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ মাত্র। অত্যন্ত সাবধানে, একটু একটু করে এগোচ্ছে সে, রানা যেন কিছু টের না পায়।

প্রথমে লুবনা ঠিক করল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে সে, আবিষ্কার করবে লোকটার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোথায় কি দুর্বলতা আছে। দুর্বলতা যে আছে সে ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই। জীবন আর দুনিয়া সম্পর্কে আগ্রহ নেই, এমন মানুষ স্রেফ থাকতে পারে না। কাজেই সে অপেক্ষা করছে, অপেক্ষার সময়টা কাটছে আথিয়া আর লার্দোর সাথে গল্প করে। রানার ওপরও তীক্ষ্ণ নজর আছে

তার, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ওর ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ বা মাথাব্যথা নেই।

দিন কাটতে লাগল, সেই সাথে চলতি সময় আর পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে শিখল রানা। সচেতনভাবে কিছু চিন্তা না করেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা শিথিল করল ও, পছন্দ না হলেও কারও কারও আচরণ এখন ও সইতে পারে। এমন কিছু ঘটছে না যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এমন কিছু অর্জন করার নেই যে প্ল্যান করতে হবে, তেমন কিছুর সাথে নিজেকে জড়ায়নি যে ভাবাবেগের রাশ টেনে ধরতে হবে। চাকরিটা আরামের, সময়টা কেটে যায়। এভাবে কতদিন চলবে, ভাবেনি ও। আপাতত ও খুশি, কারও সাথে কোন বিরোধ নেই, অভিযোগও নেই।

ওর মদ খাওয়া একটু কমেছে। কোন কোন সকালে দেখা যায়, বোতলের নিচের দিকে এক-আধটু হুইস্কি রয়ে গেছে।

একটা রুটিন দাঁড়িয়ে গেল। সকালে লুবনাকে স্কুলে দিয়ে আসে রানা, বিকেল পাঁচটায় ফিরিয়ে আনে। মাঝখানের সময়টা ওর ছুটি। মাঝেমধ্যে মিলানের সুপার মার্কেটে গিয়ে দু'একটা বই বা ক্যাসেট কেনে, বেশিরভাগ দিন সোজা বাড়িতে ফিরে আসে। বিরাট এলাকা নিয়ে বাড়িটা, কোথাও ঝোপঝাড় গজিয়েছে, পিছনে দু'এক জায়গায় ভেঙে গেছে পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। মালি লার্দোকে অনেক কাজে সাহায্য করে ও। কোথাও কোন কাজ পড়ে থাকতে দেখলে কাউকে কিছু না বলে নিজেই সেটা হাতে নেয় ও। ওর এই অভ্যেসটা দেখে রেমারিক একদিন মন্তব্য করেছিল, আর কিছু না, এ হল অপরাধবোধ—জীবনের বেশিরভাগ সময় তো এটা-সেটা ধ্বংস করেই কাটল, কিছু মেরামত না করলে কি চলে? স্রেফ একটা কথার কথা, আসল ব্যাপারটা ঠিক উল্টো, রেমারিকও সেটা জানে। বেশিরভাগ ধ্বংসই করেছে রানা, গড়েছে কম, কিন্তু সেগুলো ছিল ন্যায়, সভ্যতা আর শান্তির পথে এক একটা বাধা। এই বাধা ভাঙতে না পারলে সৃষ্টি গতি পাবে না, কাজেই এই ধ্বংসের মধ্যেও কম গৌরব নেই।

লার্দো একা সব কাজ পেরে ওঠে না। রানার উৎসাহ দেখে তার প্রাচীন রক্তে যেন বান ডাকল। বাড়ির পিছন দিকটা ক্রমশ উঁচু হয়ে, তারপর প্রায় খাড়া হয়ে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। ওদিকেই ঝোপঝাড় জন্মেছে, কাঠের বেড়াটাও মেরামত করা দরকার। লার্দো বার বার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করে এড়িয়ে গেছে ভিটো, টাকা আর বের করেনি। প্রথমে দু'জনে মিলে ঝোপঝাড় কেটে সাফ করল ওরা। তারপর নিজের পকেটের টাকা থেকে কিছু কাঠ, তার ও পেরেক কিনে আনল রানা। বেড়াটা মেরামতের কাজে হাত দিল ওরা, শেষ করতে কয়েক হপ্তা লাগবে। ভিটো কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, বাড়ির নিরাপত্তার জন্যে ভাঙা বেড়া একটা হুমকি হয়ে ছিল।

সারাদিন খাটতে হয়, তাই সন্ধে হতে না হতেই প্রচণ্ড খিদে নিয়ে ডিনারে

বসে পড়ে ওরা। সবাই ধরে নিয়েছিল লুবনা এত তাড়াতাড়ি খেতে আসবে না। কিন্তু দেখা গেল সে-ও সময় মত হাজির হয়ে যায়। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে এক কি দু'ঘন্টা কিচেনে বসেই বই পড়ে রানা, কিংবা টেলিভিশন দেখে। বাকি তিনজন নিজেদের মধ্যে গল্প করে।

ঠিক এই রকম একটা সময়ে, মা-বাবা ফিরে আসতে আর দু'দিন বাকি আছে, হাসানের বর্মে প্রথম ফুটোটা দেখতে পেল লুবনা। টেলিভিশনে ভাল কিছু না থাকলে সেদিনের খবরের কাগজ অথবা কোন পত্রিকা পড়ে সে। বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়তে হয় তাকে, কারণ কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে আথিয়া আর লার্দো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চায় সব।

সেদিন লুবনার পড়া শেষ হতেই আথিয়া আর লার্দোর প্রশ্নপর্ব শুরু হল। ওদের কথায় মন ছিল না রানার, কিন্তু একটা শব্দ ওর কানে বাজল—প্যালেস্টাইন। লার্দো একটা প্রশ্ন করেছে, উত্তরে লুবনা বলল, 'এখানে লিখেছে লেবাননে কমাণ্ডো হামলা চালিয়ে প্যালেস্টাইনীদের একটা ঘাটি ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েলিরা। প্যালেস্টাইনীরা ঠিক কি চায় তা তো আমি বলতে পারব না।'

এই প্রথম ওদের আলোচনায় যোগ দিল রানা। প্যালেস্টাইন জায়গাটা কোথায়, ইহুদিদের জবরদখল, অত্যাচার, উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইনীদের দুর্দশা, তাদের গেরিলা ট্রেনিং, দলাদলি, ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা বলল ও। গভীর মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনল ওরা।

এরপর লুবনা আরেকটা প্রসঙ্গের অবতারণা করল। তৃতীয় বিশ্ব কি? ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রসঙ্গও চলে এল। ব্রিটিশরা কিভাবে শোষণ করেছে কিভাবে পাচার হয়েছে সম্পদ, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেন আজও অশিক্ষা, গোঁড়ামি আর কুসংস্কার, সব বিষয়েই দু'চার কথা বলল রানা।

তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল ও, বইটা তুলে নিল হাতে। গোটা ব্যাপারটাই অপ্রত্যাশিত, ওর কাছ থেকে কেউ আশা করেনি। লুবনা কোন রকম চাপ তো দেয়ইনি, সরাসরি একটা প্রশ্নও করেনি রানাকে। রানা থামতে আথিয়ার সাথে আলাপ জুড়ে দিল সে। কয়েক মিনিট পর উঠে দাঁড়াল রানা, ভারি গলায় গুডনাইট বলে নিজের কামরায় চলে গেল।

ওর পিছনে দরজা বন্ধ হতে আপনমনে হাসল লুবনা। 'তোমার একটা দুর্বলতা টের পেয়ে গেছি,' মনে মনে বলল সে। 'এক পা এগোলাম।'

পরদিন স্কুলে যাবার পথে বা ফেরার পথে লুবনা একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। সেদিন ডিনারের পর টেলিভিশন দেখায় মন দিল সে। রানার যেন কোন অস্তিত্বই নেই। মনে মনে স্বস্তি বোধ করল রানা। কিন্তু মেয়েটার ষড়যন্ত্র যদি টের পেত, অশান্তি পেয়ে বসত ওকে। তবে স্বীকার করতে বাধ্য হত, লুবনার রণ-কৌশল নিখুঁত সামরিক নিয়মে বাঁধা। প্রথমে টার্গেট সম্পর্কে পরিষ্কার একটা

ধারণা। তারপর দুর্বলতা আবিষ্কার। সবশেষে শত্রুর দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাবার ব্যবস্থা করা, আর তারপরই পিছন দিয়ে চুপিচুপি ঢুকে পড়ে ঘাঁটি দখল করে নেয়া। লুবনা দক্ষ একজন গেরিলা নেতা হতে পারত।

রিসো আর জুলিয়ানাকে নিয়ে মিলানের মনোরেলি'স-এ ডিনার খেতে এল রানা। রেস্তোরাঁর ব্যাপারে সুপারিশ ছিল আথিয়ার। মিলানে আসার পর প্রথম ওখানেই চাকরি হয় তার। মিলানে মনোরেলি'স-এর মেনু নাকি একটা বিস্ময়। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করে আথিয়া আরও বলল, তবে বিল খুব বেশি হবে।

জুলিয়ানার জন্যে আজকের সন্ধে বিরাট একটা উৎসব। রিসো কাজে ব্যস্ত থাকে বলে বাইরে ডিনার খাওয়ার সুযোগই হয় না তার। একা একা বাইরে বেরুতে তার ভাল লাগে না। মনোরেলি'স-এর নাম শুনে তার আনন্দ উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

রিজার্ভেশনের জন্যে ফোন করেছিল আথিয়া। রেস্তোরাঁয় পৌঁছে রানা বুঝল, নিজের সম্পর্কে খুব কম করে বলেছে আথিয়া। ওদের জন্যে সেরা একটা টেবিল রাখা হয়েছে, এবং খোদ মালিক এগিয়ে এসে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। কথায় কথায় জানা গেল, আথিয়া এখানে সাধারণ ওয়েট্রেস ছিল না, কিচেনের দায়িত্বে ছিল। আভান্তি পরিবার প্রায়ই এখানে আসে, সেই সূত্রেই আথিয়ার সাথে তাদের পরিচয় হয়েছিল।

প্রথমে হালকা পাস্তা পরিবেশন করা হল, তারপর ইন্তারকোস্তা পিসেলি আর রোজমেরী। ঢিলেঢালা, হাসিখুশি পরিবেশ, চাকরিতে ঢোকার পর আজই প্রথম বাইরে ডিনার খাচ্ছে রানা। আর জুলিয়ানার আমোদ-আহ্লাদ কাউকে স্পর্শ না করে পারে না।

রানার মুড দেখে একটু অবাকই হল রিসো। এক মাস আগে জুলিয়ানার রসিকতায় বিরক্তি প্রকাশ না করলেও, হাসেনি রানা। কিন্তু আজ ওর ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা গেল। মেয়েলি কৌতূহল নিয়ে আভান্তি পরিবার, বিশেষ করে লরা সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাইল জুলিয়ানা, বলল, ভদ্রমহিলার রূপের নাকি তুলনা হয় না, অভিজাত মহলে তার নাকি সাংঘাতিক খাতির। লোকে যা বলে, লরা কি সত্যি অতটা সুন্দরী? ছোট্ট করে জবাব দিল রানা, হ্যাঁ।

স্বামীর উদ্দেশে একটা চোখ টিপে রানাকে জিজ্ঞেস করল জুলিয়ানা, 'মা আর মেয়ের মধ্যে কে বেশি সুন্দরী?'

গম্ভীর হয়ে উঠল রানা, জুলিয়ানার দিকে তাকাল। ভারি গলায় বলল, 'মেয়ে। এ প্রসঙ্গ কেন?'

জুলিয়ানা বুদ্ধিমতী মেয়ে, মেসেজটা পেয়ে সাবধান হয়ে গেল সে।

লুবনাকে ঘিরেই ঘুরছে রানার চিন্তা। প্যালেস্টাইনীদের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা

করার দু'তিন দিন পর লুবনা তাকে খোলাখুলি দু'একটা প্রশ্ন করেছে। বোঝাই যায়, জানার অদম্য উৎসাহ রয়েছে মেয়েটার মধ্যে। গত পরশুই তো, স্কুলে যাবার পথে পিছনের সিট থেকে হিউম্যান রাইট সম্পর্কে জানতে চাইল। বিষয়টা নিয়ে কাগজে খুব লেখালেখি হচ্ছে, প্রসঙ্গটা প্রথম তোলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, তারপর অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা তাঁকে সমর্থন করে বিবৃতি দিতে শুরু করেন। সবারই এক কথা, মানবাধিকারের অবমাননা করা চলবে না।

উত্তরে রানা বলেছে, মানবাধিকার মানে ব্যক্তির স্বাধীনতা, এবং একটা সমাজে বসবাসরত সবার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হবার অধিকার। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট করা যায়নি লুবনাকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও অনেক প্রশ্ন তোলে সে। মেয়েটার দুর্বার আগ্রহ দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথা বলতে হয় রানাকে। রাজনীতি প্রসঙ্গ এসে যায়। ডানপন্থী বামপন্থী কাদের বলে, গণতন্ত্র কি, এসব যখন ব্যাখ্যা করছে, স্কুলে পৌঁছে যায় ওরা। রানার ধারণা ছিল, ফেরার পথে আবার প্রসঙ্গটা তুলবে লুবনা, কিন্তু না, একদম চুপচাপ ছিল সে।

অতীত রোমন্থনে বাধা পড়ল, একজন লোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। আভান্তি পরিবারের সেই বন্ধু, আলবারগো লোরান।

'মি. হাসান না?'

লোকটাকে পছন্দ না হলেও, ভদ্রতার খাতিরে রিসো আর জুলিয়ানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রানা। লক্ষ করল, জুলিয়ানার দিকে কুঁতকুঁতে চোখে তাকিয়ে ঘন আর চওড়া গোঁফের ভেতর মিটমিট করে হাসছে লোরান। গায়ে জ্বালা ধরে গেল রানার।

'আপনার রুচির প্রশংসা করতে হয়,' বলল লোরান। 'মিলানের সবচেয়ে ভাল রেস্তোরাঁ এটা। ডিনার কেমন লাগল?'

ডিনারের প্রশংসা করল সবাই। জুলিয়ানাকে দাঁত বের করা আরও খানিকটা হাসি দিয়ে চলে গেল লোরান। খানিক পর ওয়েটার এসে ওদেরকে পানীয় পরিবেশন করল, বলল, মি. আলবারগো লোরান পাঠিয়েছেন।

'অদ্ভুত লোক তো,' মন্তব্য করল জুলিয়ানা।

'হাঙর,' বলল রিসো। 'কিন্তু ভারি চালাক। ব্যবসায়ী মহলে সবাই ওকে চেনে। সরকার আর মাফিয়া, দুই রাক্ষসের সাথেই নিরেট যোগাযোগ আছে ওর। শুনতে পাই, ও নাকি বলেই বেড়ায়—সরকার, ব্যবসা আর ক্রাইমের মধ্যে এখন আর বলতে গেলে প্রায় কোন পার্থক্যই নেই। আপনার বসের স্ত্রীর সাথে লোকটার একটা অ্যাফেয়ার আছে।'

মনে মনে একটা ধাক্কা খেল রানা। লরার কারও সাথে জড়িয়ে পড়াটা আশ্চর্যের কিছু না, কিন্তু এত থাকতে লোরান? রুচিতে বাধল না!

'ভিটো আভান্তিকে ব্যাঙ্ক লোন পাইয়ে দেয়ার জন্যে কাজ করছে লোরান,'

বলল রিসো। 'লোরান নাকি ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দিয়ে হলেও বন্ধুকে এ যাত্রা উদ্ধার করবে।'

'তোমার ফার্ম কি ভিটোর খাতাপত্র অডিট করে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল রিসো। 'কিন্তু সব কথাই আমাদের কানে আসে।'

মনোরেলি'স-এর মালিক মনোরেলি এবার স্বয়ং উদয় হল। তার তরফ থেকে আরেক প্রস্থ ড্রিঙ্ক পরিবেশন করা হল ওদেরকে। ইতিমধ্যে ওরা নিজেরাও বারকয়েক কনিয়াকের অর্ডার দিয়েছে। ফলে সামান্য একটু নেশা মত ধরল জুলিয়ানাকে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার সময় দু'জনের মাঝখানে থাকল সে, রিসো আর রানার দুই কাঁধে দুটো হাত তুলে দিল। বেরুবার আগে লোরানের টেবিলের পাশ ঘেঁষে আসতে হল ওদেরকে। লোরান হাত দেখাতে একবার থামতেও হল। টেবিলে লোরানের সাথে হোঁৎকা চেহারার দু'জন লোক রয়েছে। দু'জনের একজনকে ইংরেজ বলে মনে হল রানার, পোশাক দেখে ধারণা হল ব্যাঙ্কার। খুব উৎসাহের সাথে রানাকে দেখাল লোরান, বলল, 'লুবনা আভান্তির বডিগার্ড। ভারি অভিজ্ঞ।' কেন যেন, লোরানের হাসিটা ব্যাঙ্গাত্মক বলে মনে হল রানার।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসার পর রানার দুই গালে চুমো খেল জুলিয়ানা, ধন্যবাদ দিয়ে অনুরোধ করল যে-কোন রোববারে রানা যেন লাঞ্চ খেতে ওদের বাড়িতে আসে।

প্যারিস থেকে ফিরে আবার বন্ধুকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে বসল ভিটো। বডিগার্ড প্রসঙ্গটা লোরানই তুলল, 'এত সস্তায় ওকে তুমি বাগালে কিভাবে?'

'লোকটা মদ খায়। এলকোহলিক।'

'আচ্ছা!' মাথা ঝাঁকাল লোরান। 'কিন্তু দেখে তো মনে হয় না!'

'শুধু রাতে খায়। তবে ও নিজে আমাকে বলেছে মদ ওর শরীরের বারোটা বাজাচ্ছে। অবশ্য গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধে হয় না। এমনিতে লোকটা খুব কাজের, আমাদের বেড়া মেরামত করে দিচ্ছে, ঝোপঝাড় কেটেছেঁটে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেছে গোটা বাড়ি।'

'তারমানে প্রায় বিনা পয়সায় প্রচুর সার্ভিস পাচ্ছ,' বলে হাসতে লাগল লোরান। 'সবচেয়ে সুখের কথা, ভাবী এখন খুশি। গিদাস-এ হঠাৎ দেখা হয়েছিল, পরে আমার সাথে ককটেলও খেল। কথা বলে বুঝলাম, মুখ রক্ষা হওয়ায় ভাবীর খরচের হাতও আর আগের মত নেই।'

'না, নেই,' স্বীকার করল ভিটো। 'মিলানে এখনও আসে বটে, কিন্তু আগের মত কেনাকাটা করে না।'

এরপর ব্যবসায়িক কথাবার্তা শুরু হল। সারাক্ষণ প্রায় একাই কথা বলে গেল লোরান। চেহারায় থমথমে গাম্ভীর্য, খানিকটা উদ্বেগ, আর গভীর মনোযোগ নিয়ে

তার কথা শুনে গেল ভিটো। খুব নিচু গলায় কথা বলল ওরা। অনেক কথা।

হাসানের ব্যাকগ্রাউণ্ড শুধু লুবনা নয়, আথিয়া আর লার্দোরও জানা হয়ে গেছে। ডিনারে বসে একদিন লার্দো বলল, 'আমিও যুদ্ধে ছিলাম। উত্তর আফ্রিকায় মন্টগোমারী আমাকে বন্দী করেছিল।' কথাটা এমন ভাবে বলল, যেন স্বয়ং ফিল্ড মার্শাল নিজের হাতে তাকে গ্রেফতার করেছিলেন। খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ছোট্ট করে একবার মাথা ঝাঁকাল রানা। এরপরই লুবনা সরাসরি জানতে চাইল, 'তুমি তো রোডেশিয়ায় যুদ্ধ করেছ, তাই না?'

'তুমি জানলে কিভাবে?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রানা।

'বাবার কাছ থেকে।'

কিছু না বলে কাগজে চোখ ফিরিয়ে আনল রানা। এক মিনিট পর উঠে দাঁড়াল ও, নিজের কামরায় চলে গেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান শুনছে লুবনা, আর ভাবছে। বন্ধুত্ব অর্জনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করা বোকামি, বুঝতে পেরেছে সে। শুধু কথাবার্তা বলিয়ে কোন লাভও নেই, তাকে ওর জীবন সম্পর্কে জানতে হবে। গান থেমে যেতে তার চিন্তায় বাধা পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার শোনা গেল, এবার সেই গানটা, সো যা রাজকুমারী, সো যা···।

এক সময় শেষ হল গানটা। তারপর আবার বাজল। দু'বার, কোন কোন দিন তিনবারও এই একই গান বাজায় ও। কি বলা হয়েছে এই গানে? প্রশ্ন করে লাভ নেই, কটমট করে তাকাবে কিন্তু উত্তর দেবে না।

কিন্তু একদিন সে এই গানের অর্থ জানবেই। চোখ ভারি হয়ে আসছে, এই সময় আবার তার মনে হল, এটা কি আসলে কোন ঘুমপাড়ানি গান? তাই যদি হয়, কার জন্যে বাজায় ও? নিজের জন্যে, নাকি তার জন্যে?

যতই এড়িয়ে থাকুক, যতই গাম্ভীর্য দেখাক, ভেতরের মানুষটা নিশ্চয়ই নিষ্প্রাণ নয়। আর নিষ্প্রাণ যদি না হয়, ওর বন্ধুত্ব পাবার জন্যে তার এই যে ব্যাকুলতা, ও কি একটুও তা টের পাবে না?

হয়ত পায়, আর সেজন্যে হয়ত এই ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে। ঠোঁটে তৃপ্তির ক্ষীণ একটু হাসি নিয়ে ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যায় লুবনা।

মাঝখানের পাঁচিলটা হঠাৎ করে ভাঙল। এক হপ্তার জন্যে লণ্ডনে গেছে ওর মা-বাবা। কিচেনে ছিল লুবনা, লার্দো এসে ঘোষণা করল, বাড়ির পিছনের গাছে একটা নাইটিঙ্গেল বাসা বেঁধেছে। বাসায় দুটো ছানাও আছে। সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে তখন, আলো নেই বললেই চলে, তবু জেদ ধরল লুবনা ছানা দুটো তাকে

দেখাতে হবে। প্রায় খাড়া ঢালের অনেক উঁচুতে গাছটা, কিন্তু লম্বা লম্বা পা নিয়ে তর তর করে উঠে যাচ্ছিল লুবনা, উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ দুটো। কিভাবে ঠিক জানা গেল না, সম্ভবত আলগা একটা পাথরে পা পড়ায়, পিছলে নিচে নামতে শুরু করল সে। ঢালটা মসৃণ নয়, বিপদটা সেজন্যেই ঘটল। মাথা উঁচিয়ে থাকা বড়সড় একটা পাথরে এসে ধাক্কা খেল সে, কোমর আর পাঁজর চেপে ধরে 'বাঁচাও!' বলে আর্তনাদ করে উঠল। পা পিছলাবার সময় ডান পায়ের গোড়ালিতেও ব্যথা পেয়েছে সে। খানিকটা দূরে, তার বাঁ দিকে ছিল রানা, যন্ত্রপাতি গুছিয়ে বাক্সে ভরছিল, লুবনার চিৎকার শুনে উড়ে চলে এল যেন।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লুবনা, পাঁজর চেপে ধরে আছে, ব্যথায় নীল হয়ে গেছে চেহারা। হুড়মুড় করে নেমে এসেছে লার্দো, লুবনার মাথা উরুর ওপর নিয়ে বসে আছে।

লুবনার গোড়ালি ছুঁল রানা, আঙুলের চাপ দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল কোথাও হাড় ভেঙেছে কিনা। এরইমধ্যে গোড়ালি ফুলে উঠেছে, কিন্তু হাড়ে কিছু হয়নি, স্রেফ মচকে গেছে পা। এরপর পাঁজর থেকে লুবনার হাত সরিয়ে দিল ও, টি-শার্ট টেনে তুলে দিল ওপর দিকে। চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল লুবনার, শিউরে উঠল বারকয়েক, কিন্তু সেটা সঙ্কোচে নাকি ব্যথায় ঠিক বোঝা গেল না। পাঁজরের নিচে মাখনের মত চামড়া লালচে হয়ে উঠেছে। কয়েকটা পাঁজরের ওপর আঁচড়ের দাগও দেখা গেল। আলতভাবে পাঁজরে আঙুল রাখল রানা, নরম চাপ দিয়ে পরীক্ষা করল। বারবার শিউরে উঠল লুবনা।

'খুব ব্যথা করছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওখানে নয়, আরও নিচের দিকে···মাগো!'

আরও নিচের দিকে বলতে তলপেটের পাশের হাড়, ইঙ্গিতে লুবনা সেটাই বোঝাতে চাইল। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে আবার জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি রকম ব্যথা?'

'প্রচণ্ড,' চোখ বুজে কাতরাতে লাগল লুবনা। 'ওখানে বোধহয় হাড় বলতে কিছু নেই, সব গুঁড়ো হয়ে গেছে!'

ভয় পেয়ে গেল রানা। কিন্তু তারপরই লুবনার কথা শুনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল।

'ওই ওখান থেকে,' হাত তুলে উঁচু ঢালটা দেখাল লুবনা। 'কিভাবে যে পড়লাম বুঝতেই পারিনি। ঘাড় ফিরিয়ে তোমাকে যেই দেখতে গেলাম··· ।'

রানা লক্ষ করল, কান্না চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে লুবনা। হাড় ভেঙে গেলে এত কথা ও বলতে পারত না। 'আমার মনে হয় হাড় ভাঙেনি, শুধু চোট লেগেছে। অন্তত গোড়ালি আর পাঁজর ঠিকই আছে।'

ধুলোর একটা মেঘ তুলে ছুটে এল আথিয়া, হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল

সে। একটা ধমক দিয়ে তাকে থামাল রানা। ঠিক করল, এক্স-রে করাবার জন্যে লুবনাকে কোমোয় নিয়ে যাবে ও। ভিটো বা লরা ফোন করতে পারে, কাজেই বাড়িতে থাকতে হবে আথিয়াকে। লার্দোর চোখের পানিও লুবনার কোন সাহায্যে আসবে না, তাই আথিয়ার সাথে তাকেও থেকে যেতে বলল রানা। তারপর খুব সাবধানে, জখমে যাতে চাপ না লাগে, দু'হাতে পাঁজাকোলা করে লুবনাকে তুলে গাড়িতে নিয়ে এল।

এক্স-রে থেকে জানা গেল, কোথাও কিছু ভাঙেনি। ডাক্তার লুবনার গোড়ালি ব্যাণ্ডেজ করে দিল, আর ব্যথা কমাবার জন্যে পেইনকিলার দিল কয়েকটা।

বাড়ি ফিরে আথিয়া আর লার্দোকে আশ্বস্ত করল রানা, লুবনাকে বয়ে নিয়ে এল তার বেডরুমে। আথিয়া তাকে আরাম করে শুতে সাহায্য করছে, কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও, হলঘর থেকে টেলিফোন করল লণ্ডনে। রিসিভার তুলল লরা। লুবনার পড়ে যাওয়ার কথাটা বলল রানা। না, তাড়াহুড়ো করে চলে আসার দরকার নেই। গোড়ালি মচকে গেছে আর দু'এক জায়গায় আঁচড় লেগেছে। কাল সকালে স্কুলেও হয়ত যেতে পারবে লুবনা। ঠিক আছে, লুবনাকে ওদের ভালবাসা জানাবে সে। রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। তারপর লুবনার ঘরে ফিরে এল আবার।

দুটো বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে আছে লুবনা। তার পাশে ভেলভেটে মোড়া মেটে রঙের ঢাউস একটা সিংহ। রানাকে দেখেই খেলনাটা লুকাতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সিংহটাকে খুঁটিয়ে দেখল রানা, অনেক দিনের পুরানো, তুবড়ে গেছে। বিছানার কিনারায় বসল ও। হাসিটা চেপে রাখল। 'এখন ভাল লাগছে?'

বিষণ্নভাবে মাথা ঝাঁকাল লুবনা।

সিংহটা দেখিয়ে রানা জানতে চাইল, 'এটা বুঝি তোমার খেলনা?'

'য্যাহ্!' কিল তুলল লুবনা। 'আমি কি ছোট নাকি যে ওটা নিয়ে খেলব!'

'তাহলে কার?'

বিপাকে পড়ে গেল লুবনা। কি বলবে ভেবে পেল না। তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'ছোটবেলায় এটা আমারই ছিল। এখন আর খেলি না।'

'ও,' বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তা নাম কি এর?'

'ওর কোন নাম নেই,' বলল লুবনা।

সাদা বালিশে ছড়িয়ে থাকা লুবনার চুল কুচকুচে কালো, মুখটা ম্লান। ভক্তি আর গাম্ভীর্যের সাথে রানার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রানা। 'ট্যাবলেট খেলে তোমার ঘুম পাবে। ব্যথা বাড়লে রাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে, তখন আরও দুটো খেয়ে নিয়ো।' দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল আবার। 'ফোনে তোমার মার সাথে কথা বলেছি। ওরা তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছে।'

'ধন্যবাদ। গুড নাইট, হাসান।'

'গুডনাইট, লুবনা,' ভারি গলায় বলল রানা।

ট্যাবলেট খাওয়ায় সত্যি ঘুম পেল লুবনার। আলো নিভিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল সিংহটাকে, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। রানাকে মিথ্যে কথা বলেছে সে। এটার একটা নাম আছে।

লণ্ডন সিটি হোটেলে ফিরে স্ত্রীর কাছ থেকে দুঃসংবাদটা শুনল ভিটো। ডিনারের জন্যে তৈরি হতে হবে তাকে, ব্যস্ত। তার এজেন্ট নতুন একটা প্রস্তাব নিয়ে কথা বলবে আজ। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে লরার সাথে কথা বলল সে। 'তুমি ফিরে যেতে চাও না? রাতে মিলানে যাবার একটা ফ্লাইট আছে।'

বাথরূমের দরজায় হেলান দিয়ে রয়েছে লরা। মাথা নাড়ল সে। 'হাসান বলল ও ভাল আছে।'

শ্যাম্পুর জন্যে হাতড়াল ভিটো, এগিয়ে গিয়ে বোতলটা স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিল লরা। 'এ খুব ভাল হয়েছে, তাই না?'

'কি ভাল হয়েছে?' মাথায় শ্যাম্পু ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করল ভিটো।

'বাড়িতে এই রকম একটা কাজের লোক থাকা, নিশ্চিন্তে বাইরে বেরোনো যায়। হাসান না থাকলে কি হত চিন্তা করতে পার? আথিয়া নার্ভাস হয়ে পড়ত, পড়িমরি করে ছুটে যেতে হত আমাকে। অথচ আজকের ডিনারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই না?'

'হ্যাঁ, খুব গুরুত্বপূর্ণ,' বলল ভিটো। বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল সে। প্রকাণ্ড একটা গরম তোয়ালে দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। 'আমাদের এজেন্ট কলিন বলছে দাম একটু বাড়িয়ে ধরলেও বাজার হাতছাড়া হবে না, কারণ এই এলাকায় আমাদের বোট এখনও সেরা। তবে বাকি দিতে হবে। আমার মনে হয় আমরা বাকি দিলে কলিনের লাভ হয়। ওকে বোঝাতে হবে...'

'বোঝাবার দায়িত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বলল লরা।

দাড়ি কামাতে কামাতে হাসল ভিটো। সন্দেহ নেই, হাসান একটা ভাল ইনভেস্টমেন্ট।

পরদিন ভোরবেলা প্রথমে ঘুম ভাঙল লরার। রাতের ডিনারের কথাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ল তার। কলিনকে বোঝাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তার। মিষ্টি হাসি, হাত ধরতে দেয়ার সুযোগ, পরে গায়ে গা ঠেকিয়ে খানিক নাচানো, মতলব হাসিল হয়ে গেছে।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল লরার। ইস্, কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সে। হাত দিয়ে ভিটোকে ধাক্কা দিল, বলল, 'এই শুনছ?'

'কি হল?' কাল রাতে ভিটোর একটু বেশি মদ খাওয়া হয়ে গেছে।

'বলতে ভুলে গেছি, এক ভদ্রলোক কাল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে ফোন করেছিলেন তোমাকে। বললেন, কাল সকাল এগারোটায় তাঁর অফিসে।' স্বামীর গায়ের ওপর ঢলে পড়ল সে। 'ব্যাপারটা কি গো?'

'কিছু না, টাকা-পয়সার একটা ব্যাপার,' জড়ানো গলায় বলল ভিটো। 'ভদ্রলোক লোরানের বন্ধু।'

'সিরিয়াস কিছু?'

বিড়বিড় করে কি বলল ভিটো, বোঝা গেল না। তারপর আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ধাপ ক'টা টপকাল লুবনা, গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। পিছনের দরজা খুলে এক পাশে সরে গেল রানা। খানিক ইতস্তত করে লুবনা বলল, 'আমি বরং সামনেই বসি। তাহলে পা লম্বা করার জন্যে বেশি জায়গা পাব।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে রানা জিজ্ঞেস করল, 'রাতে ভাল ঘুম হয়েছে?'

'হয়েছে। শুধু পাশ ফেরার সময় একবার কিছুক্ষণের জন্যে ঘুম ভেঙেছিল।'

'গোড়ালির ব্যথা কমেছে? শরীরের ভার চাপাতে পার?'

'একটু কমেছে,' বলল লুবনা। 'ভাল হতে কি অনেক সময় লেগে যাবে?' উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। 'আর পাঁচ হপ্তা পর স্কুল স্পোর্টস। হানড্রেড মিটার দৌড়ে নাম দিয়েছি আমি।'

'পাঁচ হপ্তা অনেক সময়,' বলল রানা। 'বেশি দয়া দেখিয়ো না ওটাকে। যতটা পার ভার চাপাবে দু'এক হপ্তার মধ্যে টেরই পাবে না কিছু।'

মেইন মিলান রোডে উঠে এল গাড়ি। রানা জানতে চাইল, 'কেমন দৌড়াও তুমি?'

'ভালই, কিন্তু শুরুটা আমার হয় না। সবাই পাঁচ-সাত হাত এগিয়ে যাবার পর আমি রওনা দিই। ওদের পাশে যখন আসি, তখন আর সময় থাকে না।'

'তারমানে প্র্যাকটিস দরকার।'

কোঅর্ডিশেন আর রিয়্যাকশন টাইম সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে রানা, জানে লুবনাকে ট্রেনিং দিতে পারবে সে। কিন্তু সময় মত নিজেকে সামলে নিল, প্রস্তাবটা উচ্চারণ করল না। বেশি জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।

এরপর আর কথা হল না।

লুবনা অনেক বদলে গেছে। এখন আর ব্যাপারটা তার কাছে শুধু খেলা নয়, নয় শুধু রানাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়ার ছেলেমানুষি একটা ঝোঁক। রানা তার কাছে এখন একটা আলাদা জগৎ, যে জগতকে সে দেখতে পায়, কিন্তু প্রবেশের অনুমতি মেলে না। স্বভাবসুলভ কৌতূহল আর সচেতনতার সাহায্যে মানুষটার ভেতরের

কিছু কিছু আলো পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছে সে। এখন সবটুকু দেখতে চায়, আর কিছু দিতেও চায়। ওকে কখনও হাসতে দেখেনি লুবনা। প্রতি মুহূর্তে একা, সবসময় নির্লিপ্ত। তার বিশ্বাস, এই লোক যদি নিজেকে মেলে ধরে, আশ্চর্য সুন্দর কিছু বেরিয়ে আসবে।

সেদিন বিকেলে, স্কুল থেকে ফেরার পথে লুবনা আমেরিকা আবিষ্কার সম্পর্কে জানতে চাইল। বিষয়টা এই প্রথম ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে, আমেরিকা মহাদেশ একজন ইটালিয়ান আবিষ্কার করেছে জেনে লুবনা অভিভূত।

রানা বলল, 'ব্যাপারটা তা নাও হতে পারে। কেউ কেউ বিশ্বাস করে ভাইকিংরাই প্রথমে ওখানে গিয়েছিল। আবার কারও কারও বিশ্বাস, একজন আইরিশ সন্ন্যাসী প্রথম আমেরিকায় যায়।'

এরপর অভিযাত্রীদের নিয়ে শুরু হল আলোচনা। রানা ওকে মার্কো পোলো আর তাঁর চীন অভিযানের কথা বলল। এসব বিষয়ে খুব কমই জানে লুবনা, কিন্তু জানার আগ্রহ তার প্রচণ্ড। দু'দিন পর ডিনারের সময় লুবনার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল রানা। বলল, 'এই বইটা পড়লে মার্কো পোলোর অভিযান সম্পর্কে জানতে পারবে তুমি। মিলানের একটা দোকানে দেখতে পেয়ে নিয়ে এলাম।' আসলে বইটা খুঁজে বের করতে দেড় ঘন্টা সময় লেগেছে রানার।

'আমার জন্যে? উপহার?' উত্তেজনায় চকচক করছে লুবনার চোখ।

'হ্যাঁ, মানে,' অস্বস্তি বোধ করল রানা। 'তোমার খুব আগ্রহ দেখলাম, তাই। ইনি ইটালির সবচেয়ে বিখ্যাত অভিযাত্রী, ওঁর সম্পর্কে তোমার জানা দরকার।'

'ধন্যবাদ, হাসান,' নরম গলায় বলল লুবনা। অনুমান করল, তার সাধনা সফল হয়েছে।

পরের রোববারে আর কোন সন্দেহ থাকল না তার।

আট

'আচ্ছা, কংকিউবাইন কি?'

রাস্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে লুবনার দিকে একবার তাকাল রানা। ওর এ-ধরনের প্রশ্নে এখন আর অবাক হয় না সে। 'এক রকম বউ-ই বলা যায়।'

হতভম্ব দেখাল লুবনাকে। 'বউ? কিন্তু চীন সম্রাটের যে এক হাজারেরও বেশি ছিল! তা কি করে হয়?'

এধরনের বিষয় জটিল নয়, তাই সাবধান হবার দরকার করে না, এটা আগেই উপলব্ধি করেছে রানা। বয়স যাই হোক, মানসিকভাবে পরিণত হয়ে উঠেছে লুবনা। নারী পুরুষের সম্পর্ক, মিলন ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ নয় সে। মার্কো পোলোর ওপর লেখা বইটা তার মনে এধরনের অনেক প্রশ্ন তুলেছে। অনেক

সমাজেই বহু বিবাহের চল আছে, এ-কথা শুনে খিল খিল করে হাসলও না লুবনা, বা মেয়েলি ঢঙে পাকা কোন মন্তব্যও করল না। তার সহানুভূতি পুরুষদের প্রতি, জানতে পেরে হাসি পেল রানার।

'এতগুলো বউ, বেচারা স্বামীদের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে,' চিন্তিতভাবে বলল লুবনা। হয়ত নিজের মায়ের কথা ভাবছে সে। খুব বেশি হলে একজন লরাকেই কোন পুরুষ কোনরকমে সামলাতে পারে। এক হাজার লরা, ভাবতেও ভয় লাগে।

এখন আর আংশিক উত্তর দেয় না রানা, সবটা বুঝিয়ে বলে, আর বলেও এমনভাবে, যেন পরিণত বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে।

লুবনা রাজনৈতিক ভাষণ পছন্দ করে না, নেতারা কেউ কথা বলতে শুরু করলে টিভি অফ করে দেয় সে, কারণ তার ধারণা ওঁরা বেশিকথা বলেন, আর ওঁদের হাসি কৃত্রিম। ধর্মের ব্যাপারেও তার মন্তব্য আছে। ধর্ম ভাল জিনিস, কিন্তু প্রিস্টরা যা বলবে সব সময় তাই সত্যি হবে, এটা মেনে নেয়া যায় না। স্কুলে যেতে তার ভাল লাগে, কিন্তু শিক্ষককে যদি পছন্দ হয় তবেই তার মন বসে পড়ায়।

জীবন সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা আছে তার, সেগুলো দেখিয়ে দেয় রানা। এখন এমনকি রানার সঙ্গে তর্ক করতেও সাহস পায় সে।

মিষ্টি, সুন্দর একটা সম্পর্ক শেকড় গাড়ছে, রোববারের লাঞ্চ তাতে পানি ঢালল। লুবনা জানল, মনের দরজা খুলে দিয়েছে হাসান, কৃতজ্ঞতার সাথে ভেতরে ঢুকল সে।

খুশি ধরে না, তবু খুব সাবধান ছিল লুবনা। হাসান তার নতুন পাওয়া একটা জগৎ, হঠাৎ বোকার মত কিছু একটা করে বসে সেটাকে সে বৈরী করে তুলতে চায়নি। রিসোদের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে গিয়ে সে দেখল, হাসানের চেহারায় গাম্ভীর্য থাকলেও পেশীতে টান টান ভাব নেই, চোখে নেই নির্লিপ্ততা, খুব একটা সতর্কও নয়। তার সাথে হাসান একজন অভিভাবকের মত আচরণ করেনি। অনেকটা যেন বন্ধুর বাড়িতে আরেক বন্ধুকে নিয়ে এসেছে। সারাটা সময় হাসি আর আনন্দের মধ্যে কেটেছে লুবনার। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সাথে খেলেছে সে, জুলিয়ানাকে কিচেনে সাহায্য করেছে, পুরুষ দু'জনকে নিয়ে জুলিয়ানার হাসি-ঠাট্টায় দু'একবার যোগ দিয়ে হাসিয়েছে ও সবাইকে।

লাঞ্চ থেকে ফেরার পথে রানার হাতের সেই কাটা দাগের ওপর আঙুল রেখেছিল লুবনা, জানতে চেয়েছিল, 'এটা কি করে হল, হাসান?'

আগের মত ঝাঁকি খেয়ে সরে যায়নি রানা। লুবনার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল সে। তারপর রাস্তার ওপর চোখ রেখে বলেছিল, 'একজন লোক আমাকে জেরা করছিল। খুব বেশি সিগারেট খেত লোকটা। আশপাশে অ্যাশট্রে ছিল না।'

রানার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রাস্তার দিকে ফিরল লুবনা,

আর কোন প্রশ্ন করল না। খানিক পর ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখে, লুবনার চোখ ছলছল করছে। 'খারাপ অনেক কিছুও ঘটে দুনিয়ায়। তোমাকে একবার বলেছি।'

চোখে পানি নিয়েও হেসেছিল লুবনা। 'ভাল অনেক কিছুও ঘটে।'

এরপর থেকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে আর কোন বাধা পায়নি লুবনা।

লরা খুব সুখে আছে। লুবনাকে নিয়ে তাকে আর মাথাই ঘামাতে হয় না। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ডাঁট মারে সে, বলে, 'হাসান একটা রত্ন।' রানা যে অনেক বদলেছে, এটা তার চোখে পড়ে না, তার কাছে লোকটা আগের মতই গম্ভীর আর রহস্যময়। স্বামীর কাছে সে গল্প করে, এমন লোক ভাগ্যগুণে পাওয়া যায়।

মনে মনে ভিটোও তা স্বীকার করে। ভাগ্যিস লোকটা মদ খায়, তা নাহলে এত কম বেতনে থাকত না।

কিন্তু মদ খাওয়া আরও অনেক কমে গেছে রানার। সকালে দেখা যায় বোতল অর্ধেকটাও খালি হয়নি।

লুবনাকে ট্রেনিং দিতে শুরু করল রানা। তার গোড়ালির ব্যথা সেরে গেছে, এবার স্কুল স্পোর্টসের জন্যে তৈরি হতে হবে। বাড়ির সামনের লনে দুটো দাগ কাটা হল, দৌড় শুরু আর শেষের চিহ্ন। লুবনা এল নীল আর সাদা ট্র্যাকসুট পরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, কী আশ্চর্য লম্বা দেখাচ্ছে ওকে!

রিয়্যাকশন টাইম সম্পর্কে বলল রানা, 'স্টার্টিং গানের আওয়াজ প্রথমে তোমার কানে ঢোকে, কান থেকে যায় মাথায়, ব্রেন মেসেজ পাঠায় হাত-পায়ের নার্ভে। এই মেসেজটা বলে, "যাও"! গুমোরটা হল, এই মেসেজ পাঠাবার সময় কমিয়ে নিয়ে আসা।'

লুবনাকে শেখাল রানা, কিভাবে শুধু শব্দটার দিকে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিতে হবে। শব্দটা এই এল এই এল ভাব নিয়ে থাকলে চলবে না, কিংবা শোনার জন্যে সচেতন থাকারও দরকার নেই। আওয়াজটা যখন আসবে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই আপনা-আপনি হতে হবে।

পিস্তলের বদলে একবার হাততালি দিল রানা। মাত্র এক বিকেল প্র্যাকটিস করেই দাগ থেকে চমকে ওঠা হরিণীর মত লাফ দিতে শুরু করল লুবনা। রানা তাকে বলল, রোজ যদি এক ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে পার, ফার্স্ট প্রাইজ তোমার ঠেকায় কে।

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে জনি ক্যাশ-এর গান শুনছে আর মেয়েটার কথা ভাবছে রানা। কি চটপটে, কি প্রাণবন্ত! বড় হচ্ছে, অথচ নিজেকে নিয়ে তার কোন ভয় নেই। জানে, বিপদ হলে হাসান আছে। কিন্তু আরও এক ধরনের বিপদ সম্পর্কেও ওর কোন ভয় নেই, অবিবাহিতা মেয়েদের যে ভয়টা থাকে। তার ভুলও

হতে পারে, এই ভয়টা লুবনার হয়ত ঠিকই আছে, কিন্তু তার সঙ্গে থাকার সময় সেটা ওকে স্পর্শ করে না। তাকে বিশ্বাস করে মেয়েটা।

নিজের কথা ভাবল রানা। আর কতদিন এভাবে লুকিয়ে বেড়াতে হবে কে জানে! সি. আই. এ.-এর সাথে যদি কোন আপোস হয়ে যায়, দেশে ফিরতে হবে তাকে।

বুকের ভেতর একটা মোচড় অনুভব করল রানা।

আরও একটা কথা ভাবল ও। মদ খেয়ে আর কুঁড়েমি করে শরীরে মেদ জমিয়ে ফেলেছে সে। অনেক দিন হল এক্সারসাইজ করা হচ্ছে না। তেমন ভয়ঙ্কর কোন বিপদে পড়লে সামাল দিতে অসুবিধে হবে। শরীরটাকে আগের ফর্মে ফিরিয়ে আনতে হলে সময় লাগবে, তিনমাসের কম নয়।

ক্যাসেট থেমে গেল। অভ্যস্ত হাতে সায়গলের ক্যাসেটটা তুলে নিল ও।

নিজে বিছানায় শুয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে লুবনা। সেই ভারি গলায় বিদেশী গায়ক গাইছে, সো যা রাজকুমারী…।

একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল লুবনা, ঠোঁটে তখনও হাসি লেগে আছে।

হেয়ারড্রেসারের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল লরা। দিনটা মেঘলা, রাস্তায় যানবাহনের অসম্ভব ভিড়। প্রায় ত্রিশ মিটার দূরে গাড়িটাকে দেখল সে, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাসান। ওর দিকে এগোচ্ছে, চোখের কোণে দ্রুত একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল।

রাস্তার এপারে, এইমাত্র একটা ফোক্সওয়াগেন ভ্যান এসে থামল। থামতে না থামতেই পাশের দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল দুই যুবক, দু'জনের হাতেই পিস্তল। ছুটছে ওরা, একটা সাদা ফিয়াটের দিকে।

ফিয়াটটা রাস্তার ওপারে। গুলি হল, প্রথমে একটা। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ফিয়াটের দরজা বন্ধ করছিল বয়স্ক এক লোক, গুলির আওয়াজ শুনে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল সে, হাতটা ঢুকে গেছে জ্যাকেটের পকেটে। পৌঁছে গেল রানা, কিন্তু ওকে ভাল করে দেখতে পেল না লরা। শুধু অনুভব করল, বডিগার্ড কোমর জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে নিয়েছে তাকে। এই সময় আবার গুলি। লরাকে নিয়ে ছিটকে পড়ে গেল রানা; এখন আর আড়াল খোঁজার সময় নেই। লরা দেখল, পেভমেন্টে শুয়ে আছে সে, বডিগার্ড নিজের শরীর দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে। তারপর, কিভাবে বলতে পারবে না সে, মাত্র দু'তিন সেকেণ্ডের মধ্যে পেভমেন্টের কিনারায় চলে এল ওরা, একটা দোকানের সামনে। আরও গুলি হল। ওদের মাথার ওপর জানালার কাঁচ ভাঙল। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল লরার গলা থেকে। বডিগার্ডের হাতে পিস্তল দেখল ও, কিন্তু শরীরের পাশে লম্বা করা রয়েছে পিস্তল ধরা হাত, কারও দিকে তাক করা নয়। বডিগার্ড বুক দিয়ে ঢেকে রেখেছে তার

মুখ, তাই কি ঘটছে কিছুই সে দেখল না। শব্দ হল, বন্ধ হল ভ্যানের দরজা। রাস্তার সাথে চাকার ঘর্ষণ, ইঞ্জিনের গর্জন, তারপর আর কোন আওয়াজ নেই।

'এখানে অপেক্ষা করুন, নড়বেন না,' রানার কণ্ঠস্বর শান্ত, দৃঢ়। উঠে দাঁড়াল ও, লরার সারা শরীর ভারমুক্ত হল। খুব সাবধানে সরল রানা, কাঁচের টুকরোগুলো যাতে লরার গায়ে না পড়ে। স্থির হয়ে শুয়ে থাকল লরা, তাকিয়ে আছে, দেখল গাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে হাসান। হাতের পিস্তলটা অদৃশ্য হয়েছে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে তাকিয়ে আছে সে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে লরাও তাকাল। ফিয়াটের বনেটে বুক আর মাথা দিয়ে পড়ে আছে বয়স্ক লোকটা, সাদা রঙের ওপর জ্বলজ্বল করছে লাল রক্ত। পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, মারা গেছে। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে বডিগার্ড ফিরে এল। ওর হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সে। ও কাঁপছে, টলমল করছে পা দুটো। ওর পিঠ আর কাঁধে একটা হাত রেখে ধীরে ধীরে হাঁটতে বলল সে। টলতে টলতে এগোল লরা। লোকজন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আবার চলাচল শুরু করেছে। পেভমেন্টের কিনারায় দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে একটা মেয়ে। সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া গেল, দ্রুত এগিয়ে আসছে। ওকে ব্যাক সিটে তুলে দিল সে। বলল, 'নামবেন না! ফিরতে আমাদের দেরি হবে।'

লরার তরফ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

রানা বলল, 'পুলিস রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। কাগজপত্র দেখতে চাইবে।'

এখনও একটু একটু কাঁপছে লরা। মুখের চেহারা ফ্যাকাসে। সামনের সব কিছু ঝাপসা লাগছে তার, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। মাথা ঘুরছে। হাত বাড়িয়ে ওর চোখ থেকে কালো চুল সরিয়ে দিল রানা। তারপর হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে লরার গাল স্পর্শ করল। ঠাণ্ডা। ওর চিবুকে হাতের তালু ঠেকিয়ে মুখটা একটু উঁচু করল রানা, তাকিয়ে আছে লরার চোখে। কোন ভাব নেই দৃষ্টিতে, যেন বহুদূরে তাকিয়ে আছে।

'শরীর খারাপ লাগছে? আমার দিকে তাকান।'

চোখের মণি জোড়া নড়ে উঠল, ঝাপসা ভাবটা কাটল একটু। রানার দিকে তাকাল লরা। ধীরে ধীরে মাথা দোলাল। এখন আর মাথা ঘুরছে না।

'এখানে থাকুন,' বলল রানা। 'পুলিসের সাথে কথা বলে আসি।' রাস্তার ওপর ঘ্যাচ করে একটা পুলিস কার থামল। কারের মাথায় আলো ঘুরছে, ঝিমিয়ে আসছে সাইরেনের আওয়াজ। আরও এক জোড়া পুলিস কার এসে থামল। লোকজনের ভিড়, শোরগোল।

কাজটা রেড ব্রিগেডের, খুন হল একজন প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি। মিলানে এধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। বডিগার্ডের লাইসেন্স বের করে যা যা দেখেছে সব পুলিসকে শোনাল রানা। দু'জনের চেহারা বর্ণনা করল ও. কিন্তু এই চেহারার লোক

মিলানে হাজার হাজার পাওয়া যাবে। ফোক্সওয়াগেনের নাম্বার দিল ও, কিন্তু প্লেটটা নিশ্চয়ই চুরি করা।

আধ ঘন্টা পর কোমোর দিকে রওনা হল ওরা। পিছনের সিটে লরা ক্লান্ত, চুপচাপ। বাড়ির দিকে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে এই সময় বিস্ফোরিত হল সে। 'জানোয়ার! রাস্তার ওপর মানুষ মারে, জানোয়ার!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'আর আপনিই বা কিছু করলেন না কেন?' সব রাগ রানার ওপর গিয়ে পড়ল লরার। 'আপনার হাতে আমি পিস্তল দেখলাম, কুকুরগুলোকে গুলি করতে কি হয়েছিল?'

'আমি একা থাকলে হয়ত করতাম,' বলল রানা। 'ওদের সাথে আরও লোক ছিল, আপনি দেখেননি। ভ্যানের সামনে, হাতে শটগান নিয়ে। আমি ওর বন্ধুদের গুলি করলে ও তামাশা দেখত না। ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি আমরা। ফিয়াটের মালিকও গুলি করেছিল, কয়েক ইঞ্চির জন্যে আমার বা আপনার মাথায় ঢোকেনি বুলেট।'

কথাটা দশ মিনিটের জন্যে চুপ করিয়ে দিল লরাকে। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে তার দিকে তাকাল রানা। তার নিরাপদ জগৎ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। গোলাগুলি হঠাৎ করে টিভির পর্দা থেকে লাফ দিয়ে উঠে এসে ঠাস করে চড় কষেছে তার গালে। রানা দেখল, নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে লরা, আবার নিজের বিপদমুক্ত জগতে ফিরে আসতে শুরু করেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে রানার চুল থেকে কাঁচের খুদে একটা কণা তুলল সে।

'আপনি অবশ্য একেবারে হাওয়ায় ভেসে আমার পাশে চলে এলেন,' নরম সুরে বলল লরা। 'আমি আপনাকে দেখতেই পাইনি। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন!'

বাড়ির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল গাড়ি। দরজার সামনে থামল।

'আমার ব্র্যাণ্ডি দরকার,' বলে গাড়ি থেকে নামল লরা। 'আপনিও আসুন।'

'লুবনা,' বলল রানা, নামল না।

'লুবনা?'

'পৌনে পাঁচটা বাজে।'

'আরে, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিক আছে, আপনি যান। পরে আপনার সাথে দেখা করব।'

দরজার সামনে, সিঁড়ির ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে রানাকে গাড়ি ঘোরাতে দেখল লরা। গেট দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি, রানা একবারও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না। ধীরে ধীরে দরজার দিকে ফিরল লরা। ভেতরে ঢুকে গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালল, দু'তিন চুমুকেই গরম হয়ে উঠল শরীর। সোফায় বসে গোটা দৃশ্যটা স্মরণ করল সে।

তাকে শরীর দিয়ে ঢেকে রেখেছিল লোকটা। তার ওপর শুয়েছিল। আশ্চর্য, একটু নড়ছিল না। একেবারে শান্ত, এতটুকু উত্তেজিত হয়নি। আজই রোমে ফোন করে সব বলতে হবে ভিটোকে। বন্ধু-বান্ধবদেরও জানাবে সে। বিরাট একটা ঘটনা, প্রমাণ হল বডিগার্ড সত্যি দরকার ছিল। তারপর তার মনে পড়ল, লাশের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় লোকটার চেহারায় কোন ভাবাবেগ ছিল না। এরকম লাশ তার আরও অনেক দেখা আছে। ওর গালের ওপর তার হাত এখনও যেন লেগে রয়েছে—শক্ত, কাটা একটা দাগ। এই দাগের ইতিহাস লুবনার কাছ থেকে জেনেছে সে। গভীর, আন্তরিক চোখ দুটো স্থির হয়ে ছিল ওর মুখে। গ্লাসে আরও একটু ব্র্যাণ্ডি নিল সে। ধীরে ধীরে চুমুক দিল।

দেরি করে ফেলেছে ও। শরীরটা আগের ফর্মে নেই।

সুটকেস থেকে আজ মদের বোতল বের করেনি রানা। গানও শুনছে না। মনের একটা অংশ অপেক্ষা করছে, আরেকটা অংশ নিজেকে নিয়ে চিন্তায় ব্যস্ত। জানে, আজ যদি লরা টার্গেট হত, তাকে ও বাঁচাতে পারত না। ছ'মাস আগে হলে খুনে তিনজন পাঁচ পা এগোবার আগেই মারা পড়ত ওর হাতে, শটগানধারীকে প্রথমেই পাঠিয়ে দিতে পারত যমের বাড়ি। তিনজনই ওরা এ-লাইনে নতুন, সাহসী অ্যামেচার। তা নাহলে নিহত লোকটা গুলি করার সুযোগ পেত না। লোকটা অবশ্য একটাই গুলি করেছে, সেটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, কিন্তু তবু বলতে হয় ভাগ্য গুণে বেঁচে গেছে টেরোরিস্টরা। ওদের আসলে উচিত ছিল শটগান দিয়ে কাজ সারা, ভ্যান থেকে নামারও দরকার ছিল না। ডাবল ব্যারেল শটগান, দশ মিটার দূর থেকে গুলি করলে ছাতু হয়ে যেত লোকটা। অথচ তা না করে রাস্তায় নেমে কাছ থেকে পিস্তল ব্যবহার করল। অ্যামেচার।

আবার নিজের কথা ভাবল রানা। তার রিফ্লেক্স অ্যাকশন অসম্ভব ঢিলে হয়ে গেছে।

লরা আজ মারা যেতে পারত।

শরীরটাকে চিরকাল একটা অস্ত্র বলে জ্ঞান করে এসেছে সে। তার অন্যান্য অস্ত্রের মত এটারও যত্ন নিয়েছে। কোথাও চোট খেলে বা জখম হলে সেবা-শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলেছে। এক্সারসাইজ করে প্রতিটি অঙ্গকে উন্মুখ করে রেখেছে, ব্রেনের মেসেজ পেয়ে যাতে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতে পারে। এখন আর ব্যাপারটা সেরকম নেই। আগের অবস্থা সহজে ফিরিয়েও আনা যাবে না। এ তো আর একটা বন্দুক নয় যে তেল দিলেই আবার সাবলীল হয়ে উঠবে পার্টসগুলো। গোটা জিনিসটা আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে। অনেক সময় আর পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, শুধু একটু যা মোটা হয়েছে, কিন্তু অস্ত্রের মালিক জানে জিনিসটায় মরচে ধরেছে। আর হয়ত

ধরতে পারবে রেমারিক—একটু ঢিলেঢালা ভাব, মাস্‌ল্‌ টোনের অভাব। চমৎকার একটা মেশিন কিন্তু অবহেলার শিকার। আবার ওটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রায় মাঝরাতে মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। অপেক্ষার পালা শেষ হল। ঘুমিয়ে থাকার অভিনয় করার ইচ্ছে নেই, তাই দরজা খুলেই রেখেছে রানা। আসতে চায় আসুক।

সাদা আর লম্বা একটা নাইটড্রেস পরে এসেছে লরা। তার হাতে কনিয়াক ভরা একটা বেলুন গ্লাস। সিল্ক খসখস করে উঠল, ঘরে ঢুকল সে। গ্লাস ধরা হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল।

গ্লাসটা নিল রানা। ছোট্ট একটা চুমুক দিল। কি করবে মনে মনে ঠিক করা আছে। প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবছে। ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে লরা। সবচেয়ে ভাল হয় যদি বোবা সেজে উত্তর এড়িয়ে যাওয়া যায়। কথা না হলে আঘাতটা হয়ত তেমন অনুভব করবে না।

ধীরে ধীরে বিছানার কিনারায় বসল লরা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রানার পা থেকে কোমর পর্যন্ত ঢাকা রয়েছে চাদরে, কোমর থেকে মুখ পর্যন্ত চোখ বুলাল লরা। একটা হাত বাড়িয়ে কাঁধের শুকনা ক্ষতটা আঙুল দিয়ে হালকাভাবে স্পর্শ করল। রানার একটা হাত ধরল সে, হাতটা তুলে নিজের গালে চেপে ধরল, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, দোল খেল কালো চুল, তারপর উঠে দাঁড়াল সে, পিছিয়ে গেল।

সাড়া না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে? ভাবল রানা।

কিন্তু না।

তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লরা, রানার ঠিক নাগালের বাইরে। সাদা সিল্ক খসে পড়ল মেঝেতে। ওর সামনে মেলে ধরল নিজেকে। উত্তেজক কোন ভঙ্গি নয়, পোজ নিয়েও দাঁড়ায়নি, শুধু দেখাচ্ছে। এই আমার সম্পদ, দেখ আমি কি সুন্দর, তোমাকে দিতে এসেছি। উপহার—যা শুধু আমিই দিতে পারি।

গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চোখ বুজল রানা। কোন শব্দ নেই। কিছুই শুনল না রানা। তিন মিনিট পর যখন চোখ খুলল, দেখল লরা চলে গেছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজল রানা।

কালই হয়ত নট হয়ে যাবে ওর চাকরি।

'কাল রাতে তুমি গান শোননি।'

প্রায় চমকে উঠল রানা। 'সে তো অনেক রাতে বাজাই, তুমি জেগে থাক?' লুবনার দিকে তাকাল না ও। হাত দুটো আরও শক্ত করে চেপে ধরল স্টিয়ারিং হুইল। আজ যতবার কথা হয়েছে লুবনার সাথে, বারবার মনে হয়েছে তাকে ও

যেন কিছু বলতে চায়। কাল রাতের ঘটনা টের পেয়ে গেছে নাকি?

জবাব না দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন করল লুবনা, 'ওই গানটার মানে কি? সব শেষে যেটা বাজাও? আমার ঘুম পেয়ে যায়।'

'ওটা একটা ঘুমপাড়ানি গান।'

'তাহলে তো ঠিকই ধরেছি!'

প্রসঙ্গ থেকে সরে গেল লুবনা। বলল, 'আমরা তো ইচ্ছে করলে তোমার পিস্তলটাই ব্যবহার করতে পারতাম।'

'না। ওটা সে-ধরনের পিস্তল নয়।' কোমোয় যাচ্ছে ওরা, লরার ট্রেনিং নিখুঁত করার জন্যে স্টার্টিং পিস্তল কিনবে। হাততালি স্টার্টিং পিস্তলের বিকল্প হতে পারে না।

'আওয়াজ হওয়া নিয়ে কথা, তা তো হয়ই,' বলল লুবনা।

'শুধু আওয়াজ হয় না, বুলেটও বেরোয়।'

'আকাশের দিকে গুলি করলে অসুবিধে কি?'

'লুবনা, ওপর দিকে কিছু ছুঁড়লে নিচে সেটা নামবেই, আর এক মাইল ওপর থেকে নেমে আসা একটা বুলেট বিপজ্জনক হতে পারে।'

খবরের কাগজে মন দিল লুবনা, কিন্তু বারবার আড়চোখে রানার দিকে তাকাচ্ছে। খানিক পর হঠাৎ মুখ তুলে জানতে চাইল, 'তোমার রাশি কি, হাসান?'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখল, কাগজে আজকের রাশিচক্র পড়ছে লুবনা।

'কিংবা তোমার জন্মদিন বল।'

'পনেরোই এপ্রিল,' হাসানের জন্মদিন বলল রানা।

'সেকি! আর তো তাহলে বেশিদিন নেই!' হিসেব করল সে। 'আগামী রোববারে!'

'তাতে কি?'

'স্পোর্টসের পরদিনই তাহলে! বাহ্, কেক কাটবে না? আথিয়াকে বললে চমৎকার কেক বানাবে...'

চোখ গরম করে লুবনার দিকে তাকাল রানা। 'খবরদার, আথিয়াকে কিছু বলবে না। হৈ-চৈ একদম ভাল লাগে না আমার।'

'বললেই হল! বাবা নিউইয়র্ক যাচ্ছে, সাথে বোধহয় উনিও যাবেন।' হঠাৎ একটা আইডিয়া ঢুকল মাথায়। 'আচ্ছা পিকনিকে গেলে কেমন হয়?'

সূক্ষ্ম আভাস, কিন্তু ধরতে পারল রানা। কাল রাতের ঘটনা লুবনা টের পেয়েছে। মা-কে তার সম্বোধন করার ধরন থেকেই বোঝা যায়। অস্বস্তি বোধ করল ও। আড়ষ্ট একটা ভাব ঘিরে ধরল ওকে।

'কি হল, অমন চুপ করে আছ কেন?' রানার হাতে একটা হাত রাখল লুবনা।

'কেমন হবে, বললে না?'

'কি কেমন হবে?' বাস্তবে ফিরে এল রানা।

'এতক্ষণ তুমি ছিলে কোথায়?' কৃত্রিম রাগে কটমট করে তাকাল লুবনা। 'জানতে চাইছি, পিকনিকে যাবে কিনা। ইচ্ছে করলে দূরের একটা পাহাড়ে যেতে পারি আমরা।'

'কিন্তু...এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ নয়, লুবনা।'

'বলে দাও নিয়ে যেতে পারব না,' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল লুবনা। 'কিন্তু-টিন্তুর দরকার নেই।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু শনিবারে তোমাকে ফার্স্ট প্রাইজ পেতে হবে, তা না হলে পিকনিক বাদ।'

'এ অন্যায়!' তীব্র প্রতিবাদ জানাল লুবনা। 'এরকম একটা শর্ত জুড়ে দেয়ার কোন মানে হয় না।'

'তাহলে আরও ভালভাবে চেষ্টা করবে,' বলল রানা। 'প্রাইজ না পেলে পিকনিক হবে না।'

ফেরার পথে লুবনাকে অন্যমনস্ক দেখাল। বাড়ির দরজার সামনে গাড়ি থেকে নামার সময় এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল সে। তারপর বলল, 'আমি কৃতজ্ঞ, হাসান।'

পাথর হয়ে বসে থাকল রানা। মুখে কোন কথা যোগাল না। চোখে পানি নিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল লুবনা।

স্কুলে যাবার পথে একটা কথা ভেবে খারাপ লাগল রানার। আজ স্পোর্টস, ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা সবাই আসবে, শুধু লুবনার মা-বাবা বাদে। ভিটো আর লরা নিউইয়র্কে চলে গেছে। নিশ্চয়ই লুবনা খুব একা আর অসহায় বোধ করবে।

স্কুলের গেট পেরিয়ে শেডে গাড়ি থামাল রানা। লুবনা বলল, 'নাম, তাড়াতাড়ি নাম!'

'আমি?'

রানার একটা হাত খামচে ধরল লুবনা। 'তো কে? জলদি, জলদি!'

ইতস্তত করল রানা। অভিভাবকরা থাকবে, ওকে ঠিক মানাবে না।

'কেউ কিছু মনে করবে না,' বলল লুবনা, তার চেহারায় শঙ্কা। রানা কি ভাবছে টের পেয়ে গেছে। আবেদনের সুরে আবার বলল সে, 'তুমি শুধু আমার বডিগার্ড নও, হাসান, আমার বন্ধু—কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সেই পরিচয়ই দেব আমরা। প্লীজ!'

লুবনার ব্যাকুল চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

গাড়ি থেকে নেমে রানার একটা হাত ধরল লুবনা, ওকে টেনে নিয়ে চলল।

ব্যাপারটা প্রায় একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের মত। সাদা আর লাল রঙের সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, নিচে অসংখ্য চেয়ার। মা-বাবারা ধোপদুরস্ত কাপড় পরে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। রানাকে রেখে কাপড় বদলাতে চলে গেল লুবনা। এক কোণে সরে দাঁড়াল রানা, অস্বস্তি বোধ করছে। এক মিনিট পর দেখল, ওর দিকে এগিয়ে আসছেন সিনোরা মিরিয়াম। অস্বস্তিটা আরও বেড়ে গেল।

'আপনি মি. ইমরুল হাসান, তাই না?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'জ্বি,' বলল রানা। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল ও—জরুরি কাজে লুবনার মা-বাবাকে বিদেশে যেতে হয়েছে।

'ওঁরা থাকলে খুব ভাল হত,' সিনোরা মিরিয়াম বললেন। 'কিন্তু আপনি এসেছেন সেজন্যে আমি খুশি।' রানার একটা হাত ধরলেন তিনি। 'আমার সাথে আসুন।' অপমান বোধ করবে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না রানা। বোঝাই যাচ্ছে সামিয়ানার নিচ থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। সম্মানিত মেহমানদের সঙ্গে তাকে বসতে দেয়া হবে না।

রানাকে পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন সিনোরা মিরিয়াম। আবার ওরা সামিয়ানার নিচে ঢুকল। প্রথম সারির একটা চেয়ার দেখিয়ে রানাকে তিনি বললেন, 'আপনি এখানে বসবেন।' এদিক ওদিক তাকিয়ে একজন বেয়ারাকে ডেকে রানাকে ড্রিঙ্ক দিতে বললেন।

একটু পরই শুরু হল প্রতিযোগিতা। বসন্তের দিন, না শীত না গরম। মেয়েরা অনেকেই কিশোরী আর তরুণী, খুদে শর্টস পরে থাকায় ভাল লাগছে।

তারপর হানড্রেড মিটার দৌড়ের জন্যে হাজির হল লুবনা। রানা দেখল, ওর মত কেউ নয়। রূপে, লাবণ্যে, লম্বায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে লুবনা। দেখল সে শুধু একা নয়, লুবনার দিকে যারই চোখ পড়ছে আটকে যাচ্ছে দৃষ্টি।

মেয়েরা তৈরি হচ্ছে, তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে লুবনার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, মনের ভেতর মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে উদ্বেগ। লুবনা প্রাইজ না পেলে খারাপ লাগবে ওর।

উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। এত পরিশ্রমের ট্রেনিং সার্থক হয়েছে। শুরুটা চমৎকার হল লুবনার, কেউ শুরু করার আগেই পাঁচ পা এগিয়ে থাকল ও। লাল টেপটা যখন ওর বুক স্পর্শ করল, সবচেয়ে কাছের মেয়েটা তখন দশ গজ পিছনে পড়ে আছে।

দৌড় শেষ, কিন্তু থামল না লুবনা। ঘুরে আবার ফিরে আসছে সে। দর্শকরা মনে করল, কতটা দম রাখে মেয়েটা বোধহয় সেটাই দেখাতে চাইছে। সবার চোখ তার ওপর স্থির হয়ে থাকল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ঘাবড়ে গেছে ও। এ কি করছে লুবনা!

সোজা ছুটে এল সে। কারও দিকে তাকাল না। সোজা একেবারে রানার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'শান্ত হও, লুবনা, শান্ত হও! কান্নার কি আছে, এ তো খুশির ব্যাপার!' কিন্তু আর কেউ না জানলেও, রানা জানে, মা-বাবার কথা ভেবে কাঁদছে লুবনা। বাবা তাকে সঙ্গ দেয় না, আর মা···মাকে সে ঘৃণা করে। আজকের এই আনন্দের মুহূর্তে যাকে সবচেয়ে বিশ্বাস করে সে, যাকে তার ভাল লাগে, নিজের এই অন্তহীন বেদনার কথা তার কাছে এভাবেই প্রকাশ করে ফেলল মেয়েটা।

বুদ্ধিমতী মেয়ে, লোকে হাসাহাসি শুরু করার আগেই সামলে নিল নিজেকে। রানার শার্টে মুখ ঘষে চোখের পানি শুকিয়ে নিল। রানাকে ছেড়ে দিয়ে পাশে তাকাল লুবনা, দেখল, চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সিনোরা মিরিয়াম। হেডমিসট্রেসকে চুমো খেল সে, তারপর আলিঙ্গন করল। হাসি ফুটল বৃদ্ধার মুখে। ইতিমধ্যে আরেকটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে নেই।

একটু পরই বান্ধবীদের কাছে চলে গেল লুবনা। যাবার সময় দেখল, হাসান তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এই প্রথম ওকে হাসতে দেখল সে। আশ্চর্য মিষ্টি হাসি তো!

'হ্যাপি বার্থডে, হাসান।'

নরম মখমলের মত সবুজ ঘাসে শুয়ে আছে রানা, মুখ তুলে তাকাল। লুবনার হাতে সোনালি রঙের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। 'কি ওটা?' জানতে চাইল রানা।

'জন্মদিনের উপহার।'

'আমি না তোমাকে বাড়াবাড়ি করতে বারণ করেছিলাম?'

রানার পাশে, ঘাসের ওপর বসে পড়ল লুবনা। 'তুমি ট্রেনিং না দিলে ফার্স্ট হতাম? তাই ধন্যবাদ জানালাম আর কি।'

উঠে বসল রানা। প্যাকেটটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল, কিন্তু খুলল না। আড়চোখে তাকিয়ে লক্ষ করল, লুবনার চেহারা একটু ম্লান হল। প্যাকেটটা ঘাসের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল ও।

গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। পিছু পিছু লুবনাও এল। গাড়ি থেকে পিকনিক বাস্কেট আর টু-ইন-ওয়ানটা নিয়ে আবার ওরা ঢালের মাথায়, সবুজ ঘাসে চলে এল। টু-ইন-ওয়ান নিয়ে আসার বুদ্ধিটা লুবনার। হয়ত ক্যাসেট উপহার দিয়েছে, ভাবল রানা। ওর বাবার সাথে গত হপ্তায় মার্কেটিং করতে গিয়েছিল, তখনই কিনে থাকবে। ক্যাসেট হয়ে থাকলে ভালই, দামি কিছু বা লজ্জায় পড়তে হয় এমন কিছু না হলেই হল।

ঘাসের ওপর হলুদ রঙের একটা চাদর বিছাল লুবনা। তারপর দু'জন মিলে

বাস্কেট থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল। খুব যত্নের সাথে পিকনিক লাঞ্চ তৈরি করে দিয়েছে আথিয়া। একটা করে জিনিস নামাচ্ছে আর ব্যাখ্যা করছে লুবনা। মুরগীর ঠাণ্ডা রোস্ট, ওমলেট, ক্রীম আর মাখন দিয়ে মোড়া মচমচে রুটি, তিন রকম ফল, কাগজে মোড়া দু'বোতল ওয়াইন, এখনও বরফের মত ঠাণ্ডা।

জায়গাটা লেক ম্যাগিওর-এর অনেক ওপরে, গরমের দিনে রাখালরা এখানে গরু-ছাগলকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে আসে। ফাঁকা মাঠ নয়, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক পাইন গাছ। দূরে উত্তর আর পশ্চিমে ক্রমশ উঁচু হয়ে সুইটজারল্যাণ্ডের দিকে উঠে গেছে তুষারে মাথা ঢাকা পাহাড়গুলো। ওদের সামনে, দক্ষিণে, পো ভ্যালি—সেই দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত।

কিছুক্ষণের মধ্যে হলুদ চাদরে ছড়িয়ে পড়ল টিন ফয়েল আর প্লাস্টিক প্লেট। দুটো গ্লাসে ওয়াইন ঢালল রানা। বলল, 'ভোতর সাঁতে।'

'অর্থ?'

'ফ্রেঞ্চ। মানে, চিয়ার্স।'

'য়ামসিং,' জবাবে বলল লুবনা, রানার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখে হেসে খুন হল সে। 'চাইনিজ।'

'জানি, কিন্তু কিভাবে...?' তারপর মার্কো পোলোর বইটার কথা মনে পড়ল রানার। কিছুই বাদ দেয়নি লুবনা, সব গোগ্রাসে গিলেছে।

এরপর ভাষা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। ওকে একটা কৌতুক শোনাল রানা।

টেক্সাসের এক লোক জীবনে প্রথম ইউরোপে এসেছে। প্যারিসে এসে কয়েকদিন থাকল সে। প্রথম রাতে হোটেলের চীফ স্টুয়ার্ড ডিনার টেবিলে তাকে একজন ফরাসীর সাথে বসাল। ফরাসী লোকটা ইংরেজি জানে না। খাবার পরিবেশন করা হল, ফরাসী লোকটা মৃদু হেসে বলল, 'বন আপেতিত।' টেক্সান ভাবল, লোকটা বোধহয় নিজের পরিচয় জানাচ্ছে। উত্তরে সে-ও মৃদু হেসে বলল, রয় ডিকসন। এই রকম চলল পর পর পাঁচদিন।

শেষদিন ডিনারের আগে টেক্সান লোকটা বারে বসে হুইস্কি খাচ্ছে, এই সময় একজন আমেরিকানের সাথে তার পরিচয় হল। 'ফরাসীরা অদ্ভুত মানুষ, কোন সন্দেহ নেই,' কথায় কথায় মন্তব্য করল টেক্সান।

'কি রকম?'

তখন ফরাসী লোকটার আচরণ ব্যাখ্যা করল টেক্সান। বলল, এই ক'দিনে কম করেও বারো থেকে পনেরো বার দেখা হয়েছে আমাদের, প্রতিবারই লোকটা আমাকে নিজের পরিচয় জানিয়েছে।

'কি নাম তার?'

'বন আপেতিত।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল দ্বিতীয় আমেরিকান। বলল, ওটা ফরাসী লোকটার

নাম নয়। এ এক ধরনের শুভেচ্ছা, খাওয়াটা যেন আনন্দময় হয়।

বলাই বাহুল্য, টেক্সান লোকটা খুব লজ্জা পেল। সে-রাতে ডিনারে বসে ফরাসীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে, বলল, 'বন আপেতিত।'

একগাল হেসে ফরাসী লোকটা জবাব দিল, 'রয় ডিকসন।'

হাততালি দিয়ে হেসে উঠল লুবনা। হাত বাড়াল রানা। সোনালি প্যাকেটটা তুলে নিয়ে ফিতে খুলতে শুরু করল। ভেতর থেকে প্রথমে সত্যিই একটা ক্যাসেট বেরুল, কিন্তু সাথে আরও কিছু রয়েছে। রানার দিকে তাকিয়ে আছে লুবনা, হাসি থেমে গেছে তার। একটা অ্যালবামও রয়েছে, তাতে শুধু লুবনার ছবি। ছবিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। সেই ছোটবেলা থেকে তার যত ফটো তোলা হয়েছে, বেশিরভাগই রয়েছে অ্যালবামে। অনেকগুলো ছবি কাঁচি দিয়ে কাটা, লুবনার পাশে যে বা যারা ছিল তারা বাদ পড়েছে। বাড়ির সবার সঙ্গে ফটো রয়েছে লুবনার, কিন্তু শুধু তার মায়ের সঙ্গে তোলা কোন ফটো নেই। কাটা অংশগুলোয় কে ছিল, পরিষ্কার বোঝা যায়।

লুবনার দিকে একবার শুধু মুখ তুলে তাকাল রানা, কিছু বলল না।

আর রয়েছে কালো মখমলে মোড়া খুদে একটা বাক্স। বাক্সটা খুলে অবাক হয়ে গেল রানা। ভেতরে খুব ছোট একটা কোরান শরিফ, ইংরেজি অনুবাদ, সাথে চকচকে ইস্পাতের হাতলওয়ালা একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

উপহারের প্রতিটি জিনিস একটা করে তাৎপর্য বহন করে। কোরান শরীফ উপহার পাওয়ার কারণটা বুঝল রানা। ধর্ম নিয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। এই বয়সের যা স্বভাব, কখনও যুক্তির ওপর নির্ভর করতে চায় লুবনা, আবার কখনও বিশ্বাসের ওপর। তবে তার ঝোঁকটা বিশ্বাসের দিকেই বেশি। ধর্ম নিয়ে বোকার মত তর্ক করেনি ওরা। যার যার ধারণা, অভিজ্ঞতা, এই সব পরস্পরকে শুনিয়েছিল মাত্র।

নাপাম বোমায় দগ্ধ একটা শিশু, কি তার অপরাধ? এটা তো তার পাপের শাস্তি হতে পারে না। কিশোরী একটা মেয়ে, বারবার তাকে ধর্ষণ করা হল, কিন্তু সৃষ্টি কর্তাকে ডেকেও বেচারা সাড়া পেল না। স্যাডিস্ট এক লোক একজন সন্ন্যাসিনীর ওপর অত্যাচার চালিয়ে বহাল তবিয়তে শেষ বয়েসে মারা গেল। এরপর তার শাস্তি হবে? সারাটা জীবন নিরীহ মানুষকে নরকযন্ত্রণায় ভোগাবার পর? এসবের ভেতর যুক্তি কোথায়?

ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করতে দেখা যায়। ধর্মের নামে নোংরা রাজনীতি চলে। শেষ পর্যন্ত লাভবান হয় কারা? হ্যাঁ, সুবিধাভোগী একটা শ্রেণী।

ছোটবেলায় বাবার সাথে একবার ফিলিপাইনে গিয়েছিল লুবনা। সে-সময় পোপ ওখানে সফর করছিলেন। এশিয়ার সবচেয়ে বড় ক্যাথলিক দেশ ফিলিপাইন, আর সম্ভবত গরিব দেশগুলোর একটা। দারিদ্র্যের সাগরে সুন্দর সুন্দর সব চার্চ মাথা

তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে পোপের সাথে দেখা করার জন্যে ম্যানিলায় আসছিলেন বিশপরা। বাবার সাথে লুবনাও আসছিল ম্যানিলায়। ছয়জন বিশপ ওদের সহযাত্রী ছিলেন। ফার্স্টক্লাসে ভ্রমণ করছিলেন তাঁরা, সবাই শ্যাম্পেন খাচ্ছিলেন। কোথায় যুক্তি?

আবার অন্য রকম ঘটনাও আছে। জিপ নিয়ে লেবানন-ইসরায়েল সীমান্তের একটা গ্রামে গিয়েছিল রানা, সাথে রেমারিকও ছিল। ওখানে একটা ছোট হাসাপাতাল ছিল। আর ছিল একটা মসজিদ। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে গ্রাম খালি হয়ে গিয়েছিল, থাকার মধ্যে শুধু মসজিদের ইমাম সাহেব আর হাসপাতালের কয়েকজন নার্স আর দু'জন মহিলা ডাক্তার ছিল। যুদ্ধের একটা কৌশল হিসেবে প্যালেস্টাইনী গেরিলারা ইসরায়েলিদের ভেতরে ঢুকতে দেবে, কোন রকম বাধা দেবে না। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বোঝানো হল ইমাম সাহেব আর ডাক্তারদের। কিন্তু গ্রাম ছাড়তে ওদের কাউকে রাজি করানো গেল না। ইমাম সাহেবের যুক্তি, তিনি মসজিদ ছেড়ে বিশ বছর নড়েননি, আজও নড়বেন না। ডাক্তারদের কথা, রোগীদের ছেড়ে তাঁরাও যাবেন না, গেলে পাপ হবে। এখানে থাকলে কি ঘটতে পারে, ব্যাখ্যা করে বলল রানা। কিন্তু ওর কোন কথাই কানে তুলল না তারা। শেষ পর্যন্ত জোর খাটাবার চেষ্টা করেও কোন ফল হল না। যারা হাসিমুখে নিরাপত্তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় তাদের ওপর কিভাবে জোর খাটানো যায়?

ফেরার জন্যে গাড়িতে বসে আছে রানা, ফিরে যেতে মন চাইছে না। সুন্দরী একজন ডাক্তারকে ডেকে তার সাথে আবার কথা বলল ও। বলল, 'আপনি সবচেয়ে বেশি ভুগবেন। ওরা আপনাকে ছিঁড়ে খাবে।'

উত্তরে মৃদু হেসে ডাক্তার বলল, 'আমাদের সাথে খোদা আছেন।'

ওদের ইউনিট অনেক পিছিয়ে আসে, ইসরায়েলি সেনাদের মাঝারি একটা গ্রুপ সীমান্ত পেরিয়ে বেশ অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাদের ঘিরে ফেলা হয়, এবং সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে গোটা গ্রুপটাকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। সেই গ্রামে আবার ফিরে এসেছিল ওরা। মসজিদের ভেতর ইমাম সাহেবের লাশ দেখে হাসপাতালে এল ওরা। ওখানে যা দেখল, চিরকাল ওদের মনে থাকবে।

কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ল ওরা, গর্তের ভেতর মেয়েদের যা অবশিষ্ট ছিল ফেলে মাটি চাপা দিল। সেই রাতেই রেমারিক আর রানা অসম্ভব একটা কাজ করে বসে। ইসরায়েলি সীমান্ত পেরিয়ে একটা ঘাঁটির ওপর আকস্মিক হামলা চালায় ওরা। শত্রুরা প্রস্তুত ছিল না, থাকার কথাও নয়। জীপ নিয়ে ঘাঁটির ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা। রেমারিক জীপ চালাল, আর মেশিনগানে থাকল রানা। ঘাঁটির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পাঁচবার আসা-যাওয়া করল ওরা। সৈনিকরা বেশিরভাগ তাঁবুর ভেতর ঘুমিয়ে ছিল, সম্ভবত যুবতী ডাক্তারকে যতজন ধর্ষণ

করেছিল তারচেয়ে বেশি লোককে সে-রাতে খুন করে রানা। কি বলবে? খোদার ইচ্ছে? খোদার প্রতিশোধ?

আলোচনার উপসংহার টেনেছিল লুবনা। আসল কথা বিশ্বাস। নিশ্চিতভাবে জানলে তো আর তোমার বিশ্বাসের দরকার হচ্ছে না। যতদিন না উল্টোটা কেউ প্রমাণ করতে পারছে, ধর্মে তার বিশ্বাস থাকবে।

'প্রমাণ হয়েছে কিনা তুমি জানবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করেছিল রানা।

সহজ-সরল জবাব ছিল লুবনার, 'টেলিভিশনে ঘোষণা করা হবে।'

'এ-সব আমি নিজে কিনেছি,' বলল লুবনা। 'আমার নিজের জমানো পয়সা দিয়ে।'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রানা।

'ক্যাসেটটা শুনবে না?' টু-ইন-ওয়ানে নিজেই ক্যাসেট ভরল লুবনা।

ইতালির গান, কিন্তু ইংরেজিতে গাওয়া। গানের কথাগুলো শুনতে শুনতে অন্য এক জগতে চলে গেল রানা।

'এক সময় থেমে যাবে সমস্ত কোলাহল, ঘুমিয়ে পড়বে ধরণী। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটা মিটমিট করলে বুঝবে আমি তোমায় ডাকছি। সে রাতে তুমি জেগে থেকো, বন্ধু, ঘুমিয়ে পোড়ো না। আর, হ্যাঁ, ফুলের গন্ধ পেলে বুঝে নিয়ো আমি আসছি। আর যদি কোকিল ডাকে, ভেব আমি আর বেশি দূরে নেই। তারপর, হঠাৎ ফুরফুরে বাতাস এসে তোমার গায়ে লুটিয়ে পড়লে বুঝবে আমি এসেছি। সে-রাতে তুমি জেগে থেকো, বন্ধু, ঘুমিয়ে পোড়ো না!'

গান শেষ হবার পর অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। তারপর বিষণ্ণ একটু হেসে লুবনা নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'তুমি আমাকে ঘুম পাড়াতে চাও, তাই না, হাসান? কিন্তু আমি তোমাকে জাগিয়ে রাখতে চাই। একদিন ছাড়াছাড়ি হবে, তখন কিন্তু আমার কথা ভুলে যেয়ো না। গানের কথাগুলো শুনলে তো? সবচেয়ে বড় তারাটা মিট মিট করলে বুঝবে সত্যিই আমি তোমাকে জেগে থাকতে বলছি।'

দু'জন রাখাল তাদের গরুর পাল নিয়ে ঢালের ওপর উঠে এল, সাথে একটা কুকুর। কুকুরটাকে দু'টুকরো রুটি খেতে দিল লুবনা, অমনি তার সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেল, শুরু হয়ে গেল ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া। রাখাল দু'জনকে ওয়াইন খেতে দিল রানা।

সূর্য অস্ত যাবার একটু আগে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল ওরা। ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে লুবনা, ফেরার পথে গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। তার মাথা রানার কাঁধে ঠেকে থাকল। খুব সাবধানে গাড়ি চালাল রানা, লুবনা যাতে ঝাঁকি না খায়।

দুষ্টু মেয়েটাকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে ও।

নয়

লুবনার আজ পিয়ানো শিখতে যাবার দিন।

ছেলেমেয়েদের গান-বাজনা শেখানো মিলানে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নামকরা একজন বাদকের সাথে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে, তাঁর বাড়িতে লুবনাকে নিয়ে যাচ্ছে রানা। শেখার আগ্রহ, আর ক্ষীণতম হলেও প্রতিভার আভাস দেখতে পেলে তবেই লুবনাকে তিনি নিয়মিত শেখাবেন। তখন একটা পিয়ানো কেনা হবে, আর ভদ্রলোক নিজেই হপ্তায় তিনদিন এসে শিখিয়ে-যাবেন।

ইতিমধ্যে রানার মদ্যপান প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। রোজ সকালে নিয়মিত এক্সারসাইজ শুরু করেছে ও। কোমোয় ছোটখাট একটা জিমনেশিয়ামও পাওয়া গেছে, দু'এক দিনের মধ্যে সেখানে নাম লেখাবে।

নিউইয়র্ক থেকে ভিটো আর লরা ফিরে এসেছে, কিন্তু লরা খুব সাবধানে আছে যাতে রানার সামনে তাকে পড়তে না হয়। ফেরার পরপরই স্বামীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা হয়ে গেছে তার। আজ চার দিন পর প্রসঙ্গটা আবার তুলল সে। ভিটো বলল, 'কিন্তু তোমার এই জেদের আমি কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না, লরা। এতদিন যা বলে এসেছ, এখন ঠিক তার উল্টো কথা বলছ।'

'কারণ ঘটেছে বলেই বলছি,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় সুরে বলল লরা। 'এই লোককে এ বাড়িতে আমি রাখব না। এই আমার শেষ কথা। যত তাড়াতাড়ি পার বিদায় কর ওকে।'

'কিন্তু...'

'তোমাকে তো বলেছি, লোকটার দিকে বড় বেশি ঝুঁকে পড়ছে লুবনা। আমি চাই না...'

'এর মধ্যে নোংরা কিছু দেখতে পেয়েছ তুমি?'

মাথা নাড়ল লরা। 'সেরকম কিছু না। চরিত্রহীন বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু ও তো শুধু একজন বডিগার্ড, তাই না? লুবনা যদি বেশি মাখামাখি করে. ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু লাগবে। লাগবে কি, লাগছে। হাসান বলতে ও অজ্ঞান পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তোমার জায়গা দখল করে নিচ্ছে ওই লোক। এ আমি হতে দিতে পারি না। তুমি আজই ওকে বিদায় কর।'

'পাগল হলে?'

'কেন, অসুবিধে কি?'

'তিন মাসের কথা বলে রাখা হয়েছে ওকে,' বলল ভিটো। 'হঠাৎ জবাব দিয়ে দিলে ইউনিয়ন যদি...'

'ও জোর করে থাকতে চাইবে বলে মনে হয় না,' বলল লরা।

'তাই বলে আজই?' মাথা নাড়ল ভিটো। 'তা হয় না, লরা।'

'ঠিক আছে, এই হপ্তার ভেতর,' বলল লরা। 'তার বেশি একদিনও ওকে আমি রাখব না।'

'বেচারা খুব আঘাত পাবে,' অস্ফুটে বলল ভিটো।

'ছেলেমানুষ, সামলে নেবে,' বলল লরা।

'আমি লুবনার কথা ভাবছি না,' বলল ভিটো।

ভিটো আর লরার মধ্যে কি কথা হয়েছে ওরা জানে না। রোববারটা কিভাবে কাটাবে, তাই নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। জুলিয়ানা জেদ ধরেছে, কাজেই রোববারে আবার রানাকে ওদের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে যেতে হবে। শুনে লুবনাও আবদার ধরল, সে-ও যাবে।

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমার মা-বাবা বাড়িতে ফিরেছেন, ছুটির দিনটা তোমার ওঁদের সাথে কাটানো উচিত।'

'কিন্তু জুলিয়ানা তো আমাকেও যেতে বলেছে,' বলল লুবনা। 'বাচ্চা দুটো আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

কিন্তু রাজি হল না রানা। সুযোগ তো আরও আসবে। ওর মা-বাবা ক'দিন পরই তো আবার বাইরে যাচ্ছে।

ভদ্রলোকের অ্যাপার্টমেন্ট সহজে খুঁজে পাওয়া গেল না। একটা ম্যাপ বের করল লুবনা, সে-ই গাইড করে কোরসো বুয়েনস্ এয়ার্স এভিনিউয়ে নিয়ে এল রানাকে চওড়া একটা রাস্তা, রাস্তার দু'পাশে সার সার গাছ, তারপর প্রশস্ত লন। বাড়িগুলো রাস্তা থেকে বেশ অনেক দূরে। পার্কিং লেখা সাইনবোর্ড দেখে রাস্তার একধারে গাড়ি থামাল রানা। লুবনাকে নিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে অ্যাপার্টমেন্টের দরজার দিকে এগোল। দরজায় সিকিউরিটি লক আর ইন্টারকম রয়েছে, ইন্টারকমে লুবনার উপস্থিতি ঘোষণা করতেই ভেতর থেকে খুলে গেল দরজা।

'বেশি দেরি হবে না, হাসান, স্রেফ এক ঘন্টা।'

মৃদু হাসল রানা। 'একেবারে যা-তা বাজিয়ো।' জানে, শেখার কোন আগ্রহ নেই লুবনার। ওর বাবার চাপে পড়ে রাজি হতে হয়েছে ওকে। অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নাকি ওদের পারিবারিক বন্ধু আল বারগো লোরানের করা।

'তা আর বলতে!' চাপা হাসি দেখা গেল লুবনার ঠোঁটে।

গাড়িতে ফিরে এসে খবরের কাগজ নিয়ে বসল রানা। ওপরতলা থেকে একটা জানালা খোলার অস্পষ্ট আওয়াজ এল কানে।

এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল। অ্যাপার্টমেন্টের দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে যেতে মুখ তুলে তাকাল রানা। একটা হাত তুলে নাড়ল লুবনা, লনের ওপর দিয়ে এগিয়ে

আসছে ওর দিকে। এখনও সে চল্লিশ মিটার দূরে, রানার পিছনে মোড় ঘুরে একটা কালো গাড়ি এগিয়ে এল। রাস্তা ছেড়ে এক জোড়া গাছের মাঝখানে ঢুকে পড়ল গাড়িটা, লনের ওপর দিয়ে এগোল। চারজন লোককে দেখল রানা, সাথে সাথে বুঝে নিল কি ঘটতে যাচ্ছে। দ্রুত গাড়ি থেকে নামল ও, পিস্তলটা আগেই বেরিয়ে এসেছে হাতে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে লুবনা।

'দৌড়াও, লুবনা, দৌড়াও!' চিৎকার করল রানা।

ঘ্যাঁচ করে লুবনার সামনে থামল কালো গাড়ি, রানার দিকে তার আসার পথ আটকে দিয়েছে। পিছনের দরজা খুলে গেল, লাফ দিয়ে নামল দু'জন লোক। কিন্তু লুবনার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বাড়িয়ে দেয়া এক জোড়া হাতের তলা দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এল সে, গাড়ির পিছন দিকটা ঘুরে ত্রস্ত হরিণীর মত ছুটল তার বডিগার্ডের দিকে। লোক দু'জন ধাওয়া করল তাকে, দু'জনের হাতেই রিভলভার রয়েছে। দু'বার লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল রানা, ওদের মাঝখানে লুবনা রয়েছে। একজন লোক ধরে ফেলল লুবনাকে, এক হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে তুলে ফেলল শূন্যে, ঘুরে গাড়ির দিকে ছুটল। অপর লোকটা রানার দিকে ফিরে আছে, একটা গুলি করল সে। মাথার অনেক ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। তার বুকে গুলি করল রানা, দু'বার।

প্রথম লোকটা লুবনাকে গায়ের জোরে পিছনের সিটে তোলার চেষ্টা করছে, কিন্তু হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে লুবনা। গাড়ির ভেতর তাকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হল, ইতিমধ্যে অনেকটা কাছে চলে এসেছে রানা। লুবনাকে গাড়ির ভেতর ফেলে দিয়েই ঘুরল লোকটা, হাতের রিভলভার রানার দিকে তাক করা। একটু ওপর দিকে লক্ষ্য করে গুলি করল রানা, ভয় যদি ছিটকে গিয়ে লুবনাকে আঘাত করে বুলেট। লোকটার নাকের নিচে লাগল বুলেট, মগজের ভেতর দিয়ে খুলি ফুটো করে বেরিয়ে গেল। দরজায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল লোকটা, বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পরমুহূর্তে গাড়ির সামনের সিট থেকে পরপর তিনটে গুলি হল, দড়াম করে ঘাসের ওপর আছড়ে পড়ল রানা। ইঞ্জিন গর্জে উঠল। চাকা ঘুরল। লন থেকে রাস্তায় উঠে পড়ল কালো গাড়ি। গাড়ির ভেতর থেকে ওর নাম ধরে চিৎকার করে উঠল লুবনা।

নড়তে পারছে না, বুলেটের ধাক্কা খেয়ে রানার নার্ভাস সিস্টেম থমকে গেছে। ব্যথা আর উদ্বেগ নিয়ে শুধু একটাই প্রার্থনা করল, যেন মরে না যায়। মনের সবটুকু শক্তি এক হল, প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোয়ার বয়ে গেল সমগ্র অস্তিত্বে—বাঁচতে হবে, আমাকে বাঁচতে হবে। লুবনার ডাক ও শুনতে পেয়েছে। সাহায্য চেয়ে—কোন আবেদন নয়—লুবনা তাকে পড়ে যেতে দেখেছে—ওর কণ্ঠে ছিল ব্যাকুল হাহাকার।

দশ

বিছানার পাশে একজন নার্স বসে বই পড়ছে। প্রচুর কড়া ওষুধ দিয়ে রাখা হয়েছে রানাকে, জেগে আছে কিনা বোঝা যায় না। ওর মাথার ওপর একটা মেটাল ফ্রেমে উল্টো করা দুটো বোতল ঝুলছে। নিয়মিত ছন্দে ফোঁটা ফোঁটা রঙহীন তরল পদার্থ পড়ছে ট্র্যান্সপারেন্ট টিউবে। টিউবের একটা ওর বাঁ নাকে ঢুকেছে, অপরটা ডান কব্জির ব্যাণ্ডেজের ভেতরে।

দরজা খুলে এক পা ভেতরে এল ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস অফিসার। নার্সের সঙ্গে কথা বলল সে। 'একজন ভিজিটার। ডাক্তার বললেন, এক মিনিটের বেশি নয়।'

ঘরে ঢুকল রেমারিক, ধীর পায়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, ঝুঁকে তাকাল রানার দিকে। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, হাসান?'

বোঝা যায় কি যায় না, মাথা একটু যেন নড়ল।

'বিপদ কেটে গেছে। তুমি বাঁচবে।'

এবারও মাথা যেন একটু নড়ল।

'আমি মিলানে থাকব। পরে আসব, তখন কথা হবে।' নার্সের দিকে ফিরল রেমারিক। 'ওর কাছে আপনি থাকবেন?'

'আমি বা আর কেউ, উনি একা থাকবেন না।'

নার্সকে ধন্যবাদ জানিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রেমারিক।

করিডরে অপেক্ষা করছিল রিসো আর জুলিয়ানা।

'ও জেগে আছে, কিন্তু কথা বলতে আরও দু'একদিন সময় লাগবে। চল, ফেরা যাক। আমি আবার কাল আসব।'

ডাক্তার ওদেরকে জানিয়েছে, রানাকে প্রায় মরা অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল হাসপাতালে। সাথে সাথে অপারেশন করা হয়, সেলাই করে বন্ধ করা হয় রক্তক্ষরণ। ওটা ছিল ইন্টারিম ইমার্জেন্সি সার্জারি। পোস্ট অপারেটিভ শক যদি কাটিয়ে উঠতে পারে রানা, ওর শক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে তারা, তারপর আবার অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হবে, তখনকার অপারেশনগুলো হবে জটিল আর বিপজ্জনক।

অর্থাৎ ওকে নিয়ে যমে মানুষে লড়াই এখন চলতেই থাকবে।

আরও দুটো দিন বার বার মৃত্যুর কিনারায় গিয়েও ফিরে এল রানা। ডাক্তার বিস্ময় প্রকাশ করে রেমারিককে বলল, 'এ স্রেফ বেঁচে থাকার প্রচণ্ড আকুতি। এরকম জখম নিয়ে কোন মানুষ বাঁচতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।'

পরদিন কথা বলতে পারল রানা।

রেমারিককে প্রথম কথা জিজ্ঞেস করল, 'লুবনা?'

'আলাপ-আলোচনা চলছে,' উত্তর দিল রেমারিক। 'এ-ধরনের ব্যাপারে সময় লাগে।'

'আমার অবস্থা?'

সাবধানে, ভেবেচিন্তে উত্তর দিল রেমারিক। এ ব্যাপারে ওরা দু'জনেই অভিজ্ঞ। 'গুলি খেয়েছ দুটো। তলপেট আর ডান ফুসফুসে। ভাগ্য ভাল যে বত্রিশ ক্যালিবারের বুলেট ছিল। ভারি কিছু হলে আর বাঁচতে হত না। ফুসফুসে অপারেশন ওরা সেরে ফেলেছে, ওটা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। সমস্যা তলপেটের জখমটা নিয়ে। ওখানে আবার অপারেশন করতে হবে, তবে ডাক্তাররা বলছে ভয়ের কিছুই নেই। এখানে এরা সবাই অভিজ্ঞ, গুলি খাওয়া অনেক রুগীর চিকিৎসা করেছে।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'আমি যে দু'জনকে গুলি করলাম?'

মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। 'একজনের হার্ট ফুটো করেছ। দুটো গুলি, কিন্তু ফুটো ওই একটাই'। আরেকজনের মগজ বেরিয়ে গেছে। চমৎকার শূটিং।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দেরি হয়ে গেছে আমার···অনেক দেরি করে ফেলেছি।'

'ওরা প্রফেশন্যাল ছিল, হাসান।'

'জানি। কিন্তু তেমন একটা বাধা পাবে বলে আশাও করেনি। প্রথমে ওরা ফাঁকা গুলি করে, ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছিল। আমি যদি আরেকটু তাড়াতাড়ি করতাম ওদের সব ক'টা মরত। ব্যাপারটাকে খুব হালকাভাবে নিয়েছিল ওরা।'

ক্লান্ত হয়ে পড়ছে রানা, ফেরার জন্যে উঠল রেমারিক। 'কোমোয় গিয়ে ভিটোর সাথে দেখা করব আমি। দেখব আমার যদি কিছু করার থাকে।' কালো মখমলে মোড়া ছোট্ট একটা বাক্স চোখে পড়ল তার। ঝুঁকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল।

'কোরান শরীফের ইংরেজি অনুবাদ,' বলল রানা। 'পরে তোমাকে বলব সব।'

কোমোয় গিয়ে হতাশই হল রেমারিক। সাথে রিসোকেও নিয়েছিল ও। ভিটো আভান্তি আর তার স্ত্রী লরা আভান্তি বাড়িতেই ছিল। কিন্তু দু'জনেই বোবা হয়ে গেছে। দেখে মনে হল গোটা ব্যাপারটা সামলাচ্ছে আলবারগো লোরান। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ভিটোদের বাড়িতেই রয়েছে। দু'একটা কথা হল লোরানের সাথে। তেমন কোন তথ্য লোকটা ওদেরকে দিতে চাইল না। ফিরে আসছে ওরা, এই সময় বিস্ফোরিত হল লরা। আগে সব কথা জানত না সে, কিন্তু এখন সব ফাঁস হয়ে গেছে। স্রেফ তার মুখ রক্ষার জন্যে রাখা হয়েছিল হাসানকে, শুধু তাকে প্রবোধ দেয়ার জন্যে।

'বদ্ধ একটা মাতাল!' রেমারিকের সামনে দাঁড়িয়ে উন্মাদিনীর মত চেঁচাতে থাকল লরা। 'আমার মেয়ের জন্যে একটা নেশাখোরকে রাস্তা থেকে ধরে আনা হয়েছিল!' স্বামীর দিকে ফিরল সে। 'তুমি একটা অপদার্থ, একটা আহাম্মক! আমার মেয়ের যদি কিছু হয়...'

প্রতিবাদ করতে গেল রিসো, কিন্তু রেমারিক তাকে থামাল। রানার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। 'মেয়ে ফিরে এলেই শান্ত হবেন মহিলা,' মন্তব্য করল রেমারিক।

ঘটনাটা রানাকে জানায়নি রেমারিক। এক হপ্তা পর ডাক্তাররা আবার অপারেশন করল। রানা ওদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। বাঁচার কোনই আশা নেই, কিন্তু রোগীর প্রচণ্ড জেদ সে মরবে না, জান-জীবন দিয়ে লড়ল তারা। অপারেশনের পর আটচল্লিশ ঘন্টা ভাল-মন্দ কিছুই বোঝা গেল না, তারপর হাসি ফুটল তাদের মুখে। বিপদ কেটে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বিছানার পাশে বসল রেমারিক। রানাকে আগের চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে, রঙ ফিরে আসছে মুখে। রেমারিকের চেহারায় উদ্বেগ লক্ষ্য করে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ও।

'মেয়েটা মারা গেছে, হাসান।'

মুখ ফিরিয়ে সিলিঙের দিকে তাকাল রানা, চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব, চোখে ভাষাহীন বোবা দৃষ্টি।

একটু ইতস্তত করল রেমারিক, তারপর বলে চলল, 'ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নয়। ওদের টাকার দাবি দু'দিন আগে মেটানো হয়েছে। কথা ছিল সেই রাতেই লুবনাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কিন্তু সে ফেরেনি, পরদিন সকালে পুলিস একটা চুরি করা গাড়িতে তার লাশ দেখতে পায়।'

একটু থেমে আবার শুরু করল রেমারিক, 'রেড ব্রিগেডের একটা গ্যাংকে খুঁজে বের করার জন্যে শহরে ব্যাপক তল্লাশি চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, কিডন্যাপররা খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে, ঘন্টা কয়েকের জন্যে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যায় তারা। লুবনার হাত আর মুখ বাঁধা ছিল, এই অবস্থায় বমি করে সে—সম্ভবত পেট্রলের গন্ধে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কি ঘটতে পারে তুমি জান। পোস্ট মর্টেম হয়েছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে সে।'

ফিসফিস করে কথা বলছিল রেমারিক, সে থামতে ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

অনেকক্ষণ পর রানা জানতে চাইল, 'আর কিছু?'

উঠে পড়ল রেমারিক। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচে রাস্তা, লোকজন আর যানবাহনের ভিড়। তার পিছনে সপাং করে যেন চাবুক পড়ল।

'বল!'

ঘুরে দাঁড়াল রেমারিক, নিচু গলায় বলল, 'ওকে রেপ করা হয়েছে। অনেক বার। ওর কাঁধে আর হাতেও দাগ দেখা গেছে।'

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। দূরে কোথাও চার্চে ঘন্টা বাজছে, অস্পষ্ট শোনা যায়। এগিয়ে এসে বিছানার পাশে দাঁড়াল রেমারিক, রানার দিকে ঝুঁকল। রানার মুখে এখনও কোন ভাব নেই। দৃষ্টি এখনও সিলিঙের দিকে, কিন্তু এখন আর ভাষাহীন নয়—ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে যেন দু'টুকরো হীরে।

ধকলটা সামলে উঠতে সময় লাগল, কিন্তু সেরে ওঠার গতি অটুট থাকল, ওঠা-নামা করল না। এ-ধরনের রোগীকে ডাক্তারদের খুব পছন্দ, সব কথা মন দিয়ে শোনে আর প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলে। দ্বিতীয় অপারেশনের এক হপ্তা পর বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে নামতে পারল রানা। আর ক'দিন পর হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল।

নিজের ওপর জোর খাটাল না। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, তার শরীরকে সময় দিতে হবে। রোজ বাগানে হাঁটল ও, সাথে একজন নার্স থাকল। উদোম গা, ব্যাণ্ডেজগুলোর মাঝখানে পিঠ গরম করে তুলল রোদ। নার্স আর ডাক্তার, সবার সাথে ওর মধুর সম্পর্ক। দরকার না হলে কাউকে বিরক্ত করে না। আর মৃত্যুর কিনারা থেকে ওকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে এনেছে বলে তারাও সবাই ওকে নিয়ে গর্বিত।

একজন নার্সকে কিছু টাকা দিল রানা, খুশি মনে অনেকগুলো খবরের কাগজ কিনে এনে দিল সে। লুবনা কিডন্যাপ হবার দিন থেকে যে ক'টা কাগজ বেরিয়েছে, সবগুলো। তারপর আরও অনেক মাস পিছনের কাগজও তাকে দিয়ে কেনাল রানা। নোটবুকটা আগেই কেনা হয়েছে। রোজই পড়ে রানা, আর দরকারি খবরগুলো নোটবুকে টুকে রাখে।

এক সন্ধেবেলা ওকে দেখতে এলেন এক ভদ্রমহিলা। তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেল রানা। হাতে একটা ঝুড়ি ভর্তি ফল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন লুবনার স্কুলের হেডমিসট্রেস, সিনোরা মিরিয়াম। আধ ঘন্টা থাকলেন তিনি, লুবনাকে নিয়ে কথা বললেন, চোখের পানি ফেললেন দু'ফোঁটা। রানা হঠাৎ খেয়াল করল, সিনোরাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে সে। যাবার আগে সিনোরা বললেন, যে যাই বলুক, আপনি কিছু মনে করবেন না। তিনি শুনেছেন, লোকে বলাবলি করছে, লুবনার বডিগার্ড স্রেফ একটা লোক দেখানো ব্যাপার ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, এখন আপনি কি করবেন? কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, তার কোন প্ল্যান নেই। সিনোরা খুব অবাক হলেন। রানাকে নিরুদ্বিগ্ন আর হাসিখুশি দেখাল। এটা যেন তিনি আশা করেননি। সবশেষে রানার গালে চুমো খেয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

রোজ একবার করে সাইকোথেরাপি রুমে যেতে হয় রানাকে। সুইমিং পুলের গরম পানিতে সাঁতার কাটে আধ ঘন্টা। অন্যান্য এক্সারসাইজও শুরু করল।

এক মাস পর ডাক্তাররা সবাই একবাক্যে বলল, রোগী এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে এটা তারা আশা করেনি। আর এক হপ্তা পর হাসাপতাল থেকে ছাড়া পাবে সে। এই শেষ হপ্তাটা বেশির ভাগ সময় সাইকোথেরাপি ডিপার্টমেন্টে কাটাল রানা, ব্যবহার করল ইকুইপমেন্টের পুরো সেট।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও, পুরোপুরি সেরে উঠতে আরও অনেক সময় লাগবে ওর। এখনও ও দুর্বল। তবে শরীরে কোথাও আড়ষ্ট ভাব নেই, প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ যে যার ভূমিকায় কাজ করতে পারে।

বিদায়ের দিন ডাক্তার আর নার্সরা দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল ওকে। সবাই ওকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাল। ধন্যবাদ জানিয়ে ধাপ ক'টা টপকাল রানা। দরজায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, হাতে সুটকেস নিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখছে।

'অদ্ভুত একটা মানুষ,' মন্তব্য করল মেট্রন।

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সমর্থন করল হেড ফিজিশিয়ান। 'হাসপাতাল সম্পর্কে ওর প্রচুর অভিজ্ঞতা।'

নেপলস সেন্ট্রাল স্টেশন। মিলান থেকে একটা ট্রেন এসে থামল। বিলাসবহুল স্লীপিং কার থেকে নামার আগে সুন্দরী স্টুয়ার্ডেসকে টিপস্ দিল রানা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল ও। ড্রাইভারকে বলল, 'প্রেজো ফিসো।'

সকালের বাজার সেরে ফিরে এসেছে ফুরেলা, ভ্যান থেকে মালপত্তর নামাচ্ছে, এই সময় পৌঁছুল ট্যাক্সি। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে। একগাল হেসে জানতে চাইল, 'কেমন আছেন?'

'ভাল। দেখি, সর, কয়েকটা ঝুড়ি আমাকেও বইতে দাও।'

কিচেন টেবিলে বসে আছে রেমারিক, কফি খাচ্ছে, ভেতরে ঢুকল ওরা।

'দোস্ত,' বলে টেবিলের ওপর তিনটে ঝুড়ি নামিয়ে রাখল রানা।

নড়ল না রেমারিক। রানাকে সতর্ক চোখে দেখল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করল। 'দোস্ত!'

আধ মিনিট পর পরস্পরকে ছাড়ল ওরা। রেমারিক কাঁদছে, কিন্তু চোখে পানি নেই। রানা হাসছে, কিন্তু চেহারায় তার কোন ছাপ নেই।

পট থেকে রানার জন্যে কফি ঢালল রেমারিক। 'আমি তো ভেবেছিলাম একটা ভূত ফিরে আসবে। নাহ্, ওরা তোমার যত্ন নিয়েছে!'

'ওরা সবাই খুব ভাল মেকানিক।' দু'জনেই হাসল, পুরানো দিনের পরিচিত সংলাপ।

আলোচনা শুরু হল ডিনারের পর, টেরেসে সামনাসামনি বসে।

ও কি করতে চায় শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল রানা। বিবেক, নীতি, আদর্শ— এসব প্রসঙ্গে গেল না। প্রশ্ন বিচার নিয়েও নয়, এ স্রেফ নির্জলা প্রতিশোধ। ওরা তার হৃদয়ের একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, প্রতিশোধ নেবে ও।

'চোখের বদলে চোখ?' শান্ত সুরে জানতে চাইল রেমারিক।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রানা। ভারি গলায় বলল, 'তারচেয়েও বেশি, রেমারিক।'

'মেয়েটাকে সত্যি তুমি ভালবাসতে!' ঠিক প্রশ্ন নয়, স্বগতোক্তির মত শোনাল কথাটা।

উত্তর দেয়ার আগে অনেকক্ষণ চিন্তা করল রানা। 'ভালবেসেছিলাম কিনা, কতটুকু ভালবেসেছিলাম, এ-সব কথা থাক, রেমারিক। শুধু জান, লুবনা মরেনি,' নিজের বুকে আঙুল ঠেকাল রানা। 'এখানে লুকিয়ে আছে। আমাকে একটা গান দিয়ে গেছে ও। আমি ঘুমাতে পারি না।'

রানার ব্যথা আর শোক উপলব্ধি করতে পারে রেমারিক। জেসমিন মারা যাবার পর তারও এই রকম হয়েছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তার। 'কোরান শরীফের ইংরেজি অনুবাদ—ওটা…?'

'আমাকে দিয়েছিল ও। জন্মদিনের উপহার।'

রানাকে কখনও ধর্ম নিয়ে কথা বলতে শোনেনি রেমারিক। ও নাস্তিক কিনা, তাও জানে না। লুবনা হয়ত জানতে পেরেছিল, তাই এই উপহার।

'আমার সাহায্য দরকার, রেমারিক।'

উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। এগিয়ে এসে বন্ধুর কাঁধে একটা হাত রাখল। রানাও উঠল। দু'জনে এসে রেলিঙের সামনে দাঁড়াল ওরা।

'পাবে,' বলল রেমারিক। 'সাধ্যের বাইরে করব আমি। কিন্তু খুন নয়। ওটা বাদ দিয়েছি। তুমি তো জান, জেসমিনকে কথা দেয়া আছে। ওটা ছাড়া যা তুমি বল।'

'জানি। ওটা তোমাকে করতে বলবও না। খুনগুলো আমিই করব, এ আমার ব্যাপার। কিন্তু আমাকে সাহায্য করলে তোমার বিপদ হতে পারে।'

রেমারিক হাসল। 'তা হতে পারে। বিপদ আমার জীবনে নতুন কিছু নয়।' ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল সে। 'কাজটা কার, জেনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি। তখনই আমি ওদেরকে ভাল করে দেখেছিলাম। তারপর খবরের কাগজ ঘেঁটেছি। আমাকে যে গুলি করেছিল তার নাম এলি। ড্রাইভারের নাম অগাস্টিন। হিনো ফনটেলা-র লোক ওরা।' গম্ভীর হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। 'নিজেদের খুব বুদ্ধিমান মনে করে। বলেছে, ঘটনার সময় ওরা তুরিনে ছিল। দশ-বারোজন সাক্ষী দিয়েছে।'

'তুমি ওদের নাম জানলে কিভাবে?'

'পুলিস আমাকে কয়েক শো ফটো দেখিয়েছিল, একবার চোখ বুলিয়েই ওদের আমি চিনতে পারি।'

'পুলিসকে তুমি জানাওনি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জানালে কি হত ওদের, বল?'

'তা ঠিক,' বলল রেমারিক। 'খুব বেশি হলে দু'চার বছরের জেল হত। কিন্তু জেলের ভেতর রাজার হালে থাকত ওরা। তারপর পেরোলে ছাড়া পেয়ে যেত।'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখন আর তা হবে না।'

একটু ভাবল রেমারিক। বলল, 'তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। ওরা কেউ পাল্টা কিছু আশা করছে না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে কেটে পড়তে পারবে তুমি। ওরা সম্ভবত কেউ গভীর জলের মাছও নয়।'

'তুমি ঠিক বোঝনি, রেমারিক,' শান্তভাবে বলল রানা।

অবাক দেখাল রেমারিককে। 'তাহলে কিভাবে?'

প্ল্যানটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা।

হতভম্ব হয়ে গেল রেমারিক।

'কাজেই বুঝতে পারছ তো, কেন তোমার সাহায্য দরকার আমার?'

'কিন্তু কিভাবে? কি বলছ তুমি জান?' ঘাবড়ে গেছে রেমারিক। 'ওদের সেটআপ সম্পর্কে ধারণা রাখ?'

শান্তভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভালোই রাখি। হয়ত সবটুকু নয়, কিন্তু কাঠামোটা কি জানি। মিলানে প্রধান বস্ দু'জন—ফনটেলা আর গামবেরি। এই কিডন্যাপ ফনটেলার কাজ। রোমে বসে আতুনি বেরলিংগার টাকার একটা ভাগ পেয়েছে। আর সবশেষে পালার্মোর পেটমোটা শুয়োরটা—ডন বাকালা। বাকালা সব কিছু থেকে ভাগ পায়।'

হঠাৎ কি হল, সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল রেমারিকের, উন্মাদের মত অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ল। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এতক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছে রেমারিক, সেই সঙ্গে, যতই অসম্ভব বলে মনে হোক, প্রস্তাবটা অনুমোদনও করছে সে।

হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে গেল রেমারিকের। এক সময় থামল সে। বলল, 'এতদিনে একটা কাজের কাজ হবে তাহলে। আমার হিংসা হচ্ছে, দোস্ত। এই একটা কাজেই তুমি অমর হয়ে যাবে।'

'অমর আমি হতে চাই না,' বলল রানা। 'বেঁচে ফিরব সে আশাও কম। আমি শুধু প্রতিশোধ নিতে চাই, রেমারিক। বদলে যা-ই হারাই না কেন, দুঃখ করব না।'

আবার হাসল রেমারিক, ছোট্ট করে। 'আতুনি বেরলিংগার, তাই না? বাছাধন, এবার?' বাস্তবে ফিরল সে, রানার দিকে তাকাল। 'এত সব তুমি জানলে কিভাবে?'

'কিছু কিছু আগে থেকেই জানতাম,' বলল রানা। পুরানো খবরের কাগজ থেকে কিছু জেনেছি। নিজেদের ক্ষমতা আর প্রভাবের ওপর ওদের এত বিশ্বাস যে অপরাধ করে সেগুলো আবার ফলাও করে প্রচার করে। এরই নাম মাফিয়া। আরেক সরকার নামে একটা বইও পড়েছি, একজন জার্নালিস্টের লেখা। লোকটা যে এখনও বেঁচে আছে সেটাই আশ্চর্য।'

'বই ছাপা হয়ে গেছে, তাই মারেনি। বাইরের লোককে ওরা তখনই খুন করে যখন গোপন একটা তথ্য ফাঁস হয়ে যাবার ভয় দেখা দেয়। বই বেরিয়ে যাওয়া মানে যা ফাঁস হবার হয়ে গেছে, কাজেই লোকটা ওদের হাতে মরবে না।' রানার হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিল সে। তারপর লাইটার জ্বালল। 'এবার বল, আমাকে কি করতে হবে।'

কফির জন্যে কিচেনে ফিরে এল ওরা। টেবিলে বসে বিশদ আলোচনা শুরু করল। গোটা ব্যাপারটা সতর্কতার সাথে একটা ছকে বেঁধে নিয়েছে রানা। নোটবুকে একটা নকশাও এঁকেছে। দেখেশুনে মাথা ঝাঁকাল রেমারিক, প্রভাবিত হয়েছে সে। পরিবহন, ঘাঁটি, ইকুইপমেন্ট কি কি দরকার সব লিখল রানা। চেয়ারে হেলান দিল ও, কাপের কিনারা দিয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে।

'দারুণ, রানা, চমৎকার,' বলল রেমারিক। 'কিন্তু সত্যি জান তো কিসের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছ তুমি?'

'তুমিই না হয় জানাও আমাকে।'

যা জানে সব গুছিয়ে বলল রেমারিক। মানুষ যতটা বিশ্বাস করে বা যতটা বিশ্বাস করতে চায়, মাফিয়া তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। পুলিসকে ওরা কেয়ার করে না, অনেক সময় তাদের ওরা নিয়ন্ত্রণ করে। আইন, কোর্ট, বিচার—এসব ওরা কিনে ফেলে। রাজনীতিকদের—গ্রামের কাউন্সিলর থেকে শুরু করে ক্যাবিনেট মিনিস্টার—সবাইকে ওরা ঘুষ দেয়। কোন কোন এলাকায়, বিশেষ করে দক্ষিণে আর সিসিলিতে, আক্ষরিক অর্থে ওরাই আইন, ওদের সুবিধে মত শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হয়। ভেতর আর বাহির থেকে জেলখানাগুলো ওরাই চালায়। মাঝেমধ্যে দু'চার বছরে এক-আধবার, মাফিয়াদের কোন কোন কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষ, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই করতে পারে না। সমাজের সব স্তরে আছে ওরা, ওদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার সাহস কারও নেই।

কর্তৃপক্ষের অস্ত্র বলতে, পুলিস, কোর্ট, জেলখানা। আগেই বলেছি, এগুলোর ভেতর মাফিয়ার লোক ঢুকে আছে। তবু, ভাল পুলিস, সৎ বিচারকও দু'চারজন আছে বটে। কিন্তু তারা সংগঠিত নয়, কেউ তাদেরকে সাহায্য করার নেই। ত্রিশ দশকে শুধু মুসোলিনি ওদেরকে এক হাত দেখাতে পেরেছিল, তার কারণ সে ব্যবহার করেছিল ফ্যাসিস্ট মেথড। মাফিয়ার সাথে প্রচুর নিরীহ লোককেও ভুগতে হয়েছিল তখন। মুসোলিনির পর আবার ওরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রতিটি

শহরের প্রতিটি থানায় ওদের ইনফরমার আছে, ঘুষ খাওয়া পুলিস আছে, শহরটা যত ছোটই হোক না কেন। প্রতিটি গ্রামের অবস্থাও তাই। গুণ্ডা-পাণ্ডাদের নিয়ে তৈরি বিশাল একটা সেনাবাহিনীও রয়েছে ওদের।

'কাজটা সহজ হবে না,' স্বীকার করল রানা। 'তবে, এসবই আমার জানা আছে। কিছু কিছু দিকে সুবিধে পাব আমি। যেমন, মুসোলিনির মত, আমি এমন কৌশল ব্যবহার করতে পারব, পুলিসের পক্ষে যা সম্ভব নয়। একটা উদাহরণ দিই—আতঙ্ক। এটাকে ওরা একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু নিজেরা এই আতঙ্কের শিকার হতে অভ্যস্ত নয়।'

যুক্তিগুলো উপলব্ধি করল রেমারিক। জানে, রানা ওদের মুখ খোলাতে পারবে।

'আরেকটা সুবিধে,' বলে চলল রানা, 'পুলিসের মত আমার কাজ প্রমাণ, সাক্ষী ইত্যাদি জোগাড় করা হবে না। ওদেরকে আমি কোর্টে হাজির করতে যাচ্ছি না।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। 'অস্ত্র?'

'খবর নাও গগল কোথায় আছে,' বলল রানা। নোটবুক খুলে অস্ত্রের তালিকাটা পড়ল ও।

'মাইরি, রানা, তুমি সত্যি যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে! এত কিছু কি দিতে পারবে গগল?'

'আমি বললে সাগর সেঁচে মাণিক এনে দেবে,' রেমারিককে আশ্বস্ত করল রানা। 'একটা ফোন নাম্বার দেব, ডায়াল করলেই জানতে পারবে কোথায় আছে ও।'

'এসব তোমার কবে দরকার?'

'মাস তিনেক পরে,' বলল রানা। 'এই তিন মাসে শরীরটাকে পুরোপুরি ঠিক করে নেব আমি। গগলকে আমার কথা বলবে, বলবে ওগুলো আমি মার্সেলেস থেকে রিসিভ করব। তাপর কিভাবে ইটালিতে নিয়ে আসব, ভেবে রেখেছি।'

স্বাস্থ্য উদ্ধারের প্রসঙ্গ আবার ফিরে এল। রানা বলল, 'নিরিবিলি একটা জায়গা দরকার। কোন সাজেশন দিতে পার?'

মাত্র একমুহূর্ত চিন্তা করল রেমারিক। 'মাল্টায় যাও না কেন? জেসমিনের বাপের বাড়ি, গোজোয়? দ্বীপটা তোমার খুব ভাল লেগেছিল, মনে আছে? সবাই ওরা চেনে তোমাকে, আপনজনের মত আদর পাবে, কিন্তু কেউ তোমাকে একটা প্রশ্নও করবে না। আমি জানি। ফি বছর আমিও হপ্তা দুয়েক কাটিয়ে আসি ওখানে। বল তো ফোন করি ওদেরকে।'

প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'মনে হয় ভালই হবে। কিন্তু ওদের কোন অসুবিধে করব না তো?'

ঠোঁট টিপে হাসল রেমারিক। 'জেসমিন তোমার সম্পর্কে এমন সব

সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে, তোমাকে পেলে ওরা আকাশের চাঁদ হাতে পাবে। একবার শুধু গিয়েই দেখ না। আমার শ্বশুরের সাথে ক্ষেতে কাজ করতে পার, শরীরটাকে যদি লোহা বানাতে চাও।'

আলোচনার এক পর্যায়ে রানার ছদ্মবেশ প্রসঙ্গ উঠল। দু'জনেরই ধারণা, যুদ্ধ শুরু হবার পর কিছুদিনের মধ্যেই ওর আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে। হয় হবে, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত বর্তমান পরিচয়ই বহাল থাকবে। রানা জানাল, যেজন্যে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই বিপদ এখনও কাটেনি, কাজেই দেশে বা কাজে ফেরার ওর কোন তাড়া নেই। হাতে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।

টাকা পয়সার কথাও উঠল। রেমারিক বলল, অস্ত্রশস্ত্র কেনার টাকা সে দেবে। ইটালি থেকে যা যা কিনতে হবে তাও সে কিনে রাখবে। ব্রাসেলসে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে।

হাসল রানা। বলল, 'অস্ত্রের জন্যে টাকা লাগবে না। টাকার কথা বললে খেপে যাবে গগল। এটা আমাকে শোধ করতে হবে ওর কোন উপকার করে।' তারপর রানা জিজ্ঞেস করল, 'ধর যদি কাজের মাঝখানে আমি মারা যাই?'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল রেমারিক। 'তখন আমি জেসমিনের কছে ক্ষমা চাইব। বলব, দুঃখিত, কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু রাখতে পারলাম না।'

রাত শেষ হতে চলেছে, কিন্তু ওদের আলোচনা থামল না। ঠিক হল, দু'দিন পরই ফেরিতে চড়ে পালার্মোয় যাবে রানা। ডন বাকালার আস্তানাটা দেখে আসা দরকার ওর। ওখান থেকে ট্রেনে করে রেগিয়ো, তারপর আবার ফেরিতে চড়ে মাল্টা।

উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নোটবুক খুলে পাতা উল্টালো রেমারিক, দেখে নিচ্ছে কিছু বাদ পড়েছে কিনা। দেখা শেষ করে বলল, 'এখন তাহলে আসল কাজ তোমার শরীরটাকে আগের ফর্মে ফিরিয়ে আনা।'

'হ্যাঁ।' মুচকি একটু হাসল রানা। 'পাঞ্জাটা মৃত্যুর সাথে লড়তে হবে কিনা।'

'চল, শোবে চল।'

'আমি একটু বারান্দায় বসব,' বলল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল ও। 'তুমি যাও।'

ভোরের আলো ফুটছে। বারান্দায় একা একটা চেয়ারে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। সবচেয়ে বড় তারাটা মিটমিট করছে দেখে চমকে উঠল ও। নিচের বাগান থেকে ফুলের গন্ধ এসে ঢুকল নাকে। বসন্তকাল, দূরে কোথাও একটা কোকিল ডেকে উঠল। তারপর, হঠাৎ ফুরফুরে বাতাস এসে লুটিয়ে পড়ল গায়ে।

সেই গানটা বেজে উঠল অন্তরে।

'এক সময় থেমে যাবে সমস্ত কোলাহল, ঘুমিয়ে পড়বে ধরণী। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটা মিটমিট করলে বুঝবে আমি তোমায় ডাকছি। সে-রাতে তুমি জেগে থেকো, বন্ধু, ঘুমিয়ে পড়ো না। আর, হ্যাঁ, ফুলের গন্ধ পেলে বুঝে নিয়ো আমি আসছি। আর যদি কোকিল ডাকে, ভেব আমি আর বেশি দূরে নেই। তারপর, হঠাৎ ফুরফুরে বাতাস এসে তোমার গায়ে লুটিয়ে পড়লে বুঝবে আমি এসেছি। সে-রাতে তুমি জেগে থেকো বন্ধু, ঘুমিয়ে পড়ো না।'

উঠে দাঁড়িয়ে রেলিঙের সামনে চলে এল রানা। রেলিংটা শক্ত করে চেপে ধরল দু'হাত দিয়ে, সারা শরীর কাঁপছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে বিড়বিড় করে বলল ও, 'জেগে আছি, আমি জেগে আছি।'

অগ্নিপুরুষ-২

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮৬

এক

পায়ের কাছে স্যুটকেস, ফেরি বোটের টপ ডেকে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। নামের সাথে চেহারার কোন মিল নেই, বোটটা দেখতে বরং অনেকটা কাছিমের মত—মাল্টা আর গোজোর মাঝখানে সাগর মাত্র দু'মাইল, শুধু এই পানি পথেই লোকজন আর যানবাহন নিয়ে চলাচল করে ডলফিন।

খুদে দ্বীপ কোমিনোকে পাশ কাটিয়ে এল বোট, পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন ওয়াচটাওয়ার। পানি এখানে স্বচ্ছ নীল, তলার বালি পরিষ্কার দেখা যায়—ব্লু লেগুন। বেশ ক'বছর আগে, অথচ রানার মনে হল এই তো সেদিন—রেমারিক আর জেসমিনের সঙ্গে এখানে সাঁতার কেটেছে ও।

সামনে, গোজোর দিকে তাকাল রানা। সাগর থেকে হঠাৎ প্রায় খাড়াভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সবুজ দ্বীপটা। পাহাড়গুলোর মাথায় মাথায় মুকুটের মত সাজানো গ্রাম। পাহাড়ের গা থেকে মাটি কেটে বিশাল আকারের ধাপ তৈরি করা হয়েছে, প্রতিটি ধাপ এক একটা খেত, নিচের খেতটা সাগরের কিনারা ছুঁয়েছে।

প্রথমবার গোজোয় এসে দ্বীপটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল রানা। গোজোর সমাজে ছোট-বড় ভেদ নেই, সবাই সমান। ভূমিহীন কৃষক বা একেবারে গরীব জেলে লোকটাও জানে তার অধিকার আর স্বাধীনতা গোজোর সবচেয়ে ধনী লোকটার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সারাদিন খেটে যা সে রোজগার করে তা দিয়ে সংসারের ভরণ-পোষণ ছাড়াও হাতে কিছু থাকে, ইচ্ছে করলে অনেকের মত সে-ও রুচিতা'স-এ বসে সন্ধে থেকে মাঝরাত পর্যন্ত আকণ্ঠ মদ খেতে পারে। অন্যদের চেয়ে নিজেকে কারও বড় মনে করার প্রবণতা থাকলে গোজোকে তার এড়িয়ে চলা উচিত। গোজোর লোকেরা হাসিখুশি আর ফুর্তিবাজ, তোমাকে ওদের পছন্দ হলেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে।

ফেরি জেটিতে ভিড়তেই গেঁয়ো লোকগুলো শোরগোল তুলে নামতে শুরু করল।

পাহাড়ের খানিকটা ওপরে উঠে দ্বীপের একমাত্র বার রুচিতা'স-এর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। মান্ধাতা আমলের বিল্ডিং, সাগরের দিকে মুখ করা একটা ঝুল-বারান্দা আছে। রেমারিক বলে দিয়েছে, জেসমিনের বাবাকে ফোন করতে হবে এখান থেকে। বারের ভেতরটা ঠাণ্ডা, সিলিং থেকে ঝাড়বাতি ঝুলছে, দেয়ালে আঁকা পাহাড় আর নদীর ছবি। দরজার কাছে স্যুটকেস রেখে কাউন্টারের দিকে

এগোল রানা, মগভর্তি বিয়ার দেখে অনুভব করল গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। গোলগাল চেহারার বারটেণ্ডার জিজ্ঞেস করল, 'এক পাইন্ট, নাকি অর্ধেক?'

'এক পাইন্ট, ধন্যবাদ।' উঁচু টুলে বসে কাউন্টারের ওপর এক পাউণ্ডের একটা নোট রাখল রানা। খুব ঠাণ্ডা বিয়ার, প্রাণ জুড়িয়ে গেল। বাকি টাকা কাউন্টারে রাখল বারটেণ্ডার, রানা জিজ্ঞেস করল, 'পাজেরো তাজার ফোন নাম্বার দরকার আমার, দিতে পারবে?'

বারটেণ্ডার শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল।

'পাজেরো তাজা,' আবার বলল রানা। 'নাদুরের কাছে তার একটা ফার্ম আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল বারটেণ্ডার। 'তাজা একটা কমন নাম, আর গোজোয় তো অনেকেরই ফার্ম আছে,' বলে অন্য এক লোককে বিয়ার দেয়ার জন্যে সরে গেল সে।

বিরক্ত না হয়ে লোকটার আচরণ মনে মনে অনুমোদন করল রানা। গোজো ছোট্ট একটা দ্বীপ, লোকটা পাজেরো তাজাকে না চিনেই পারে না। কিন্তু এই দ্বীপবাসীদের বৈশিষ্ট্যই হল নিজেদের সমস্ত ব্যাপার বাইরের লোকদের কাছে গোপন করে রাখা। অচেনা আগন্তুকের পরিচয় আর উদ্দেশ্য না জেনে মুখ খুলবে না।

খানিক পর আরও এক পাইন্ট বিয়ার চাইল রানা। বারটেণ্ডারকে বলল, 'ভিটেলা রেমারিক পাঠিয়েছে আমাকে। পাজেরো তাজার বাড়িতে কিছুদিন থাকব বলে এসেছি।'

বারটেণ্ডারের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আচ্ছা, তুমি তাহলে ওই পাজেরো তাজার কথা বলছ! কৃষক—নাদুরের কাছে?' মাথা ঝাঁকাল রানা। কয়েক সেকেণ্ড ওকে খুঁটিয়ে দেখার পর হাসল লোকটা, হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি সাকো।' টেবিলে বসা এক যুবককে ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'আমার ভাই, টাগলিয়া।' তারপর দেখাল রোগা-পাতলা চেহারার এক লোককে, মুখের নিচের অংশ ঢাকা পড়ে আছে লম্বা-চওড়া কালো গোঁফে। 'টাফি।' আরও দু'জন যুবককে দেখাল সে, বলল, 'মিলানো আর আলফানসো—ওরাই ফেরি চালায়।'

মিলানো আর আলফানসোকে চিনতে পারল রানা, ফেরিতে দেখেছে। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বারটেণ্ডার বুঝিয়ে দিল, গোজোয় এখন আর ও আগন্তুক নয়। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল সাকো, মাল্টিজি ভাষায় দু'চারটে কথা বলল। রিসিভার রেখে দিয়ে রানার দিকে ফিরল সে। 'নিডো তোমাকে নিতে আসছে।'

রানার সামনে মগভর্তি বিয়ার রাখল টাগলিয়া, ইঙ্গিতে গোঁফওয়ালা টাফিকে দেখাল। গোজোবাসীদের এই রীতিটা মনে পড়ে গেল রানার। একবার যদি

পরস্পরকে বিয়ার কিনে খাওয়াতে শুরু করে ওরা, পালা করে সবাই সবাইকে খাওয়াতে কখনও কখনও দেড়-দু'দিন লেগে যায়। পরিবেশটা শান্ত আর স্বস্তিকর লাগল, সহজেই এদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়া যাবে। বেয়াড়া কোন প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না ওকে, কারও সাথে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ বাধবে না। গোজোবাসীদের বন্ধুত্বে কোন কৃত্রিমতা নেই। গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে না এলে সবাই তোমাকে আপনজন বলে মেনে নেবে। শুধু তোমার যখন পালা, কিপটেমি কোরো না। আর ডাঁট দেখিয়ো না—গর্ব করা গোজোয় সবচেয়ে বড় 'পাপ'। লম্পট, খুনী, ডাকাত বা পকেটমারকেও হয়ত সহ্য করা হবে, তারা যদি নিজের পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চায়, কিন্তু সে যদি কোন ব্যাপারে ডাঁট দেখায়, এ দ্বীপে তার ঠাঁই হবে না।

মগ খালি করে সাকোর দিকে তাকাল রানা। এগিয়ে এসে মগটা আবার ভর্তি করে দিয়ে রানার সামনে থেকে টাকা নিল সাকো। রানা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি?'

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল সাকো। 'এত সকালে আমার চলে না।'

দশ মিনিট পর সাকোর মুখে হাসিটা ফিরে এল, রানার সামনে থেকে গুনে গুনে দশ সেন্ট তুলল সে। 'ক্ষতি কি!' বলে নিজের জন্যে মগভর্তি করে বিয়ার ঢালল।

রানার জানা নেই, এটাই সাকোর অভ্যেস। কেউ অফার করলে প্রথমে সাকো সেটা প্রত্যাখ্যান করবে, তারপর দশ মিনিট থেকে আধ ঘন্টা পর সহাস্যে এগিয়ে এসে বলবে, 'ক্ষতি কি!'

গোজোয় প্রত্যেকেরই একটা করে ডাকনাম আছে, বলাই বাহুল্য, সাকোকে 'ক্ষতি কি' বলে ডাকা হয়। সেই রকম টাফিকে বলা হয় 'গুঁফো,' আর সাকোর ভাই টাগলিয়াকে 'কিন্তু'। টাগলিয়াকে 'কিন্তু' বলার কারণ শব্দটা অতিমাত্রায় ব্যবহার করে সে। মিলানোর ডাকনাম 'হাজির' আর আলফানসোর 'অক্লান্ত'। মিলানো ফেরি থেকে নেমে সোজা রুচিতা'স-এ চলে আসে, এসেই ঘোষণা দেয়, আমি হাজির। আর আলফানসো'র বিয়ার খেতে কোন ক্লান্তি নেই, যত দেবে তত খাবে, আজ পর্যন্ত কেউ তার রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। কিন্তু, ক্ষতি কি, গুঁফো, অক্লান্ত, বিদ্রোহী, হাজির—এদের মধ্যে এই মুহূর্তে বিদ্রোহী অর্থাৎ কার্লো ছাড়া আর সবাই রয়েছে বারে। এরা গোজোর ছয় রত্ন, দ্বীপটাকে আনন্দ-মেলা বানিয়ে রেখেছে।

বাইরে তোবড়ানো একটা ল্যাণ্ড-রোভার এসে থামল। লাফ দিয়ে নামল উনিশ-বিশ বছরের এক যুবক, মাথায় কোঁকড়া কালো চুল। বারে ঢুকে রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'হাই, আমি নিডো। ওয়েলকাম, হাসান ভাই।'

জেসমিনের ভাইকে অস্পষ্টভাবে চিনতে পারল রানা, প্রায় আট বছর আগে দেখেছে। করমর্দন করার সময় অনুভব করল নিডোর হাত লোহার মত শক্ত।

'কোন তাড়া নেই তো?' হাসিমুখে রানাকে জিজ্ঞেস করল সে। মৃদু হেসে মাথা নাড়ল রানা। ইতিমধ্যে নিডোর সামনে বিয়ার রেখে গেছে সাকো। এক চুমুকে মগের অর্ধেকটা খালি করে ফেলল নিডো। 'সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে বস্তায় জলপাই ভরেছি, তেষ্টায় একেবারে ফেটে যাচ্ছে ছাতি।'

ছোটখাট একটা উৎসব জমে উঠল, একের পর এক বিয়ারের ক্যান খুলছে সাকো। গোজোর দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি, আরবী আর ইটালিয়ানও কমবেশি জানে সবাই। ওদের কথাবার্তা বুঝতে বা হাসি-তামাশা উপভোগ করতে রানার কোন অসুবিধে হল না। একটু পর জেলেরা বারে ঢুকতে শুরু করল, মাথার ওপর সূর্য নিয়ে সারাদিন খোলা বোটে কাজ করে সবাই খুব তৃষ্ণার্ত। মিলানো আর আলফানসো উঠল, আজকের মত শেষবার ফেরি নিয়ে মাল্টা থেকে ঘুরে আসবে ওরা। বেশিরভাগ লোক লাগার বিয়ার থেকে কড়া মদের দিকে ঝুঁকছে, এই সময় হাতঘড়ির দিকে তাকাল নিডো। 'কি সর্বনাশ, এরই মধ্যে ছ'টা!' রানার দিকে তাকাল সে। 'চল, চল—দেরি করায় মা আজ আমার কান ছিঁড়ে নেবে!'

ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে পাহাড়ে চড়ল ওরা, খুদে গ্রাম কালা-র ভেতর দিয়ে উল্টো দিকে চলে এল, তারপর নিচে নেমে এসে বাঁক নিয়ে নাদুরের পথ ধরল।

ঘেরা উঠনের মাঝখানে পাথরের তৈরি ফার্মহাউস। বাড়ির একটা অংশ নতুন, বাইরে থেকে আলাদা সিঁড়ি উঠে গেছে সেখানে। কিচেন থেকে বেরিয়ে এল মোটাসোটা, তেল চকচকে এক প্রৌঢ়া। একই মানুষ, কিন্তু অন্য চেহারা, রানাকে চিনতে না পারলেও ভূত দেখার মত চমকে উঠল না, শুধু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল রানা। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রৌঢ়া অনোরিয়ার পেশীতে ঢিল পড়ল, উজ্জ্বল হল তার চোখ জোড়া, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসি। এগিয়ে এসে রানাকে আলিঙ্গন করল সে, চুমো খেল গালে। 'ওয়েলকাম, রানা। অনেকদিন পর এলে।' ছেলের দিকে কটমট করে তাকাল সে। এতক্ষণ রানার পিছনে গা ঢাকা দিয়ে ছিল নিডো।

'মাসুদ ভাইয়ের তেষ্টা পেয়েছিল, মা, আমি কি করব!' রানার উদ্দেশে একটা চোখ টিপল নিডো।

'মাসুদের সুটকেস দোতলায় রেখে আয়,' হুকুম করল অনোরিয়া। 'চপ্পল জোড়া নিয়ে আসবি।' রানার একটা হাত ধরে কিচেনে ঢুকল সে।

বড়সড় একটা ঘর। রানার মনে পড়ল, খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে পারিবারিক আড্ডা সব এখানেই চলে। ডাইনিংরূম আর লাউঞ্জ ব্যবহার করা হয় শুধু কোন মেহমান এলে।

'জুতো খুলে বস, বাবা,' অনোরিয়া বলল। রানার সামনে পট ভর্তি কফি আর কাপ-পিরিচ রাখল সে। তিনটে স্টোভে রান্না হচ্ছে, মাংস আর মশলার গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল অনোরিয়া, কিন্তু মুখ বন্ধ নেই।

রেমারিক কেমন আছে? রানা কি জানে, স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ভায়োলার? ডাইভোর্সের জন্যে আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু সেটা মঞ্জুর হতে ক'বছর লাগবে কেউ বলতে পারে না। ইটালিতে বিবাহবিচ্ছেদ অত্যন্ত জটিল আর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ছুটি নিয়ে বাড়ি আসবে ভায়োলা, টেলিফোন করে জানিয়েছে তার নাকি খুব শখ মাসুদ ভাইকে চিংড়ি মাছের কোপ্তা রেঁধে খাওয়াবে।

পরিবেশটা ঘরোয়া, অনোরিয়া রানার ব্যক্তিগত কোন প্রসঙ্গ না তোলায় ওর পেশীতে ঢিল পড়ল। খানিক পর খেত থেকে ফিরল পাজেরা তাজা। হাসি খুশি চেহারার শক্ত-সমর্থ পুরুষ, কথা বলে কম। রানাকে দেখে মাথা ঝাঁকাল সে, জিজ্ঞেস করল, 'সব ঠিক?'

মাল্টায় সবার মুখে এই শব্দ দুটো শুনতে পাওয়া যাবে। এ শুধু কুশল জানতে চাওয়া নয়—দরদভরা সহানুভূতি প্রকাশের সাথে সাথে সাহায্য করার প্রস্তাবও। বিদায়, শুভেচ্ছা আর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেও শব্দ দুটো ব্যবহার করা হয়। 'সব ঠিক,' জবাব দিল রানা। ওর সামনে একটা চেয়ারে বসে অনোরিয়ার হাত থেকে এক কাপ কফি নিল তাজা। হাতে বানানো সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে টান দিল।

সবাই ওকে এমনভাবে অভ্যর্থনা জানাল যেন আট বছর নয়, শুধু এক রাত বাইরে কাটিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে।

সামনে লম্বা পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে নিচু পাহাড়, একটানা দৌড়ে এসে দম নেয়ার জন্যে মাথায় উঠে থামল রানা। এখানে দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত উপসাগর দেখতে পাওয়া যায়। ঘামে ভিজে ওর ট্র্যাক স্যুটের রঙ গাঢ় হয়ে গেছে। সূর্য এখনও দিগন্তরেখার কাছাকাছি, উপসাগরে পাহাড়ের ছায়া। নিচু পাঁচিলের ওপর বসে হাঁপাতে লাগল রানা। সারা শরীরে ব্যথা, প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট। বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না, জানে ও। একটা শিরায় টান পড়লে কয়েক দিন বা কয়েক হপ্তা পিছিয়ে যাবে ওর প্রোগ্রাম।

ভোর হবার অনেক আগে ঘুম থেকে উঠেছে রানা। টেরেসে বেরিয়ে এসে এক ঘন্টা ব্যায়াম করেছে। প্রথম দিকে শুধু হালকা ব্যায়ামগুলো, ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করবে আরও পরে। এরপর ঠাণ্ডা পানিতে শাওয়ার সেরে নিচে নেমে আসে। এত সকালে কিচেনে অনোরিয়াকে দেখে অবাক হয় ও।

ওর প্রশ্ন শুনে মৃদু, ম্লান হেসে প্রৌঢ়া বলল, 'পাপ করার বেলায় সবাই আছে, কিন্তু প্রার্থনার বেলায় কেউ নেই, তাই আমাকেই যেতে হয় চার্চে।'

মিটি মিটি হেসে রানা বলল, 'তাহলে আমার জন্যেও একটু প্রার্থনা কর, মা।'

'সে কি তোমাকে বলে দিতে হবে, বাবা!' রানাকে মগভর্তি কালো কফি বানিয়ে দিল অনোরিয়া। কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, এই সময় কাজে যাবার কাপড়

পরে কিচেনে ঢুকল তাজা আর নিডো।

রানা গোজোয় পৌঁছুবার আগে শ্বশুরের সঙ্গে বারকয়েক টেলিফোনে কথা বলছে রেমারিক। রানার শারীরিক অবস্থা এবং মিলানে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা সম্পর্কে সব কথাই তাকে জানিয়েছে সে। তবে রানার ভবিষ্যৎ প্ল্যান সম্পর্কে কিছু বলেনি।

জেসমিনকে বিয়ে করার পর থেকে প্রতি মাসে শ্বশুরবাড়িতে কিছু কিছু টাকা পাঠায় রেমারিক, জেসমিন মারা যাবার পরও টাকা পাঠানো বন্ধ করেনি। প্রথম দিকে বাড়ির সবাই প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কারণ তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ নয়। কিন্তু রেমারিককে থামানো যায়নি, এখানে টাকা পাঠালে তার নাকি ইনকাম ট্যাক্সের বোঝা কমে। সেই টাকা দিয়েই বাড়ির সঙ্গে একটা দোতলা তৈরি করা হয়েছে, রেমারিক বেড়াতে এলে আরাম করে নিরিবিলিতে থাকতে পারবে। সেই খুদে দোতলার সবটুকু ছেড়ে দেয়া হয়েছে রানাকে।

কাল রাতে ডিনারে বসে কথা হয়েছে, রানার দৈনন্দিন প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানে তাজা। রানাকে সে বলল, 'দৌড় আর সাঁতার শেষ করে পাহাড়ে চলে এস…'

'রাখ তোমার পাহাড়,' স্বামীকে বাধা দিয়ে বলল অনোরিয়া। রানার দিকে ফিরল সে, বলল, 'সাঁতার শেষ করে সোজা বাড়ি ফিরে আসবে তুমি। নাস্তা করে বিশ্রাম নেবে, তারপর যেখানে খুশি যেয়ো।'

নতুন একটা পাহাড় কিনেছে ওরা, পাথর কেটে মাটি বের করা হয়েছে। প্রথমে পাহাড়ের দু'পাশে পাথরের পাঁচিল দেয়া হবে, তারপর মাটি কেটে তৈরি করা হবে বিশাল সব ধাপ, সেই ধাপে চাষাবাদ হবে।

ওরা তিনজন একসাথে বাইরে বেরুল। সাগরের দিকে একটা পাহাড় দেখিয়ে তাজা বলল, 'সাঁতার কাটতে হলে ওদিকে যেয়ো। ছোট্ট একটা ইনলেট আছে ওখানে, পাহাড় থেকে সরাসরি নামা যায়। পানি খুব গভীর, আর একেবারে নির্জন—বোটে করে, আর নাহয় আমার জমির ওপর দিয়ে যাওয়া যায়।'

দম ফিরে পেতেই প্রচণ্ড খিদে অনুভব করল রানা। কিন্তু বাড়ি ফেরার আগে সাঁতার কাটতে হবে। পাঁচিল থেকে নেমে ঘোড়ার মত দুলকি চালে ছুটল ও।

তিন দিক ঘেরা সাগরের খুদে একটা অংশ, প্রাণের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। গভীর তলদেশ, কাঁচের মত স্বচ্ছ পানি। পাহাড়ের গা থেকে সমতল একটা কার্নিস সাগরের ওপর ঝুলে আছে। কাপড় খুলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। একশো মিটারের মত সাঁতরে উত্তর কোমিনো চ্যানেলে চলে এল ও, খুদে দ্বীপটা এত কাছে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আসলে কিন্তু দ্বীপের সবচেয়ে কাছের প্রান্তটা এক মাইলের কম দূরে নয়। ক'দিন অভ্যেস হোক, তারপর ওখানে যাবে রানা। তারও ক'দিন পর বিরতি না নিয়ে ফিরে আসবে। আগের শক্তি ফিরে এলে একটানা চার-পাঁচ বার আসা-যাওয়া করতে পারবে ও।

ব্রেকফাস্টের বিশাল আয়োজন করেছে অনোরিয়া। মুরগির সুপ, সেদ্ধ ডিম,

ভুনা গরুর মাংস, তন্দুরে সেঁকা গরম রুটি আর স্বচ্ছ মধু। প্লেটের ওপর রুটির পাহাড়, অনোরিয়ার কঠোর নির্দেশে সবগুলো গিলতে হল। সবশেষে এক মগ ধূমায়িত কফি।

রানার খাওয়া দেখছে, আর আট বছর আগের কথা ভাবছে অনোরিয়া। তখনও এই রকম চুপচাপ থাকত রানা। টেলিফোনে রেমারিক যদি ওর ছদ্মবেশের কথা না জানাত, রানাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠত ওরা। মাত্র আট বছরে তরতাজা, প্রাণচঞ্চল একটা যুবক আধবুড়ো হতে পারে না। শুধু যে ছদ্মবেশ নিয়ে আছে তাই নয়, মৃত্যুর দরজা থেকে একটুর জন্যে ফিরে এসেছে রানা, স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে।

মেয়ে মারা গেলেও, জামাই রেমারিককে এখনও ছেলের মত ভালবাসে অনোরিয়া। বিয়ের আগের দিন ওদের সাথে কথা বলতে এসেছিল রেমারিক। নিজের অতীত সম্পর্কে বিস্তারিত বলে সে, ভবিষ্যতে ভাল-মন্দ কি ঘটতে পারে না পারে সে-সম্পর্কে একটা আভাসও দেয়। সবশেষে রেমারিক ওদের বলে, তার যদি কোন বিপদ ঘটে, জেসমিনের যদি কোন সাহায্য দরকার হয়, তারা যেন রানাকে খবর দেয়। রানার কয়েকটা ঠিকানাও ওদেরকে দিয়েছিল রেমারিক।

জেসমিন মারা যেতে অনোরিয়াই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল ঢাকায়। রেমারিকের বন্ধু, কাজেই রানাকেও নিজের ছেলের মত দেখে অনোরিয়া। ছেলেটা যাতে তার স্বাস্থ্য ফিরে পায় তার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করবে সে। ব্যায়াম আর কঠিন পরিশ্রম, এ-দুটোই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে, তার কাজ প্রচুর তাজা খাবার যোগান দেয়া।

নাস্তার পর পাহাড়ে চলে এল রানা। গায়ের শার্ট খুলে তাজার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করল। শুকনো, আলগা পাঁচিল তৈরি করতে অভিজ্ঞতা লাগে। মাপমত সঠিক পাথর বাছাটাই আসল, পাথরের ওপর ঠিকমত পাথর বসানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রৌঢ় তাজ অবাক হয়ে দেখল, আনাড়ি ভাবটা দ্রুত কাটিয়ে উঠছে রানা। এক ঘন্টাও পেরোয়নি, অথচ প্রথমবারেই সঠিক পাথরটা বেছে নিতে পারছে ও।

বার বার ঝুঁকে কোমরে ব্যথা ধরে গেল রানার, পাথরের ঘষা খেয়ে ছড়ে গেল তালুর চামড়া। বেলা দুটোর দিকে রানার অবস্থা দেখে মায়া হল তাজার, থামতে বলল সে। খুদে ইনলেটে এসে সাগরের লোনা পানিতে হাত ধুল রানা।

ভেজিটেবল সুপ দিয়ে শুরু হল দুপুরের খাওয়া। মাছ দিয়ে রান্না ভাত, তন্দুরে সেঁকা রুটি, মুরগি আর গরুর মাংস, সালাদ, সবশেষে ফল। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে দিনের সবচেয়ে গরম সময়টা সবাই ছোট্ট একটা করে ঘুম দিয়ে নিল। পাথরের চওড়া দেয়াল, উঁচু সিলিং, ঘরের ভেতরটা তাই ঠাণ্ডা। শরীরে ব্যথা থাকলেও ভাল ঘুম হল রানার। চারটের দিকে জাগল ও, শরীর আড়ষ্ট, হাতের ক্ষতগুলো ব্যথা করছে। শুয়ে-বসে থাকতে ভাল লাগবে এখন, ঝোঁকও চাপল,

কিন্তু নিষ্পাপ এক কিশোরীর মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতেই বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল, পাহাড়ে এসে আবার দাঁড়াল তাজার পাশে।

এক ঘন্টা কাজ করার পর থামতে হল ওদের, বালতি করে বরফ আর বিয়ার নিয়ে এসেছে অনোরিয়া। রানার হাতের অবস্থা দেখে শিউরে উঠল প্রৌঢ়া, রাগের সাথে ফিরল স্বামীর দিকে, 'তোমার আক্কেল বলি, এই হাত দিয়ে কেউ ওকে কাজ করতে দেয়?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাজা বলল, 'এবার নাহয় তুমিই বারণ করে দেখ!'

রানার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল অনোরিয়া।

'এ কিছু না,' বলল রানা। 'সন্ধের দিকে সাঁতার কাটব—লোনা পানি ওষুধের কাজ করবে।'

পরের তিন দিন খুব ভুগল রানা, রোজ রাতে বিছানায় এল যেন আহত একটা পশু।

তবে ছক বাঁধা একটা রুটিন দাঁড়িয়ে গেল। ভোর অন্ধকারে ঘুম থেকে উঠে ব্যায়াম, তারপর দৌড়, দৌড় শেষে সাঁতার, প্রতিবার আগের দিনের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে, এরপর পাহাড়ে গিয়ে মাটি কেটে ধাপ তৈরি করার কঠিন কাজ, সন্ধ্যার দিকে আরও একবার সাঁতার, তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে ঘুম। শোবার আগেও কিছুক্ষণ যোগ ব্যায়াম করে ও।

এই রুটিন মেনে চলতে প্রথম দিকে খুব কষ্ট হল, আড়ষ্ট শরীর নিয়ে বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করত না। কিন্তু এই আড়ষ্ট ভাব আর ব্যথা সারাক্ষণ ওকে লুবনার কথা মনে করিয়ে দিল, মনে করিয়ে দিল ওকে নিয়ে জানোয়ারগুলো কি করেছে। প্রচণ্ড ঘৃণা আর প্রতিশোধ নেয়ার উগ্র বাসনা ভুলিয়ে দিল সমস্ত ব্যথা আর যন্ত্রণা।

রানার এই ঘৃণা হঠাৎ একদিন চাক্ষুষ করে ঘাবড়ে গেল তাজা। ডিনারের পর বাইরে খোলা উঠনে বসেছিল ওরা তিনজন, ব্র্যাণ্ডি মেশানো কফি খাচ্ছিল। কালো সাগরের ওপর কোমিনোর ঢাউস আকৃতি, আরও দূরে আলো ঝলমলে মাল্টা দেখা যাচ্ছিল। মাল্টার এই আলো নেপলসে আসার কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। ভাবল, অনেকগুলো মাস পেরিয়ে গেছে। লুবনার কথা মনে পড়ল।

আকাশে অনেক তারা জ্বলছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটা দৃষ্টি কেড়ে নিল রানার। কান পাতলে কোকিলের ডাকও হয়ত শুনতে পাবে। বাগান থেকে ভেসে এল মিষ্টি ফুলের গন্ধ। ফুরফুরে বাতাস এলোমেলো করে দিল ওর চুল। কিন্তু তবু অন্তরে সেই গানটা বেজে উঠল না।

ভিটো আভান্তির বাড়ি থেকে রানার ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র নিয়ে এসেছিল রেমারিক, সেগুলোর মধ্যে লুবনার প্রেজেন্ট করা গানের ক্যাসেটটাও ছিল। নেপলস থেকে একটা রেকর্ড-প্লেয়ার কিনেছে রানা। কিন্তু লুবনার ক্যাসেটটা ও

আর বাজায় না।

উজ্জ্বল তারাটার দিকে তাকিয়ে হাসপাতালের কথা ভাবছে রানা। রেমারিক এসে ওকে বলল, লুবনা নেই।

কি যেন বলার জন্যে রানার দিকে ফিরল তাজা, রানার চেহারা দেখে গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেল তার, মুখ থেকে আওয়াজ বের হল না। দেখল, মানুষটার সমগ্র অস্তিত্ব থেকে উথলে উঠছে ঘৃণা, ঠাণ্ডা সাগর থেকে কুয়াশা ওঠার মত।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রানা, ওদেরকে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

বাবার দিকে ফিরল নিডো। তাজার হাসিখুশি চেহারায় গাম্ভীর্য আর উদ্বেগ। নিডো বলল, 'মাসুদ ভাই মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যায়…।'

মাথা ঝাঁকাল তাজা। 'ওর ভেতর একটা আগুন জ্বলছে,' বলল সে। 'ওই আগুনে কেউ না কেউ পুড়ে মরবে।'

খুক্ করে কেশে একটু হাসল নিডো, পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করল। উঠে দাঁড়াল সে, হাতঘড়ি দেখল, তারপর বলল, 'আমার ভেতরেও একটা আগুন জ্বলছে, তবে এ আগুন সে আগুন নয়। আমি বারবেরালায় যাচ্ছি। শুক্রবারের রাত, টুরিস্ট মেয়েগুলো আমাকে না পেলে হোটেল থেকে বেরুতেই চাইবে না।'

মৃদু হেসে ছেলেকে উৎসাহ দিল তাজা। কিন্তু সাবধান করে দিয়ে বলল, 'বেশি রাত কোরো না, খেতে কাল অনেক কাজ। আর, খবরদার, বেশি গিলবে না—তোমার মা তাহলে আস্ত রাখবে না।'

মাকে গোপন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল নিডো, বেরুবার সময় সামনে পড়ে গেলে বিদেশী মেয়েদের চরিত্র সম্পর্কে লেকচার শুনতে হবে। সুজুকিতে চেপে স্টার্ট দিল সে।

শনিবার বাড়ি এল ভায়োলা।

কিচেন টেবিলে বসে আছে মেয়েটা, ওরা তিনজন লাঞ্চের জন্যে ভেতরে ঢুকল। মেয়েকে দেখিয়ে অনোরিয়া জিজ্ঞেস করল, 'মাসুদ, ভায়োলাকে চিনতে পার?'

'একটু একটু,' জবাব দিল রানা। ভায়োলাকে বলল, 'তখন তুমি বেণী বাঁধতে।'

আড়ষ্ট একটু হাসি দেখা গেল ভায়োলার মুখে। বড় বোন জেসমিনের বিয়ের সময় তার বয়স ছিল চোদ্দ, আট বছর পর রানাকে দেখে চিনতে পারল না সে। মার মুখ থেকে ওর সব কথা শুনেছে, জানে চেহারা আর বয়স দুটোই নকল।

ভায়োলাই ওদেরকে পরিবেশন করল। কাল অনেক রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল নিডো, সকালে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙানো হয়েছে। 'কোন মেয়ের খপ্পরে পড়েছিস বুঝি?' ঠাট্টা করে জানতে চাইল ভায়োলা। কিন্তু মা

নিডোকে বকাঝকা শুরু করতে ভাইয়ের পক্ষ নিল সে।

রানাকে ভায়োলা জিজ্ঞেস করল, 'রেমারিক কেমন আছে? এ-বছর কবে আসবে কিছু বলেছে?' তার কণ্ঠস্বর সুরেলা, মিষ্টি।

'ভাল আছে। না, মাস তিন-চারের আগে আসতে পারবে বলে মনে হয় না।'

একহারা, লম্বা, সুন্দরীই বলা যায় ভায়োলাকে। রানা ভাবল, রেমারিকের সঙ্গে ভায়োলার কোন ব্যাপার আছে কিনা। বোধ হয় নেই, থাকলে রেমারিক তাকে বলত। মেয়েটা সম্পর্কে অনোরিয়ার কাছে অনেক কথা শুনেছে রানা, সব জেনে দুঃখবোধ করেছে। তিন বছর আগে সুদর্শন এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয় ভায়োলার, বিয়ের দু'মাস পরই ভায়োলা জানতে পারে তার স্বামীর একাধিক ভাগীদার আছে। তারা যদি মেয়ে হত, তাদের খপ্পর থেকে স্বামীকে বের করে আনার চেষ্টা করত সে, কিন্তু তাগড়া চেহারার কয়েকজন পুরুষের সাথে কিভাবে সে প্রতিযোগিতা করে!

বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন কবে মঞ্জুর হবে কেউ বলতে পারে না। ভ্যাটিকানের ধর্মযাজকরা বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘোর বিরোধী, কারণ বিয়ে অত্যন্ত পবিত্র এক বন্ধন, ছিঁড়লে পাপ হয়। দশ-পনেরো বছর পার হয়ে গেছে অথচ বিচ্ছেদের আবেদন বিবেচনা করা হয়নি, এমন ঘটনা ভুরি ভুরি।

বাড়ির সবাই জানে, ভায়োলার জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর হলেও, গোজো এমন একটা সমাজ, কোন মা তার ছেলের জন্যে ভায়োলার মত একটা মেয়েকে বউ হিসেবে মেনে নেবে না। তাছাড়া, দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কোন ইচ্ছে ভায়োলারও নেই। মাল্টার একটা হোটেলে রিসেপশনিস্টের চাকরি করে সে, বছরে দু'বার লম্বা ছুটি নিয়ে বাড়ি আসে। বাড়ির সবাই তার দুঃখে দুঃখী, তার কোন কাজে কেউ কখনও বাধা দেয় না।

শেষ বিকেলের দিকে সুইমস্যুট নিয়ে খুদে ইনলেটের পথ ধরল ভায়োলা। সমতল পাথরে কাপড় দেখল সে, সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল সাঁতার কাটছে রানা।

চারশো মিটারের মত সাঁতার দিয়ে ফিরে এল রানা।

'আমি ভাবলাম তুমি বোধহয় কোমিনা পর্যন্ত যাবে,' রানাকে পানি থেকে উঠতে দেখে বলল ভায়োলা।

'আগামী হপ্তায়।' ভায়োলার পাশে বসে দম নিচ্ছে রানা।

রানার উদোম শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে ভায়োলা, চোখ ফেরাতে পারছে না। রানা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে লজ্জা পেল সে।

'নামবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। তুমি পেছন ফের, কাপড় বদলাই।'

এক মিনিট পর ওয়ান-পিস সুইমস্যুট পরে পানিতে লাফিয়ে পড়ল ভায়োলা।

এক ডুবে অনেকটা দূরে চলে গেল সে, মাথা তুলে রানার দিকে তাকাল, হাসছে। একটা হাত তুলে ডাকল সে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে ডাইভ দিল রানা।

ইনলেট থেকে চ্যানেলে বেরিয়ে এল ওরা। ভায়োলা ভাবল, কোমিনো পর্যন্ত যাওয়া রানার উচিত হবে কিনা। চ্যানেলের মাঝখানে প্রচণ্ড স্রোত, গোজোর দক্ষ সাঁতারুরাও অনেকে কোমিনো পর্যন্ত যেতে সাহস পায় না। তীরের কাছাকাছি রয়েছে ওরা, অথচ স্রোতের টান বেশ ভালভাবেই অনুভব করছে। রানাকে সাবধান করে দেয়া উচিত ভেবে মুখ খুলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। একটা মেয়ের উপদেশ ওর হয়ত পছন্দ হবে না।

পানি থেকে উঠে পাথরের ওপর পাশাপাশি শুয়ে থাকল ওরা, শেষ বিকেলের নিস্তেজ রোদে চকচক করছে ভেজা গা। রেমারিক আর ফুরেলার কথা জানতে চাইল ভায়োলা, কিডন্যাপ আর গোলাগুলি প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না। ইটালির খবরের কাগজে ঘটনাটা সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু আরও অনেক কিছু জানতে চায় ভায়োলা—তবে এখুনি নয়।

তোবড়ানো ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে শেষ ফেরিতে চড়ল রানা। সেন্ট এলমো থেকে গোজোয় ফিরছে ও। পিওতর মেনিনোর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে ওর।

দু'দিন আগে এক সন্ধ্যায় কাগজে একটা খবর পড়ছিল তাজা, ধারণাটা তখনই মাথায় আসে রানার। পশ্চিম জার্মানীতে একটা প্লেন হাইজ্যাকের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু স্পেশাল অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড হাইজ্যাকারদের কোণঠাসা করে ফেলে। তাজা বলল, মাল্টায়ও এ-ধরনের একটা স্কোয়াড আছে। তার ভাইপো, পিওতর মেনিনো, পুলিসের একজন ইন্সপেক্টর, ওই স্কোয়াডের কমাণ্ডার। কথা প্রসঙ্গে রানা বলল, সুযোগ পেলে পুরানো ট্রেনিংটা ঝালাই করে নিলে ভাল হত। পরদিনই ভাইপোকে টেলিফোন করে তাজা, রানাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে রাজি হয় মেনিনো।

ব্রিটিশ আর্মির ফেলে যাওয়া অস্ত্রপাতি ব্যবহার করছে ওরা। স্টার্লিং সাবমেশিন গান আর বিভিন্ন ধরনের হ্যাণ্ডগান। রানার সাথে মেনিনোর কথা হল পুরানো দুর্গে বসে, গ্র্যাণ্ড হারবারের প্রবেশ পথটা পাহারা দিচ্ছে এই দুর্গ। দুর্গের ভেতরই চমৎকার একটা রেঞ্জ আছে ওদের, অনেক দিন পর অস্ত্রশস্ত্রের ছোঁয়া উপভোগ করেছে রানা। ফায়ারিং রেঞ্জে ঘন্টাখানেক ছিল ও; বুঝেছে, লক্ষ্যভেদে আগের মত দক্ষতা ফিরে পেতে কয়েক হপ্তা সময় লাগবে। এরপর স্কোয়াডের পনেরো জনের সঙ্গে জিমনেশিয়ামে যায় ও, ওখানে আনআর্মড কমব্যাট প্র্যাকটিস করে। স্কোয়াডটা মাত্র গঠন করা হয়েছে, এখনও সবাই অনভিজ্ঞ, কিন্তু শেখার আগ্রহ কারও চেয়ে কারও কম নয়। পিওতর মেনিনো লম্বা চওড়া, হাসি-খুশি পলিস অফিসার, রানাকে আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। কিন্তু খানিক

পরই ভুরু কুঁচকে ওঠে তার, চিন্তিত দেখায় তাকে। রানার অস্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার ভঙ্গি দেখে বুঝে নিয়েছে সে, এ লোক সাধারণ কেউ নয়।

বিদায় নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা, অমনি চাচাকে ফোন করল মেনিনো। 'চাচা, তুমি জান কি ধরনের লোককে মেহমান হিসেবে রেখেছ বাড়িতে?'

'কেন, বাবা?' উদ্বিগ্ন হল তাজা। 'রেমারিকের বন্ধু ও—কোন অসুবিধে করেছে নাকি?'

'না না, তা নয়। কিন্তু চাচা, হাসান প্রফেশনাল—একজন সত্যিকার এক্সপার্ট। মাল্টায় ও ঠিক কি করছে বল তো?'

লুবনার কিডন্যাপ আর রানার আহত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করল তাজা, বলল, 'আমাদের এখানে এসেছে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে।'

মেনিনো হাসল, বলল, 'যাক, তুমি তাহলে সামরিক অভ্যুত্থানের কোন প্ল্যান করছ না!'

তাজাও হাসল। 'মনে হচ্ছে ক্যু করার জন্যে একজন লোক আমি পেয়েছি। ও কি সত্যি অতটা ভাল?'

এক মুহূর্ত পর জবাব দিল মেনিনো, 'ইংল্যাণ্ড আর ইটালিতে ট্রেনিং নিয়েছি আমি, ওর মত দক্ষ লোক আর দেখিনি। এমনভাবে আর্মস নাড়াচাড়া করছিল যেন মায়ের পেট থেকে প্র্যাকটিস করে এসেছে।' আরও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর সে প্রস্তাব দিল, 'চাচা, আমাকে তুমি ডিনারের দাওয়াত দাও। হাসান সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি। আমাদের এখানে ইনস্ট্রাকটরের অভাব রয়েছে, কথা বলে দেখব ওকে কোন কাজে লাগানো যায় কিনা। অবশ্যই আনঅফিশিয়ালি।'

ভাইপোকে শনিবারে ডিনারের দাওয়াত দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল তাজা।

ফেরি থেকে সবার শেষে নামল রানা, ল্যাণ্ড রোভারে ওর পাশের সিটে উঠে বসল মিলানো। রুচিতা'স-এর দরজায় পৌঁছেই মিলানো ঘোষণা করল, 'আমি হাজির!'

বড়সড় বার লোকজনে প্রায় ভরে গেছে। প্রকাণ্ডদেহী বিদ্রোহীকেও দেখল রানা, চেয়ারটা সম্পূর্ণ ঢেকে দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে। চোখাচোখি হতে হাসল গরিলা। ওর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে রানার। বিশাল আকৃতি, এমনিতে গোবেচারা আর সরল, কিন্তু কোথাও কাউকে অন্যায় করতে দেখলে স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান থাকে না, তীব্র প্রতিবাদ করে বসে। তার প্রতিবাদ জানাবার ধরনটা অদ্ভুত। সম্ভব-অসম্ভব নানা রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক লোক ভোটে জিতল একবার, কিন্তু ছ'মাস পেরিয়ে যাবার পরও সে তার একটা প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করল না। ইতিমধ্যে বার দুয়েক তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে বিদ্রোহী, কোন কাজ হয়নি। একদিন রাজনীতিকের অফিসে গিয়ে উঠল সে, কাজ শুরু করল সামনের

ঘরটা ধরে। এক এক করে প্রতিটি টেবিল, চেয়ার মেঝেতে আছাড় দিয়ে ভাঙল সে। বাধা দিতে এসে আহত হল ছয়জন কর্মচারী। খবর পেয়ে পিছনের জানালা গলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল রাজনীতিক। সেদিন তার অফিসের প্রতিটি ফার্নিচার গুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছিল সে। পরদিনই তাকে গ্রেফতার করে পুলিস। ভাগ্য ভাল বলতে হবে মাননীয় বিচারক রাজনীতিকদের পছন্দ করতেন না, মাত্র তিন মাসের জেল খেটে রেহাই পায় বিদ্রোহী। এই রকম ঘটনা তার জীবনে আরও অনেক আছে।

গুঁফোর পালা চলছিল, সবাইকে বিয়ার খাওয়াচ্ছিল সে। রানা আর মিলানোর সামনেও বিয়ার ভর্তি দুটো মগ রাখল। কামরায় এক কোণ থেকে রানার উদ্দেশে হাত নাড়ল নিডো। ভায়োলাকেও দেখল রানা, আলফানসোর বউয়ের সঙ্গে একটা টেবিলে বসে আছে। কাছাকাছি হল না ওরা, দূর থেকে নিঃশব্দে হাসল দু'জনেই।

প্রায় রোজই ওরা দু'জন একসঙ্গে সাঁতার কাটে। ব্যক্তিগত কোন প্রসঙ্গ তুলে রানাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে না ভায়োলা, নিজের দুঃখের কথা বলে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টাও তার মধ্যে নেই। রানাকে সঙ্গ দিতে পেরেই খুশি সে। তার যেন ধারণা, ওর সঙ্গ রানার দরকার আছে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে রানা, ওর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে মেয়েটা। কখন কি দরকার হয় রানার। অনোরিয়ারও এতে সমর্থন আছে। রানার কি লাগবে না লাগবে জানার জন্যে মেয়েকেই পাঠায় সে।

টাগলিয়া রানার সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমি কিন্তু আগেই বলে রাখছি, বারোটার আগে কেউ আজ ফিরতে পারবে না।' ওর মুখেই রানা শুনল, সর্বশেষ মামলায় রায় দেয়া হয়েছে বিদ্রোহী নিরপরাধ। রাত দশটার পর বিদ্রোহীর তরফ থেকে সবাইকে বিয়ার খাওয়ানো শুরু হবে।

কাউন্টারে টাকা রেখে অপেক্ষা করছে রানা। ইতিমধ্যে অফার দেয়া হয়েছে সাকোকে, কিন্তু বরাবরের মত প্রত্যাখ্যান করেছে সে। মিনিট পনেরো পর ফিরে এসে কাউন্টার থেকে গুনে গুনে দশ সেন্ট তুলল সাকো, সহাস্যে বলল, 'ক্ষতি কি!'

ডিনারের পর বাইরের উঠনে বসে আছে রানা আর পিওতর মেনিনো। ওদেরকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে নিডোকে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেছে তাজা। ভায়োলা ওদেরকে কনিয়্যাক মেশানো কফি দিয়ে কিচেনে ফিরে গেল। কালো রঙের ঢাউস একটা পাইপ ধরাল মেনিনো, চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'আপনি জানেন দ্বীপগুলোর সিকিউরিটি আমার দায়িত্ব?'

মৃদু হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'আসলে আপনি জানতে চাইছেন আমি একটা সিকিউরিটি রিস্ক কিনা, তাই তো?'

মাথা নাড়ল মেনিনো। 'না। আপনি এখানে কি করছেন চাচা আমাকে বলেছে। তাছাড়া, আপনার সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য ইতিমধ্যে যোগাড় করেছি

আমি।' আড়ষ্ট একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'কাল সকালে প্যারিসে একটা টেলেক্স পাঠিয়েছিলাম, আজ সকালে তার উত্তরও পেয়ে গেছি।'

'প্যারিসে?'

'হ্যাঁ—ইন্টারপোলে। সমস্ত মার্সেনারি সম্পর্কে তথ্য রাখে ওরা। আমার ইনকোয়্যারি ছিল সি গ্রেডের, তাই খরচ কম পড়েছে। এ গ্রেডের ইনকোয়ারি হলে আপনার সম্পর্কে ওদের জানা সমস্ত তথ্য পেয়ে যেতাম আমি, কিন্তু অত সব জানার আমার দরকার ছিল না।'

কৌতুক বোধ করল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'তা কি জানতে পারলেন?'

'জেনেছি আপনি একজন দুর্ধর্ষ মার্সেনারি, একজন মেজর, ইন্টারপোল জানে না বর্তমানে আপনি কোথায় আছেন।'

'প্রতিক্রিয়া?'

'না, আপনার অনুরোধ আমরা প্রত্যাখ্যান করছি না,' বলল মেনিনো। 'স্কোয়াডের ফ্যাসিলিটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। অবশ্যই আন-অফিশিয়ালি। কেন আপনি লুকিয়ে আছেন, জানতে চাইব না।'

'আমি কৃতজ্ঞ।'

মুচকি একটু হাসি দেখা গেল মেনিনোর ঠোঁটে। 'কিন্তু একটা শর্ত আছে—তেমন কঠিন কিছু না। আপনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোক, আমরা আপনার ওই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাই।'

'কিভাবে?'

পাইপ নিভে গেছে, সেটা আবার ধরিয়ে কথা বলতে শুরু করল মেনিনো।

হাইজ্যাকার আর টেরোরিস্টদের মোকাবেলা করার জন্যে গঠন করা হয়েছে এই স্কোয়াড। আজকাল প্রায় সব দেশেই এ-ধরনের একটা করে স্কোয়াড আছে। কিন্তু ওদের এই স্কোয়াডে যারা রয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা বলতে গেলে একেবারেই নেই। আর্মড ফোর্সেস অব মাল্টায় এমন অফিসারের সংখ্যা খুব কম যারা কমাণ্ডোদের ট্রেনিং দিতে পারে। যা-ও দু'একজন আছে, তারা আরও জরুরি দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। ফলে ছক বাঁধা নিয়ম ধরে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে, প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা ছাড়া যার কোন দামই নেই। আসল কথা ইনস্ট্রাকটরের অভাব। ইচ্ছে করলে রানা এই অভাব অনায়াসে পূরণ করতে পারে।

'চেষ্টা করে দেখব কতটুকু কি করতে পারি,' রাজি হল রানা। 'অস্ত্রপাতি যা দেখলাম, ওগুলো ছাড়া আর কি কি আছে আপনাদের?'

ট্রেনিঙের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত আলোচনা করল ওরা। রানার ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ করেছে মেনিনোকে, আর ট্রেনিংটা ঝালাই করে নেয়ার সুযোগ পেয়ে রানা খুশি।

*

খুদে ইনলেট থেকে কোমিনোয় এল রানা, কোন বিরতি ছাড়াই তিনবার আসা যাওয়া করল ও। পাহাড়ের ওপর বাড়ি, নিজের শোবার ঘরের জানালা থেকে চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে রানাকে দেখছে ভায়োলা। খুদে বে-তে পৌঁছুল রানা, হোটেল জেটির দিকে সাঁতার কাটছে। নিচ তলায় নেমে এসে নিডোকে ফোন করল ভায়োলা। গত তিন দিন থেকেই রোজ সকালে কোমিনোর হোটেলে নিডোকে পাঠায় সে, প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে পড়ে রানার কোন বিপদ হলে বোট আর জেলেদের নিয়ে নিডো যাতে তাকে সাহায্য করতে যেতে পারে। 'আর কোন কাজ নেই তোর, নিডো, ছুটি,' বলে কানেকশন কেটে দিল ভায়োলা, তারপর ফোন করল তার এক বান্ধবীকে। মেয়েটা হোটেল কোমিনোর রিসেপশনিস্ট।

খালি পা আর ভেজা গা নিয়ে হোটেলের পাশ দিয়ে হেঁটে আসছে রানা, ধাপ ক'টা টপকে রাস্তায় নেমে এল মেয়েটা। তার এক হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ, আরেক হাতে বরফ দেয়া শরবত। রানাকে সে বলল, 'কমপ্লিমেন্টস অভ ভায়োলা।'

হেসে উঠল রানা, সাগরের ওপর দিয়ে ভায়োলাদের বাড়ির দিকে তাকাল। রোদ লেগে ঝিক করে উঠল বিনকিউলারের লেন্স। গ্লাস ধরা হাতটা মাথার ওপর তুলে নাড়ল রানা।

ব্যাগের ভেতর থেকে বেরুল একটা জিনস প্যান্ট, একটা সাদা টি-শার্ট, এক জোড়া রাবার স্যাণ্ডেল—সব নতুন। একটা তোয়ালেও আছে, তাতে পিন দিয়ে আটকানো একটা চিরকুট।

'মনে রাখতে হবে এই দেশটা ক্যাথলিকদের,' পড়ল রানা। 'আধ-ন্যাংটো হয়ে চলাফেরা করা উচিত নয়।'

মেয়েটা হাত তুলে দেখাল। 'ওই ওদিকে একটা আড়াল আছে, ব্লু লেগুনে যাবার পথেই পড়বে।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'চল্লিশ মিনিট পর ছাড়বে ফেরি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে খালি গ্লাসটা ফিরিয়ে দিল রানা।

জিনস আর টি-শার্ট মাপমতই হল। ওর সব কিছু খুঁটিয়ে লক্ষ করে ভায়োলা, ভাবল ও। কিন্তু দিনে দিনে যেভাবে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ছে মেয়েটা, একটা জটিলতা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র কিছু না। রেমারিককে ব্যাপারটা জানাবে? না, তারচেয়ে নিজেরই আরও সাবধান হওয়া উচিত।

সে-রাতে ডিনারে বসেছে ওরা, নেপলস থেকে ফোন এল রেমারিকের। 'আমি আগে কথা বলে নিই,' বলে কিচেন থেকে লাউঞ্জে বেরিয়ে এল ভায়োলা। রেমারিকের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক তার, কিন্তু আজ সে সিরিয়াস। এক এক করে রানা সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন করে গেল ভায়োলা। লোকটার ভবিষ্যৎ কি? এখান থেকে কোথায় যাবে ও—কেন?

কি ঘটতে যাচ্ছে, মুহূর্তে বুঝে নিল রেমারিক। ভায়োলাকে সে বলল, 'তোমার এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ধারণা ব্যাপারটা একতরফা, ঠিক কিনা?'

এ-প্রান্তে চুপ করে থাকল ভায়োলা। খানিক পর রেমারিকই আবার বলল, 'শুধু শুধু সময় নষ্ট, ভায়োলা। ওর হাতে একটা কঠিন কাজ রয়েছে। তাছাড়া, এমনিতেও ওকে তুমি বাঁধতে পারবে না।'

'বাঁধতে যে পারব না তা আমিও কিভাবে যেন বুঝেছি,' বলল ভায়োলা। 'বাঁধতে চাই, তাই বা তোমাকে বলল কে?'

'তাহলে এত কথা জানতে চাওয়া কেন?'

'যদি বলি, বাঁধতে চাই না, কিছু পেতেও চাই না, শুধু কিছু দিতে চাই? আমাকে নির্লজ্জ ভাববে?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রেমারিক, তারপর বলল, 'না। ভাবব তুমি সাক্ষাৎ দেবী। কিন্তু আমি যদি বলি যাকে দিতে চাও তাকে ভুল করে দিতে চাও?'

'মানে?'

'ওকে তুমি চিনতে পারনি, ভাই,' বলল রেমারিক।

'কিন্তু আমার তো কোন প্রত্যাশা নেই!'

'ওরও তো নেই, কাজেই তুমি দিলেই বা ও নেবে কেন?'

'তুমি ওর এমন একটা ছবি দিচ্ছ আমাকে, ও যেন দেবতা,' ব্যঙ্গ করে বলল ভায়োলা। 'যেন কোন মেয়ের পক্ষে ওকে টলানো সম্ভব নয়।'

কথা না বলে সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমারিক।

এরপর রানাকে ডেকে দিল ভায়োলা। রানা আর রেমারিকের মধ্যে আভাসে-ইঙ্গিতে কথা হল। রানা বুঝল, মার্সেলেসে যোগাযোগ করা হয়েছে গগলের সাথে, সাহায্য করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে। অন্যান্য প্রস্তুতি কাজও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে। রানা আভাস দিল, তিন-চার হপ্তার ভেতর রওনা হবে ও। রেমারিককে বলল, ওদিকের কাজ শেষ হলে সে যেন একটা চিঠি লিখে জানায় ওকে।

দুই

লোকটা মোটাসোটা, লম্বা, আঁটসাট ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরে আছে। কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলছে ট্র্যানসিভার আর গ্রেনেড, হাতে স্টার্লিং সাবমেশিনগান। পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দম নিচ্ছে, খোলা উঠনের ওপর দিয়ে ছুটে এসে হাঁপিয়ে গেছে।

দোতলা একটা বাড়ি, ওপর তলায় উঠতে হবে তাকে। করিডর ধরে একটু একটু করে বাঁকের দিকে এগোল সে। জানে, বাঁকের পর আবার লম্বা একটা

করিডর, শেষ মাথায় সিঁড়ি। কোণে এসে দাঁড়াল সে, তারপর নিচু হয়ে লাফ দিল সামনে, স্টার্লিঙের ট্রিগার টেনে ধরেছে আঙুল।

গুলির একনাগাড় আওয়াজে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে লোকটাকে আসতে দেখল রানা, তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিনাটি সবকিছু লক্ষ করছে। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে আবার দেয়ালে হেলান দিল লোকটা। খালি একটা ম্যাগাজিন পড়ল মেঝেতে, ক্লিক করে জায়গামত বসল নতুন আরেকটা। মুখের কাছে ট্র্যানসিভার তুলে বলল সে, 'ওপরে যাচ্ছে।' রানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করল রানা। বাড়ির চারদিক থেকে ব্রাশ ফায়ারের আরও আওয়াজ আসছে, মাঝে মধ্যে গ্রেনেড ফাটছে দু'একটা।

এক এক করে পনেরোজনই বাগানে বেরিয়ে এল ওরা, পরনে এখনও সবার ক্যামোফ্লেজ গিয়ার, কথা বলছে উত্তেজিতভাবে। সবার পিছু পিছু এল পিওতর মেনিনো। নিচু একটা পাঁচিল দেখিয়ে সবাইকে বসতে বলল সে।

পাঁচ মিনিটের এক্সারসাইজ, কিন্তু ডিব্রিফিঙে সময় লাগল এক ঘন্টা। হামলার প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে কথা বলল মেনিনো, কারও সমালোচনা করল, কারও প্রশংসা। পনেরোজনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, পাশে রানা। স্কোয়াডের সবাই উৎসাহে ভরপুর, এটাই তাদের প্রথম ফুল-স্কেল এক্সারসাইজ, বিস্ফোরণের আওয়াজ আর ছুটোছুটি ওদেরকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। কথা শেষ করে রানার দিকে ফিরল মেনিনো। 'এনি কমেন্ট?'

সামনে এগোল রানা, স্কোয়াডের সবাই কিছু শুনতে পাবার আশায় স্থির হয়ে গেল।

'সব মিলিয়ে ভাল,' বলল রানা। খুশি হয়ে হেসে উঠল সবাই।

'কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধে, আট থেকে দশ জন মারা যেতে তোমরা, না হয় আহত হতে।' মুছে গেল মুখের হাসি।

লম্বা মোটাসোটা যুবকের দিকে হাত তুলল রানা। 'মারাঞ্জানো, করিডর ধরে আসার সময় দেয়াল ঘেঁষে ছিলে তুমি—ভুলে গিয়েছিলে ওটা একটা পাথরের দেয়াল। শক্ত দেয়ালে বুলেট ঢোকে না, পিছলে যায়—সেজন্যেই বারবার করিডরের মাঝখানে থাকতে বলা হয়েছে সবাইকে। মাঝখানে থাকলে তোমার মনে হবে শত্রু তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তবু মাঝখানে থাকাই নিরাপদ। বাঁকটা ঘোরার সময় নিচু হয়ে ছিলে তুমি, কিন্তু তারপরই সিধে হয়ে গেলে। আরেকটা কথা, কোমর-সমান উঁচুতে লক্ষ্যস্থির করছিলে তুমি। শত্রু মেঝেতে শুয়ে থাকতে পারে, বাতাসে ওড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই সব সময় নিচের দিকে গুলি করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল মারাঞ্জানো, হতভম্ব দেখাল তাকে। কিন্তু রানা তাকে এখনও রেহাই দেয়নি।

'আমি টেরোরিস্ট হলে, এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতে। ম্যাগাজিন বদলাতে অনেক বেশি সময় নিয়েছ। ওটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়, তোমার সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্ত। সবাইকে বলছি, আরও প্র্যাকটিস কর। বাঁচতে চাইলে এর কোন বিকল্প নেই।'

মাঝারি আকৃতির এক যুবকের দিকে ফিরল রানা। 'ডেগা, জোনাথনের পিছু পিছু দু'নাম্বার কামরায় ঢুকলে তুমি। অথচ উচিত ছিল করিডর থেকে তিন আর চার নাম্বার কামরার দরজা কাভার দেয়া। কি আশা করেছিলে, দু'নাম্বার কামরায় তোমার জন্যে কোন মেয়ে অপেক্ষা করছে?'

হাসির হররা বয়ে গেল। সবাই জানে ডেগা একজন রোমিও, মেয়ে দেখলে পিছু ছাড়ে না।

স্কোয়াডের প্রায় সবার সঙ্গে কথা বলল রানা। সারাক্ষণ চুপচাপ থাকল মেনিনো, দোষ-ক্রটি আবিষ্কার আর সম্ভাবনার নতুন নতুন দিক উন্মোচনে রানার কৃতিত্ব দেখে বিস্মিত। তার লোকেরা সবাই ওর কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে, কারণ একজন অভিজ্ঞ লোক কর্তৃত্বের সাথে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে কোথায় গলদ। ওরা সবাই রানাকে স্টার্লিঙের ম্যাগাজিন পাল্টাতে দেখল—বিদ্যুৎ খেলে গেল হাতে, একটানা গুলিবর্ষণে বিরতি পড়ল কি পড়ল না। রানাকে হ্যাণ্ডগান, এস-এম জি আর কারবাইন চালাতেও দেখল ওরা—দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী, দ্রুত। এর আগে তারা আন-আর্মড কমব্যাট প্র্যাকটিস করতে দেখেছে ওকে, ওর গতি আর রিফ্লেক্স দেখে মুগ্ধ হয়েছে। পনেরো জনের কারও বয়সই পঁচিশের বেশি নয়, সবাই শক্ত-সমর্থ, কিন্তু জানে রানার সঙ্গে কেউ ওরা পারবে না। কাজেই ওর কথা মন দিয়ে শুনল সবাই।

সবশেষে মেনিনো ধন্যবাদ জানাল রানাকে। বলল, 'বিল্ডিংটা আরও এক মাস আমাদের দখলে থাকবে, আমি চাই আরও দুটো এক্সারসাইজে আপনি থাকুন। এয়ার মার্শালের সাথে কথা হয়ে গেছে, দু'ঘন্টার জন্যে ওরা আমাদের একটা বোয়িং ধার দেবে। হাইজ্যাক অ্যাসল্টের মহড়া আপনি পরিচালনা করবেন।'

রাজি হল রানা।

ওর আগের স্বাস্থ্য আর শক্তি ফিরে এসেছে, ফিরে পেয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের দক্ষতাও। নিয়মিত প্র্যাকটিস করে এখন শুধু ওগুলো ধরে রাখা।

একটা রুটিন করে নিয়েছে ভায়োলা।

ভোর অন্ধকার থাকতে ঘুম ভাঙে তার, দোতলায় উঠে রানার দরজায় টোকা দেয়। রানার সাড়া পেলে নিচে নেমে কফি তৈরি করে সে। আবার দোতলায় উঠে

আসে, দেখে, ব্যায়াম শুরু করেছে রানা। বিছানায় বসে রানাকে ঘেমে নেয়ে উঠতে দেখে সে। তারপর চেয়ারে বসে কফি খায় রানা। তখনও সূর্য ওঠে না, গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ। চুপচাপ থাকে ওরা, দু'একটা কথা হয় কি হয় না। কফি শেষ করে দৌড়াতে যায় রানা—এখন একটানা দশ মাইল দৌড়ায় ও। দৌড় শেষ করে খুদে ইনলেটে চলে আসে, এসে দেখে ভায়োলা সেখানে আগেই হাজির হয়েছে, ওর জন্যে কিছু একটা ঠাণ্ডা পানীয় আর তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছে। ডাইভ দিয়ে পানিতে নামে রানা, তিন বার কোমিনো হয়ে ফিরে আসে। তারপর সমতল পাথরে আধ ঘন্টা শুয়ে থাকে, ওর পাশে বসে বা শুয়ে থাকে ভায়োলা।

ব্রেকফাস্ট সেরে পাহাড়ে চলে যায় রানা, তাজা আর নিডোর সঙ্গে মাটি কাটার কাজ করে।

সন্ধের সময় আবার রানার সঙ্গে দেখা হয় ভায়োলার, খুদে ইনলেটে সাঁতার কাটে দু'জন। তখন ওদের মধ্যে কিছু কিছু কথাবার্তা হয়। ব্যক্তিগত কোন প্রসঙ্গ কেউ তোলে না, অতীত আর ভবিষ্যতের কথা দু'জনেই সচেতনভাবে এড়িয়ে যায়। আভাসে জানিয়ে দিয়েছে ভায়োলা, তার কোন প্রত্যাশা নেই, কিন্তু ভাল লাগা আছে, আছে সমর্থন আর সহানুভূতি। সেবা, শুশ্রূষা আর সঙ্গ দিয়ে নিজেই তৃপ্তি পেতে চায় সে; অনুরোধ—নারীসুলভ তার এই আচরণকে যেন অন্য চোখে দেখা না হয়।

মাঝে মধ্যে রানাকে হাসতে দেখে ভায়োলা, অদ্ভুত একটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে তার অন্তর। রেমারিকের কাছে শুনেছে সে, অসহনীয় একটা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আছে এই লোকের মন। রেমারিকের সাথে আরও কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে তার, রানার ভবিষ্যৎ প্ল্যান সম্পর্কে এক-আধটু আভাস পেয়েছে সে।

প্রথম দিকে একটু ধাঁধা লাগলেও, এখন রানা ভায়োলাকে বুঝতে পারে। অসাধারণ বুদ্ধিমতী সে, মনটা ফুলের মত কোমল। কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়, সত্যিকার পৌরুষ আছে এই রকম পুরুষ মানুষের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে সে। হতে পারে স্বামীর সঙ্গে যে-কারণে ঘর করতে পারেনি, এ তারই প্রতিক্রিয়া।

সময় বয়ে চলল, কিন্তু ওদের সম্পর্ক আগের মতই থাকল। ভায়োলা সব সময় রানার কাছাকাছি আছে, কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ হবার কোন চেষ্টা নেই তার। নাগালের মধ্যে রয়েছে ভায়োলা, কিন্তু কখনও হাত বাড়াবার কোন প্রবণতা রানার মধ্যে দেখা যায় না।

রানা একদিন মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আর দিন দশেক পর রওনা হব আমি। মার্সেলেসে যেতে হবে আমাকে। দেখি আজ যদি পারি জাহাজের শিডিউল চেক করে আসব।'

'সে তো আমিই পারি,' বলল ভায়োলা। 'ভ্যালেটায় একটা ট্রাভেল এজেন্সি আছে, আমার এক বান্ধবী কাজ করে। যতদূর মনে পড়ছে হপ্তায় একটা করে

জাহাজ যায়—বন পুয়ারো।'

পরদিন রেমারিকের চিঠি পৌছুল।

স্পষ্ট, খুদে হস্তাক্ষরে চার পৃষ্ঠা চিঠি লিখেছে রেমারিক। প্রথম পৃষ্ঠায় একটা টিকেটের অর্ধেক পিন দিয়ে আটকানো। মার্সেলেস রেলওয়ে স্টেশনের ব্যাগেজরূমের টিকেট ওটা।

সে-রাতে দুটো চিঠি লিখল রানা। প্রথমটা ঢাকায়, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের কাছে। চিঠিতে সি. আই. এ-র মতিগতি কি রকম জানতে চাইল সে। লিখল, শুধু ভাল কোন খবর থাকলে বি. সি. আই রেমারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। আর, একটা ইকুইপমেন্টের জন্যে অনুরোধ করল রানা, মার্সেলেসে, পোস্ট রেসতাঁত-এ পাঠাতে হবে।

দ্বিতীয় চিঠিটা লিখল ফ্রেঞ্চ আর্মির একজন জেনারেলকে। এই ফ্রেঞ্চ জেনারেল কিছু ব্যাপারে রানার প্রতি দুর্বল। লেবাননে পাঠানো জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীতে ছিলেন তিনি, খ্রিস্টান ফ্যালাঞ্জিস্টদের গুলি খেয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। রানা তাঁকে কাঁধে তুলে নেয়, তিন ঘন্টা হেঁটে পৌছে দেয় হাসপাতালে। এই জেনারেলকেও একটা পার্সেলের জন্যে লিখল রানা।

কাল সকালে গোজো ছেড়ে চলে যাবে রানা।

স্কোয়াডের শেষ মহড়াটাও পরিচালনা করল ও। সবারই যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, মেনিনো আর রানার সামনে আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াল ওরা, নিন্দার চেয়ে প্রশংসাই বেশি জুটল কপালে।

রানার এটা শেষ সেশন, তাই ফেয়ারওয়েল ড্রিঙ্কের জন্যে জেদ ধরল ওরা। ফেরি ধরতে পারবে না বলেও এড়াতে পারল না রানা, ওর জন্যে আগেই মাল্টা নেভির একটা প্যেট্রল বোট তৈরি রাখা হয়েছে, গোজোয় পৌছে দেবে ওকে। মেনিনো বলল, 'নিডোকে ফোন করেছিলাম, তাকে না পেয়ে ভায়োলার সাথে কথা হয়েছে আমার। আপনাকে ফেয়ারওয়েল জানাবার জন্যে রুচিতা'স-এ অপেক্ষা করবে সবাই।'

স্কোয়াডের অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত আটটা বেজে গেল। এক সময় রানাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে মেনিনো বলল, 'মাল্টায়, বিশেষ করে গোজোতে আপনার অনেক বন্ধু রয়েছে, মি. হাসান। আপনি যে কাজে যাচ্ছেন, তার ফলাফল যাই হোক, কথাটা কিন্তু ভুলবেন না।'

'ভুলব না,' বলল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

গোজোয় পৌছে রানা দেখল আলফানসো আর মিলানো ওর জন্যে জেটিতে অপেক্ষা করছে, ওকে রুচিতা'স-এ নিয়ে যাবে। বারের কাছাকাছি পৌছে হতবাক হয়ে গেল রানা। বারের ভেতর একশো জনের ওপর লোক ধরে, অথচ জায়গা না

পেয়ে বহু লোক বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ওকে দেখেই 'উমো এসেছে, উমো এসেছে' বলে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল ভিড়ের ভেতর থেকে।

'উমো এসেছে মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমার ডাক নাম,' বলল আলফানসো।

মানেটা জিজ্ঞেস করতে হল না, জানে রানা—ইটালিয়ান ভাষায় 'উমো' মানে পুরুষ। সেই সঙ্গে মনে পড়ল, বহিরাগত কাউকে ডাকনাম দেয়া হয় না।

রানার সাথে যাদের বন্ধুত্ব হয়েছে তারা তো আছেই, গোজোর কৃষক আর জেলেরাও দলবেঁধে ফেয়ারওয়েল জানাতে এসেছে রানাকে। কোথায় যাচ্ছে ও, কেন যাচ্ছে, কি করতে যাচ্ছে, কিছুই কাউকে বলেনি রানা, অথচ সবাই যেন সব কিছু জানে। প্রসঙ্গটা কেউ তুলল না বটে, কিন্তু হাবভাব দেখে বোঝা গেল, রানার প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থনও আছে।

দরজার কাছে একটা টেবিলে বসেছে নিডো, ভায়োলা, অনোরিয়া আর তাজা। বারটেণ্ডার সাকো মগভর্তি বিয়ার ধরিয়ে দিল রানার হাতে, বলল, 'আমার তরফ থেকে।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি?'

'ক্ষতি কি!'

হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। চেয়ার ছেড়ে উঠল ভায়োলা, তার কাঁধে একটা ব্যাগ। রানার হাতে একটা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিল সে। প্যারিস থেকে জেনারেল পাঠিয়েছেন। রানার অনুরোধ রক্ষা করেছেন তিনি।

খানিক পর বিদ্রোহী এসে ওর কাঁধে হাত রাখল, বলল, 'একটু বাইরে আসবে? তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে।'

বার থেকে বেরিয়ে নির্জন একটা জায়গার খোঁজে বেশ কয়েক পা হেঁটে আসতে হল ওদেরকে। 'কি ব্যাপার, কার্লো?' জানতে চাইল রানা।

রানার সামনে ছোটখাট একটা পাহাড়ের মত লাগল বিদ্রোহীকে। 'উমো,' ভারি গলায় বলল সে, 'কখনও যদি তোমার সাহায্য দরকার হয়, আর প্রথমে যদি আমাকে না ডাক, আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করব, হ্যাঁ।'

রানা হাসল। 'তোমাকেই প্রথমে ডাকব, কথা দিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল বিদ্রোহী। 'স্রেফ রুচিতা'স-এ একটা তার পাঠিয়ে দেবে, সাকো জানে কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে।'

আবার বারে ফিরে এল ওরা। এরপর একে একে কিন্তু, ক্ষতি কি, গুঁফো, অক্লান্ত আর হাজির একইভাবে আড়ালে ডেকে নিয়ে একই কথা বলল রানাকে। সবাই ওরা সাহায্য করতে চায় রানাকে।

শেষবার বারে ফিরে এসে পাজেরো তাজাকে একপাশে ডেকে নিল রানা, বলল, 'তুমি আমার কাছে টাকা পাও, তাজা।'

'প্রৌঢ় অবাক হয়ে তাকাল, 'কিসের টাকা?'

'তোমার বাড়িতে এতদিন থাকলাম, খেলাম—এ-সবে টাকা লাগে।'

একগাল হাসল তাজা। 'তা ঠিক। বেশ, হপ্তায় পনেরো পাউণ্ড চার্জ করলাম আমি—এদিকে ফার্ম লেবাররা ওই পনেরো পাউণ্ডই মজুরি পায়, তারমানে কাটাকাটি হয়ে গেল।' কথা শেষ করে বার কাউন্টারের দিকে চলে গেল সে। অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

রাত বারোটার আগেই নিডো আর অনোরিয়াকে নিয়ে চলে গেল তাজা। ল্যাণ্ড রোভারটা ভায়োলা আর রানার জন্যে থাকল। বিদায় সম্বর্ধনা শেষ হতে দুটো বাজল। সবার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিল রানা, আবার একবার করে সবাইকে কথা দিতে হল, সাহায্য দরকার হলে প্রথমে গোজোর বন্ধু-বান্ধবদের স্মরণ করবে ও। সবশেষে ভায়োলা ওর হাত ধরল, টেনে বের করে আনল বার থেকে। পিছন দিক থেকে কে যেন বলল, 'জোড়া কিন্তু দারুণ মানিয়েছে, তাই না?'

পাহাড়ী পথ ধরে ধীরে ধীরে উঠছে ল্যাণ্ড রোভার, ভায়োলাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে রানা। প্রচুর বিয়ার খেয়েছে ও, কিন্তু নেশা হয়নি। ভায়োলা খুব বেশি খায়নি, কিন্তু বারে থাকতেই তার চোখে ঢুলু ঢুলু একটা ভাব লক্ষ করেছে ও। গভীর রাত, চারদিকে নির্জন বন-জঙ্গল, আর নিস্তব্ধ পাহাড়। শুধু কৌতূহল নয়, সেই সাথে পুলক অনুভব করল রানা। ভাবল, কি ব্যাপার, এভাবে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন ভায়োলা?

আর ভায়োলা ভাবছে, দিন তো বেশ ক'টা কাটল, এখনও আমার মন বুঝতে পারেনি ও? অনেক বছর পর একজন পুরুষ আমাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু সে কি সত্যি নির্লোভ দেবতা? নাকি ভালবাসতে জানে না, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে? এত কাছাকাছি থাকি, কিন্তু স্পর্শটুকুও পাই না—একি ওর ভদ্রতা, নাকি অনীহা? কিন্তু আমি তো অসুন্দরী নই! আমাকে পাবার জন্যে কত লোকই তো পাগল। তবে কি অহঙ্কারী ও? আশা করছে, প্রথম নিবেদন আমার তরফ থেকে আসুক?

পাহাড়ের মাথায় উঠে এল ল্যাণ্ড রোভার। ভায়োলার দৃষ্টি এখনও অনুভব করছে রানা। ভাবছে, ও কিছু বলে না কেন? কি করে বুঝব আমি ওকে কাছে টানলে ফোঁস করে উঠে ফণা তুলবে না? ওদের পরিবারের সবাই খুব সরল, আমার সাথে ওর এই ঘনিষ্ঠতা হয়ত সেই সরলতারই প্রকাশ, এর মধ্যে হয়ত আর কিছু নেই। হাত বাড়াতে দেখলে যদি চরিত্রহীন বলে গাল দিয়ে বসে?

পাহাড়ের মাথা থেকে নিচে নেমে এল ল্যাণ্ড রোভার। ডান পাশে সাগর, খানিকটা দূরে, পাথরে ঢেউ আছড়ে পড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। দু'জনই ওরা আড়ষ্ট, ঘামছে একটু একটু, ঢোক গিলছে।

এভাবেই হয়ত বাড়ি ফিরত ওরা, বুকভরা বঞ্চনা আর অতৃপ্তি নিয়ে। কিন্তু

ওদেরকে সাহায্য করল একটা জানোয়ার।

রাস্তা পেরোতে গিয়ে গাড়ির সামনে পড়ে গেল একটা শিয়াল। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করল রানা। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল শিয়ালটা, তারপর ঘুরে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ছুটে পালাল। ঝাঁকি খেয়ে রানার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ভায়োলা। গিয়ার পাল্টে আবার গাড়ি ছাড়তে গিয়ে অনুভব করল ও, ভায়োলার দুই হাত ওকে ছেড়ে না দিয়ে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরছে। হাত দুটো স্টিয়ারিং হুইল থেকে নামিয়ে নিল রানা।

এঞ্জিন বন্ধ হল। খুলে গেল মনের দুয়ার।

রানার কাঁধের ওপর মাথা রাখল ভায়োলা, ভায়োলার পিঠের ওপর ভাঁজ করা কনুই আর কাঁধের ওপর হাত রাখল রানা। কিছুক্ষণ কেউ নড়ল না। তারপর কাঁধে রানার হাতের চাপ অনুভব করল ভায়োলা। রানার কাঁধ থেকে মুখ তুলল সে, ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে আছে। তাকে বুকে টেনে নিল রানা, দুই জোড়া ব্যাকুল ঠোঁট এক হল।

প্রথমে দীর্ঘ একটা চুমো—প্রচণ্ড তৃষ্ণায় এক ফোটা বৃষ্টির মত। তারপর মুষলধারে শুরু হল, উন্মত্ত আবেগে দু'জনেই দিশেহারা।

তারপর এক সময় থামল ওরা। একবার যখন জ্বলেছে, এ আগুন নেভাতেও হবে।

'শুনতে পাচ্ছ?' ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল ভায়োলা।

কিসের কথা বলছে ভায়োলা বুঝতে না পারলেও, আন্দাজ করতে পারল রানা, অস্ফুটে বলল, 'হ্যাঁ। সাগর আমাদের ডাকছে। কিন্তু সাথে যে সুইমস্যুট নেই?'

'দরকার কি।' বলেই রানার বুকে মুখ লুকাল ভায়োলা।

কেউ দেখলে চোখ কপালে উঠত তার, জড়াজড়ি করে গাড়ি থেকে নামার সময় কিম্ভূত আকৃতির দু'মুখো একটা প্রাণী মনে হল ওদেরকে, যেন প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল একটা।

খুদে ইনলেটে চলে এল ওরা। পানির ওপর ঝুলে থাকা পাথরে দাঁড়িয়ে থাকল, দুটো শরীর পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে। ডাইভ দিল না, ঢালু পাথরের ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে দু'জন একসাথে ঝুপ করে পড়ল সাগরে।

পাহাড়ের এক কোণ থেকে সবই দেখল চাঁদ মামা। কানের পাশে ফিস ফিস করে সায় দিল ফুরফুরে বাতাস। গম্ভীর, ভরাট আওয়াজ তুলে একের পর এক ছুটে এল ঢেউগুলো, পিঠে তুলে নিল প্রকৃতির দুই নগ্ন সন্তানকে।

সাগর থেকে উঠে পাথরের ওপর পাশাপাশি শুয়ে থাকল ওরা। দম ফিরে পেতে একটু সময় নিল দু'জনেই। সাগর থেকে উঠে সমতল পাথরের ওপর শুয়ে থাকল ওরা। দম ফিরে পেয়ে প্রথমে কথা বলল ভায়োলা।

'অনেক কথা বলতে চাই, কিন্তু কিভাবে বলতে হয় জানি না।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, এভাবে শুরু করতে পার,' মুচকি হেসে উৎসাহ দিল রানা।

কিন্তু হাসল না ভায়োলা, তবে সিরিয়াস দেখাল। 'একবার ঠকেছি, আর নয়—নিজেকে কারও সাথে বাঁধব না, কাউকে বিয়ে করব না, এভাবে যদি শুরু করি?'

'তাহলে জিজ্ঞেস করব, কাছে এলে কেন, কেন টানলে?'

'ভাল লেগেছে, তাই,' ভায়োলার সরল জবাব। 'যতদিন তোমাকে ভাল লাগবে, আমি তোমার। কাছে গেলে যদি বুকে টেনে নাও, খুশি হব, কৃতজ্ঞবোধ করব। যদি ফিরিয়ে দাও, আহত হব, কিন্তু অভিশাপ দেব না—ভালবাসার দাবি নিয়ে তোমাকে দখল করতে চাইব না।'

'কিন্তু জীবন? ভবিষ্যৎ?'

'সে তো তোমাকে দেখার আগেই একটা ছকে ফেলে সাজিয়ে রেখেছি,' বলল ভায়োলা। 'বিয়ে নয়, বাঁধন নয়, মুক্ত-স্বাধীন জীবন। আর ভবিষ্যৎ? হ্যাঁ, ভবিষ্যৎও ঠিক করা আছে, তবে তোমাকে দেখার পর একটু বদলাবে। আগের প্ল্যানে কারও জন্যে অপেক্ষা ছিল না, এখন থাকবে। জানি, চলে যাবে তুমি। আর হয়ত কোন দিন দেখা হবে না। কিন্তু তবু আমি অপেক্ষা করব। যদি কখনও ফের, নিজেকে নিবেদন করে ধন্য হব। আর যদি না ফের, চলতে থাকবে অপেক্ষার পালা, শেষ হবে সেই যেদিন মৃত্যু এসে ডেকে নিয়ে যাবে আমাকে।'

কাছের ঝোপটা হঠাৎ নড়ে উঠতে দু'জনেই ওরা চমকে উঠে তাকাল। সেই ধাড়ী শিয়ালটা ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বের করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

'দেখছ, কি রকম বিরক্ত হয়েছে ব্যাটা?'

'কেন, বিরক্ত হবে কেন?' চোখ বড় বড় করল ভায়োলা।

'ওদের মধ্যে বোধহয় এত দেরি করার রীতি নেই,' হাসি চেপে বলল রানা। 'আমরা শুধু কথা বলে সময় নষ্ট করছি, আসল কাজের নামও নিচ্ছি না, বিরক্ত হবে না তো কি!'

হাত মুঠো করে কিল তুলল ভায়োলা, ঝট করে ভায়োলারই বুকের ভেতর মুখ লুকাল রানা। কিলটা পড়ল রানার চওড়া, ভিজে পিঠে। ভায়োলার বুকের ভেতর আরও একটু সেঁধিয়ে গেল রানার নাক-মুখ।

হুক্কা-হুয়া করে একটা ডাক ছাড়ল শিয়ালটা, তারপর ঝোপ টপকে ছুটল। বোধহয় সঙ্গিনীর খোঁজে।

রানা আর ভায়োলা তখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।

কি যেন জিজ্ঞেস করল ভায়োলা, অন্যমনস্ক ছিল বলে শুনতে পায়নি রানা। চাঁদের আলোয় ওদের নগ্ন শরীর ঘামে চকচক করছে। রানার পাশেই ভাঁজ করা হাঁটুর

উপর চিবুক ঠেকিয়ে বসে আছে ভায়োলা। শান্ত, মৃদু কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল রানা।

বলল কোথায় যাচ্ছে ও, কেন যাচ্ছে। নেপলসে যখন এল তখন ওর মানসিক আর শারীরিক অবস্থা কি ছিল। রেমারিক আর রিসো কিভাবে ওকে যোগাড় করে দিল কাজটা। প্রথম দিকে লুবনার সঙ্গে কি রকম কঠোর ব্যবহার করেছিল ও, কিন্তু ছোট্ট মেয়েটা কিভাবে ধীরে ধীরে তার মন জয় করে নেয়।

এসব কথা ভায়োলাকে কেন বলছে রানা, ও নিজেও বোধহয় ভাল করে জানে না। কারণ হয়ত ভায়োলার নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদন, কিংবা হয়ত রাতের নির্জন পরিবেশটাই এমন যে বিদায় লগ্নে মনের সমস্ত ভার লাঘব করার একটা অবকাশ তৈরি করে দিয়েছে।

লুবনাকে নিয়ে পিকনিকে যাবার ঘটনাটাও বলল রানা। সেদিন লুবনা ওকে ছোট্ট একটা কোরান শরিফ উপহার দিয়েছিল। ওর নির্বাচিত শব্দগুলো জ্যান্ত করে তুলল লুবনাকে, চোখের সামনে মেয়েটাকে পরিষ্কার যেন দেখতে পেল ভায়োলা। চঞ্চল, কৌতূহলী, কথায় কথায় ঠোঁট ফোলায়, আবার অকারণ আনন্দে খিল খিল করে হেসে ওঠে।

তারপর, শেষ দিনটা। কিডন্যাপাররা লুবনার পথরোধ করে দাঁড়াল। গুলি খেয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে রানা, চিৎকার করে ওর নাম ধরে ডাকল লুবনা— সেই হাহাকার ধ্বনি আজও পরিষ্কার শুনতে পায় রানা। জ্ঞান ফিরল হাসপাতালে, জানে না বাঁচবে কিনা, কিন্তু বাঁচার প্রচণ্ড একটা আকুতি রয়েছে। এরপর রেমারিক এসে জানাল, লুবনা নেই। জানাল, কিভাবে তাকে নির্যাতন করা হয়েছে।

আর বলল সেই গানের কথা; যে গান ওকে ঘুমাতে দেয় না।

ভাঁজ করা হাঁটুতে কপাল ঠেকিয়ে বসে আছে ভায়োলা, তার লম্বা কালো চুলে ঢাকা পড়ে আছে মুখ। অনেকক্ষণ হল চুপ করে গেছে রানা। পাথরের গায়ে বাড়ি খাওয়া বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আর ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে পড়ার আওয়াজ, মনে হল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে প্রকৃতি। মুখ তুলল ভায়োলা, চাঁদের ম্লান আলোয় তার চোখে পানি চিকচিক করতে দেখল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল ভায়োলা, রুদ্ধস্বরে বলল, 'মার, রানা! ওদের তুমি খুন কর! এমন প্রতিশোধ নাও, মানুষ যেন শিউরে ওঠে!'

ভাঁজ করা হাঁটুতে আবার মুখ ঢাকল ভায়োলা, তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠল। লুবনার জন্যে কাঁদছে সে। উঠে বসেছে রানা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে, নির্বাক।

এক সময় শান্ত হল ভায়োলা। চোখ মুছে জিজ্ঞেস করল, 'যে-কাজে তুমি যাচ্ছ, ফিরে আসার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'জানি না,' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল রানা। 'খুব কম, নেই বললেই চলে।'

'কিন্তু ফিরে তোমাকে আসতেই হবে...।'

ভায়োলার বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল, মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। দেখল, ভায়োলার ঠোঁটের কোণে একটু ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে।

'ফিরে আসতে হবে, তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ,' হাসিটা আরও একটু বড় হল ভায়োলার মুখে। 'আমার কাছে। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।'

হেসে ফেলল রানা। 'চেষ্টার কোন ক্রটি করব না, কথা দিলাম।'

'যতদিন তুমি না ফের, রোজ সকালে চার্চে যাব আমি,' অস্ফুটে বলল ভায়োলা। 'তোমার জন্যে প্রার্থনা করব।'

তিন

ভিনসেন্ট গগলের অফিস কামরায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, দেয়ালে সাঁটা অস্ত্রশস্ত্রের ছবি দেখছে। রিসেপশনে দু'জন ক্রেতার সঙ্গে আলাপ করছে গগল, ওদেরকে বিদায় করে কথা বলবে রানার সাথে। অস্ত্র চোরাচালানের ব্যবসা আগের মতই চালু রেখেছে গগল, তবে আর্মস ডিলারের লাইসেন্স যোগাড় করে এখন সে ব্যবসাটাকে একটা বৈধ আবরণ পরিয়ে নিয়েছে।

'কি চাই?' ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল গগল। তীক্ষ্ণ চোখে রানার আপাদমস্তক লক্ষ করল সে। রানাকে চিনতে পারেনি। দেখল, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা লোকটা, আত্মবিশ্বাস, শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে শক্তি আর সাহস।

'আমি মাসুদ রানা।'

সামনে সাপ দেখলেও বোধহয় এতটা আঁতকে উঠত না গগল।

'যা যা চেয়েছি সব যোগাড় হয়েছে?' সরাসরি কাজের কথা পাড়ল রানা, বিস্ময় প্রকাশের কোন সময়ই দিল না গগলকে।

ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল গগল। 'হ্যাঁ। ঢালাও অর্ডার দিয়েছিলে, কিছু কিছু আইটেমের বিকল্প যোগাড় করে রেখেছি, পছন্দমত বেছে নিতে পারবে।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'আগে লাঞ্চ সেরে নিই, তারপর ওয়্যারহাউসে যাব। ইতিমধ্যে ফোন করে দিলে আমার লোকেরা তোমার দেখার জন্যে সব বের করে রাখবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা।

অপেক্ষা করছে গগল, তার মনে হল আরও কি যেন বলবে রানা।

'জাল কিছু কাগজ-পত্র লাগবে আমার,' বলল রানা। 'ভাবছি...'

'পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এই সব?'

'হ্যাঁ।'

'কঠিন কিছু না। কোন দেশের?'

'ফ্রেঞ্চ, কানাডিয়ান বা আমেরিকান,' বলল রানা। 'ফ্রেঞ্চ আর ইংরেজি জানি, কাজেই তিন দেশের যে-কোন একটা হলে চলবে। সমস্যা অন্যখানে, ওগুলো আমার খুব তাড়াতাড়ি দরকার—চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে।'

আঙুলের গিঁট গুনতে শুরু করল গগল, অন্যমনস্ক। 'ফ্রেঞ্চ কাগজ হলে যদি চলে, এই সময়ের মধ্যে সম্ভব।'

'গুড।'

'ফটো?'

জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করল রানা। 'বারোটা ফটো আছে এতে। সাধারণ একজন ফরাসী বিদেশে যেতে চাইলে যে-সব কাগজ-পত্র লাগে, সব আমার দরকার হবে।'

রানার হাত থেকে এনভেলাপটা নিয়ে একটা দেরাজে রাখল গগল। 'পাবে।' অস্ত্রশস্ত্র বা কাগজ-পত্র কেন দরকার রানার জানতে চায়নি সে, চাইবেও না। রানাকে সে চেনে, কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে অর্ডার দেখে আন্দাজ করে নিয়েছে।

'এ সবের জন্যে প্রচুর খরচ হবে তোমার,' বলল রানা। 'চেক বা...'

'ভেব না এসব তোমাকে আমি দান করছি,' রানার একটা হাত ধরে দরজার দিকে এগোল গগল। 'সময় হলে ঠিকই আমি কিছু চাইব, বিনিময়ে। চল, লাঞ্চটা সেরে আসি।'

কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই, জানে রানা। অস্ত্র আর কাগজ-পত্রের জন্যে কোন পয়সা নেবে না গগল। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে এই ঋণ শোধ করতে হবে ওকে।

পরশু রাতে বন পোয়ারোয় চড়ে মার্সেলেসে পৌঁচেছে রানা।

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা রেলওয়ে স্টেশনে চলে এসেছে, ব্যাগেজ রুম থেকে কালো রঙের লেদার ব্রিফকেসটা সংগ্রহ করেছে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে নির্জন এক কোণে বসে, কফির অর্ডার দিয়ে পকেট থেকে বের করেছে রেমারিকের চিঠিটা।

নাম্বার মিলিয়ে কমবিনেশন লক খুলেছে রানা। ভেতরে একটা বড়সড় ম্যানিলা এনভেলাপ, তাতে এক গোছা চাবি, একটা রোডম্যাপ আর দুইসেট কাগজ-পত্র। এক সেট কাগজ বিনো গারবাল্ডির নামে—তার পাসপোর্ট, পরিচয়-পত্র ইত্যাদি। লোকটা আমালফিতে বাস করে, তরি-তরকারি আমদানির ব্যবসা আছে। দ্বিতীয় সেট কাগজ টয়োটা ভ্যানের জন্যে। রোড ম্যাপটা খুলল রানা। ম্যাপের গায়ে এখানে-সেখানে কালো কালি দিয়ে বৃত্ত রচনা করা হয়েছে, মার্জিনে লেখা রয়েছে বেশ কিছু নির্দেশ। দেখা শেষ করে আবার সব ব্রিফকেসে ভরে তালা

লাগিয়ে দিল ও।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, কাঁচের পার্টিশন ভেদ করে প্ল্যাটফর্মে চলে গেছে ওর দৃষ্টি, কিন্তু ভাবছে রেমারিকের কথা। ওর সাহায্য ছাড়া এতসব আয়োজন করা কঠিন হত। ও জানে, বিনো গারবাল্ডি বাস্তবেও একজন ব্যবসায়ী হবে, ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তার নাম আর পরিচয় ধার করা হয়েছে। পাসপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজও নেপলসের সেরা জালিয়াতকে দিয়ে জাল করানো হয়েছে, কারও সাধ্য নেই খুঁত বের করে। রানা জানে, নেপলসে পৌঁছে সে দেখবে সব একেবারে তৈরি অবস্থায় আছে। এক হপ্তা পর শুরু হবে আগুন নিয়ে খেলা।

ভ্যানটা সম্ভবত ফুরেলা চালিয়ে নিয়ে এসেছে মার্সেলেসে, আন্দাজ করল রানা। ফুরেলার নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়ে রেমারিকের সঙ্গে আলাপ করতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে পোস্ট অফিসে এল রানা, ঢাকা আর প্যারিস থেকে আসা পার্সেল দুটো সংগ্রহ করল। বিনো গারবাল্ডির নাম ভাঁড়িয়ে একটা হোটেলে উঠল ও।

পাথরের মেঝে, অনেক ওপরে ইস্পাতের সিলিং, ওদের পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসছে। চারদিকে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে কাঠের বাক্স, সার সার বাক্সের মাঝখানে গোলকধাঁধা তৈরি করেছে অসংখ্য প্যাসেজ। নাকে পরিচিত একটা গন্ধ ঢুকল—মেটালের সাথে গ্রিজের মাখামাখি হলে এই তামাটে গন্ধ পাওয়া যায়। ইস্পাতের ভারি একটা দেয়াল ওয়্যারহাউসটাকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে, দেয়ালের মাঝখানে পাঁচ সের ওজনের বড় একটা তালা। তালা খুলে একটা বোতামে চাপ দিল গগল। মাথার ওপর এক সঙ্গে জ্বলে উঠল ডজনখানেক নিয়ন টিউব। দুটো স্টীল টেবিল দেখা গেল; একটা খালি, অপরটা নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আর ইকুইপমেন্টে ঢাকা পড়ে আছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল গগল, তাকে পাশ কাটিয়ে দ্বিতীয় টেবিলের সামনে চলে এল রানা। আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর ওপর প্রথমে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ও, তারপর এক এক করে পরীক্ষা করল। প্রথম সেট, পিস্তল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল গগল।

'ছোট, হালকা আর ফরটি-ফাইভ ক্যালিবার চেয়েছিলে তুমি,' বলল সে। 'বেছে নাও।'

বিভিন্ন দেশের তৈরি বারোটা পিস্তল রয়েছে টেবিলে, সাইলেন্সার রয়েছে কয়েক ধরনের। একটা কোল্ট উনিশশো এগারো, আর একটা ব্রিটিশ ওয়েবলি, পয়েন্ট থ্রি-টু, হাতে নিল রানা। দ্বিতীয়টা ওকে হাতে নিতে দেখে একটু যেন বিস্মিত হল গগল।

'জানি,' বলল রানা। 'সেকেলে। কিন্তু এটার ওপর নির্ভর করা যায়।' পিছনের

খালি টেবিলে পিস্তল দুটো রাখল ও। এরপর এক জোড়া সাইলেন্সার বাছল, সে-দুটোও রাখল পিস্তলের সঙ্গে। 'প্রতিটার জন্যে পঞ্চাশ রাউণ্ড করে গুলি লাগবে।'

ছোট্ট একটা প্যাড আর বল-পয়েন্ট পেন বের করে লিখতে শুরু করল গগল। রানা ওদিকে সাবমেশিনগান পরীক্ষা করছে। চার ধরনের সাবমেশিনগান রয়েছে—ইসরায়েলি উজি, ব্রিটিশ স্টার্লিং, ডেনিশ ম্যাডসেন, ইনগ্রাম মডেল টেন। দ্রুত হাতে শেষেরটা তুলে নিল রানা। মেটাল বাঁট ভাঁজ করা অবস্থায় রয়েছে, গোটা অস্ত্রটা মাত্র সাড়ে দশ ইঞ্চি লম্বা। সাবমেশিনগান, কিন্তু দেখতে বড় একটা পিস্তলের মত, ফায়ারিং রেট প্রতি মিনিটে এগারোশো।

'আগে ব্যবহার করেছ?' জানতে চাইল গগল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এর সবচেয়ে বড় সুবিধে, ছোট। এর জন্যে সাপ্রেসর লাগবে, আছে?'

'দিন দুয়েকের মধ্যে যোগাড় হয়ে যাবে।'

এরপর স্নাইপার রাইফেল। গগলের কালেকশনে রয়েছে এম ফোরটিন এর উন্নত সংস্করণ, সাথে উইভার সাইট। আর রয়েছে ব্রিটিশ এল-ফোর-এ-ওয়ান, সাথে স্ট্যাণ্ডার্ড থারটি টু সাইট। এম ফোরটিন বেছে নিল রানা। বলল, 'কারট্রিজের স্ট্যাণ্ডার্ড একটা বাক্স আর দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন।'

রকেট লঞ্চারের দিকে সরে এল ওরা। রানা বলল, 'আর. পি. জি. সেভেন দরকার আমার।'

নিঃশব্দে হাসল গগল, বেঁটে আর মোটাসোটা একটা টিউব তুলে নিল হাতে। 'যোগাড় করতে পারলে লাখ দশেক বিক্রি করতে পারতাম।' টিউবের দুই প্রান্ত ধরে মোচড় দিল সে, মাঝখানে খুলে গেল সেটা। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চমৎকার, স্ট্রোক ডি। মিসাইলের স্ট্যাণ্ডার্ড প্যাকিং কি রকম?'

'দু'রকম বাক্স, আটটা আর বারোটা ধরে,' বলল গগল। লঞ্চারটাকে জোড়া লাগিয়ে ইনগ্রামের পাশে শুইয়ে রাখল সে।

'তাহলে আটটার একটা বাক্স দাও।' গ্রেনেডের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ব্রিটিশ ফ্র্যাগমেন্টেশন থারটি সিক্স আর ফসফরাস এইটি সেভেন বেছে নিল ও। 'গ্রেনেডের প্যাকিং স্ট্যাণ্ডার্ডের চেয়ে ছোট হলে ভাল হয়, এক-একটা বাক্সে গোটা পনেরো ধরলেই চলবে। মোট ত্রিশটা।'

'ঠিক আছে।'

এরপর রানা একটা ডাবল ব্যারেল শটগান তুলল, ব্যারেল আর স্টক ছোট করা হয়েছে। ব্রিচ খুলে আলোর সামনে ধরল ও, পরীক্ষা শেষে বন্ধ করে রেখে দিল গ্রেনেডগুলোর পাশে। 'একজোড়া এস. এস. জি.-র বাক্স।' প্যাডে লিখে নিল গগল।

নেড়েচেড়ে দেখে একটা ট্রাইলাক্স নাইট সাইট, খাপে ভরা একটা কমাণ্ডো

নাইফ আর কয়েক ধরনের ওয়েবিং নির্বাচন করল রানা। সবশেষে, টেবিলের শেষ মাথায় পৌঁছে, গভীর একটা মেটাল ট্রে-র তলা থেকে খুদে আকৃতির কয়েকটা জিনিস তুলে মনোযোগের সাথে পরখ করল।

'ওগুলো একেবারে লেটেস্ট,' রানার কাঁধের কাছ থেকে বলল গগল। 'এর আগে বোধহয় দেখনি?'

রানার হাতে ছোট একটা সার্কুলার টিউব। টিউবের এক প্রান্ত থেকে সরু একটা সূঁচ আধ ইঞ্চি বেরিয়ে আছে।

'এ-ধরনের ডিটোনেটর ব্যবহার করেছি,' বলল রানা। 'কিন্তু টাইমারটা এই প্রথম দেখছি।'

আরেকটা মেটাল টিউব তুলে নিল গগল। এটার এক জোড়া কাঁটা রয়েছে, ইলেকট্রিক প্লাগের মত। স্ক্রু খুলে রানাকে ক্যাডমিয়াম সেল ব্যাটারি, আর দুটো ডায়াল দেখাল সে। তরপের ডিটোনেটরে টাইমারের প্লাগ ঢুকিয়ে দিল। জোড়া লাগানো জিনিসটা মাত্র দু'ইঞ্চি লম্বা, আর ডায়ামিটারে পৌনে এক ইঞ্চি। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বলল সে, 'ইলেকট্রনিক্সের বদৌলতে এ-সব একেবারে পানির মত সহজ হয়ে গেছে। রেমারিক এক কিলো প্লাস্টিক-এর কথা বলেছিল। যোগাড় হয়েছে, কিন্তু রেখেছি আরেক জায়গায়।'

'গুড,' বলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দ্বিতীয় টেবিলের দিকে তাকাল ও। 'আর কিছু দরকার নেই আমার।'

টেবিলের দিকে গগলও তাকাল। বন্ধুর চাহিদা মেটাতে পেরে সে তৃপ্ত।

'ওয়েবলির জন্যে হালকা একটা শোল্ডার-হোলস্টার দিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আর কোল্টের জন্যে একটা বেল্ট হোলস্টার?'

'পারব,' বলল গগল। 'কোল্টের জন্যে স্ট্যাণ্ডার্ড ইস্যু ক্যানভাস।'

'চলবে।' একটা টেপ মেজার আর নোট বুক বের করল রানা। 'স্কেল আছে?'

'আছে,' বলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল গগল। টেপ মেজার নিয়ে কাজ শুরু করল রানা।

রোড ম্যাপে চোখ রেখে ড্রাইভারকে বলল রানা, রুসেন্ট অনরির মোড়ে নামবে ও। হোটেলে গিয়ে কাপড় বদলে এসেছে, পরনে এখন ডেনিম জিনস আর শার্ট। শহরের মাঝখান দিয়ে পুব দিকে যাচ্ছে ট্যাক্সি। মার্সেলেসকে একটা কারণে ওর পছন্দ, রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য—যে-কোন লোক পরিচয় গোপন করে এই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে। এই শহরের লোকেরা নিজেদের চরকায় তেল দিতে পছন্দ করে, কারও সাতে-পাঁচে নেই। আর্মস আর ড্রাগস স্মাগলারদের জন্যে এটা একটা আদর্শ শহর।

পেভমেন্টের পাশে থামল ট্যাক্সি, ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নামল রানা। বাঁক নিয়ে

দশ মিনিট হাঁটল ও, পৌঁছে গেল রু কাটিনাট-এর মোড়ে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রাস্তাটা ভাল করে দেখে নিল ও।

শহরের বাইরে, শ্রমিকদের আবাসিক এলাকা। রাস্তার দু'পাশে পাঁচ-সাত তলা বিল্ডিং, নিচে ছোটখাট ওয়র্কশপ, কারখানা আর গ্যারেজ। ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। দশ মিনিট পর তালা দেয়া একটা গ্যারেজের সামনে থামল ও, দু'পাশে আরও কয়েকটা করে গ্যারেজ রয়েছে, সবগুলো বন্ধ। গ্যারেজের দরজায় লেখা নাম্বারটা দেখল—দশ। কোন দিকে না তাকিয়ে চাবি বের করল ও, তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। আলো না জ্বেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু কোন শব্দ পেল না।

আলো জ্বালার পর দেখল, গ্যারেজের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে নিয়েছে এক টয়োটা ভ্যান। গাঢ় খয়েরি রঙ করা, এক পাশে বড় বড় অক্ষরে লেখাটা ঝাপসা হয়ে গেছে—বিনো গারবাল্ডি, ভেজিটেবল ডিলার।

পুরানো আর তোবড়ানো হলেও রানা জানে, ভ্যানের এঞ্জিন আর সাসপেনশনে কোন খুঁত নেই। পিছনের দরজা খুলল ও। সামনেই ভ্যানের মেঝেতে রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল কর্ডের একটা কয়েল, প্লাগ সহ। আপন মনে একটু হাসল ও, বুদ্ধি করে আলোর ব্যবস্থাও করে রেখেছে রেমারিক। ভ্যানে চড়ল রানা, প্লাগটা তুলে নিয়ে দেয়ালের গায়ে ফিট করা সকেটে ঢোকাল। বাল্বটা জ্বলে উঠে আলোকিত করে তুলল বাকি সব জিনিস। লম্বা সাইজের কিছু কাঠ, তুলো ভরা কয়েকটা বস্তা, ফেল্টের লম্বা একটা রোল, কাঠের একটা বেঞ্চ আর একটা টুলবক্স।

এক এক করে ভ্যান থেকে সব নামাল রানা। তারপর কমপার্টমেন্টের সামনে এসে প্যানেলিংটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল, এই প্যানেলিং-ই ড্রাইভারের সিটের পিঠ হিসেবে কাজ করছে। টুলবক্স থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে এল ও, প্যানেলের রঙ না চটিয়ে গর্তে লুকিয়ে থাকা বারোটা স্ক্রু খুলল। আস্তে করে খসে পড়ল ফলস প্যানেল, সামনে দেখা গেল এক ফুট গভীর আর লম্বা-চওড়ায় কমপার্টমেন্টের সমান একটা ফাঁকা জায়গা। 'গুড,' বিড়বিড় করে বলল রানা, প্যানেলটা ভ্যান থেকে নামিয়ে গ্যারেজের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল। এরপর টেপ মেজার আর নোটবুক বের করে চোরা-কুঠরির নিখুঁত মাপ নিল ও।

আগে নোট করা মাপজোখের সঙ্গে চোরা কুঠরির মাপ মিলিয়ে দ্রুত হাতে একটা নক্সা আঁকল রানা, গ্যারেজের দরজায় সেঁটে দিল সেটা। পরবর্তী দু'ঘন্টা কোন বিরতি ছাড়াই কাজ করে গেল ও। টেপ মেজার দিয়ে মাপ নিল, তারপর ছোট একটা পাওয়ার স দিয়ে কাটল কাঠগুলো।

কাজটা উপভোগই করছিল রানা, কিন্তু বন্ধ গ্যারেজের ভেতর গুমোট হয়ে উঠল পরিবেশ। বাইরে ইতিমধ্যেই অন্ধকার নেমেছে, খোলা বাতাসে দশ মিনিট

হেঁটে ছোট একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল ডিনার খাবে বলে।

পরদিন সকাল আটটায় গ্যারেজে ফিরে এল ও, কাজ করল দুপুর পর্যন্ত। সেই ছোট রেস্তোরাঁতেই লাঞ্চ সারল, ওর মত একই ধরনের নোংরা কাপড় পরে আরও অনেকে খেতে এসেছে।

বিকেল নাগাদ কাজটা শেষ করল রানা। কাঠের একটা ভারি ফ্রেম তৈরি করেছে ও, চোরা কুঠরিতে সেটা ঢুকিয়ে দেয়া হল। ফ্রেমের গায়ে অনেকগুলো ঘর রয়েছে, আলগা কাঠের টুকরোগুলো বসে গেল খাপে খাপে। পিছিয়ে এসে হাতের কাজটা খুঁটিয়ে দেখল ও। বাচ্চাদের খেলনা, অসমাপ্ত একটা গোলকধাঁধার মত দেখাল কমপার্টমেন্টটাকে। খোপগুলো বৃহস্পতিবারে ভরবে ও।

বৃহস্পতিবার।

একজন গার্ডকে সাথে নিয়ে অপেক্ষা করছে গগল। রাস্তায় আর কেউ নেই। রাত দশটা পাঁচে গাঢ় নীল রঙের একটা ভ্যান বাঁক নিয়ে এগিয়ে এল, থামল একশো মিটার দূরে। হেডলাইটের আলো দু'বার জ্বলে উঠে নিভে গেল, আর জ্বলল না।

'ওই মোড়ে গিয়ে অপেক্ষা কর,' গার্ডকে বলল গগল। 'ভ্যান চলে গেলে তবে ফিরবে।' অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল গার্ড, এবার ভ্যানটা এগিয়ে আসতে শুরু করল।

'সব ঠিক?' ক্যাব থেকে লাফ দিয়ে নামল রানা।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়্যারহাউসের তালা খুলল গগল। দরজার কাছেই একটা ফর্ক লিফটের ওপর তিনটে কাঠের প্যাকিং কেস রয়েছে—এ. বি. আর. সি. লেখা। এক এক করে তিনটের দিকেই আঙুল তাক করল গগল। 'অ্যামুনিশন, উইপনস, আদার ইকুইপমেন্টস।' দু'মিনিটের মধ্যে বাক্সগুলো ভ্যানে তোলা হল, রানাও উঠে বসল ক্যাবে।

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল গগল। 'কাল বিকেলে আমার অফিসে এসে কাগজ-পত্রগুলো নিয়ে যেয়ো।'

'ঠিক আছে,' বলে ভ্যান ছেড়ে দিল রানা।

শহরের ভেতর চল্লিশ মিনিট ভ্যান নিয়ে ঘুরল ও—বারবার স্পীড কমাল আর বাড়াল, অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁক নিল কয়েকবার। না, কেউ ওর পিছু নেয়নি। রু কাটিনাটে পৌঁছে গ্যারেজটাকে পাশ কাটাল রানা, আরও পঞ্চাশ মিটার এগিয়ে তারপর থামল। এঞ্জিন বন্ধ করল ও, আলো নেভাল, চুপচাপ আধ ঘন্টা বসে থাকল ড্রাইভিং সিটে—তীক্ষ্ণচোখে চারদিকটা দেখছে, কান দুটো সজাগ। এরপর স্টার্ট দিয়ে পিছিয়ে আনল ভ্যান, দাঁড় করাল গ্যারেজের দরজার সামনে। বাক্সগুলো গ্যারেজে রেখে তালা দিল দরজায়, ভ্যান নিয়ে রওনা হল হোটেলের দিকে। ধীর গতিতে ভ্যান চালাল ও, একটা চোখ থাকল রিয়ার ভিউ মিররে।

সকালে ভাড়া করা ভ্যানটা ফেরত দিয়ে গ্যারেজে চলে এল রানা। বাক্স তিনটে খুলল ও। এক এক করে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ আর গ্রেনেড বের করে যার যার বরাদ্দ করা জায়গায় খাপে খাপে বসিয়ে দিল। ফ্রেম আর ইকুইপমেন্টের মাঝখানে যেখানে যত ফাঁক-ফোঁকর দেখল, সব তুলো দিয়ে ভরল ও। এরপর গোটা ফ্রেমের সামনে ফেল্টের একটা পর্দা ঝুলিয়ে দিল। ফলস্ প্যানেলটা ভ্যানে তুলল ও, জায়গামত বসিয়ে এক এক করে এঁটে দিল বারোটা স্ক্রু। কাজ সেরে প্যানেলের গায়ে কয়েক বার ঘুসি মারল ও। ফাঁপা নয়, নিরেট আওয়াজ হল। সন্তুষ্ট এবার রানা। ওর অস্ত্রের বাহন এখন তৈরি।

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দোল খাচ্ছিল গগল, ভেতরে ঢুকল রানা। ওকে দেখে সিধে হয়ে বসল গগল, চোখ-ইশারায় সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। 'কফি?'

'না।'

গগল আর দ্বিতীয়বার সাধল না। ডেস্ক থেকে একটা এনভেলাপ তুলে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। কাগজগুলো অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল রানা। তারপর মুখ তুলে বলল, 'খুবই ভাল হাতের কাজ।'

গগলের ঠোঁটে ক্ষীণ একটু তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল সে, 'তোমার আর কি কাজে লাগতে পারি আমি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আর কিছুর দরকার নেই আমার। ভাল কথা, এই পাসপোর্ট আর কাগজগুলোর ব্যাপারে রেমারিকও যেন কিছু না জানে।'

এবার সরাসরি প্রশ্ন করল গগল, 'মস্ত বড় একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ তুমি, কিন্তু কারও সাহায্য চাইছ না কেন?'

'চাইছি না মানে? রেমারিক আর তুমি সাহায্য করছ না?'

'আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি,' বলল গগল। 'এসব যোগান দেয়ার মধ্যে কোন বিপদ নেই। আমি বলতে চাইছি···।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা। 'এ আমার একার যুদ্ধ, গগল।'

দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর মাথা ঝাঁকাল গগল। রানা কি বলতে চায় উপলব্ধি করেছে সে।

বিদায়ের মুহূর্তে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল না গগল, রানাও তাকে ধন্যবাদ জানাল না। উপকার, উপকারের বিনিময়ে উপকার, এরই ওপর ভিত্তি করে ওদের বন্ধুত্ব। পরস্পরকে ওরা শ্রদ্ধা করে, কেউ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায় না। অদ্ভুত একটা সম্পর্ক, কিন্তু এমনই মজবুত যে ভেঙে যাবার নয়।

চার

চোখে বিনকিউলার নিয়ে বোর্ডিং হাউসের টেরেসে দাঁড়িয়ে আছে রেমারিক। নীল আর সাদা রঙের ফেরি ডকে ভিড়ল। জাল কাগজ-পত্রের ওপর আস্থা আছে রেমারিকের, কিন্তু মার্সেলেস থেকে আসা গাড়িগুলো প্রায়ই তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হয়।

তিনটে লাইন ধরে ফেরি থেকে নামতে শুরু করল গাড়ি। একটা লাইনে কয়েকটা ট্রাক আর একটা কন্টেইনার-ট্রেলর দেখা গেল। তারপর খয়েরি রঙের ভ্যানটা। ক্যাব থেকে রানাকে নামতে দেখল রেমারিক। ভ্যানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা, চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব। ওর পরনে ডেনিম ওভারঅল, হাতে একটা বড় ম্যানিলা এনভেলাপ। অলস ভঙ্গিতে পায়ে বাড়ি মারছে এনভেলাপটা দিয়ে।

বিশ মিনিট পর রানার সামনে একজন কাস্টমস অফিসার এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে টেরেসে রেমারিকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ফুরেলা।

'উনি পৌঁচেছেন?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' ডকের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে জবাব দিল রেমারিক।

রানার কাগজ-পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল অফিসার, তারপর ভ্যানের পিছন দিকে হেঁটে এল। ভ্যানের দরজা খুলে দিল রানা, ওর হাতে এনভেলাপটা ফিরিয়ে দিয়ে ভ্যানে চড়ল অফিসার।

রেমারিকের মনে হল অনন্তকাল ধরে ভ্যানের ভেতর রয়েছে অফিসার। তারপর এক সময় বেরিয়ে এল সে, দু'হাত দিয়ে কি যেন একটা বুকের কাছে ধরে রয়েছে। শিউরে উঠল রেমারিক, ভাল করে দেখার জন্যে কাঁপা হাতে বিনকিউলারটা অ্যাডজাস্ট করল। এবার অফিসারের হাতে ধরা জিনিসটা চিনতে পারল। সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'কি ওটা?' জানতে চাইল ফুরেলা।

'তরমুজ—বেজন্মা শালা একটা তরমুজ চায়!'

হেসে ফেলল ফুরেলা।

খয়েরি ভ্যান সিকিউরিটি গেটের দিকে এগোল। গেটে মুহূর্ত কয়েকের জন্যে থামল মাত্র, তারপরই রাস্তায় উঠে এল রানা। চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে হাতঘড়ি দেখল রেমারিক। 'এক ঘন্টার মধ্যে ফোন করবে ও। লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে যাব আমি—এদিকটা তুমি সামলাতে পারবে তো?'

'পারব,' বলল ফুরেলা। 'ওঁকে আপনি আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।'

হাতে একটা ক্যানভাস ব্যাগ নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল রেমারিক। ভেতরে ঢুকেই

দাঁড়িয়ে পড়ল ও, রোদ থেকে এসে অল্প আলোয় ভাল দেখতে পাচ্ছে না। ধীরে ধীরে প্রসারিত হল দৃষ্টিসীমা, খদ্দের বলতে একমাত্র রানাকেই এক কোণে একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখল সে। বারোটাই বাজেনি এখনও, নেপলসের লোকেরা এত তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খায় না।

দুই বন্ধু পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। রানাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল রেমারিক, ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'গোজো তোমার বয়স কমিয়ে দিয়েছে দশ বছর।'

মৃদু হাসল রানা। 'ওরা সবাই তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছে।'

বসল ওরা। ওয়েটারকে ডেকে হালকা লাঞ্চের অর্ডার দিল রানা।

ওয়েটার সরে যেতে রেমারিক জিজ্ঞেস করল, 'মার্সেলেসে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'না।'

'ভায়োলা কেমন আছে?'

মৃদু হাসল রানা। 'ভাল। বলেছে, কাজ শেষ করে ফিরতে হবে ওর কাছে।'

মুচকি একটু হেসে অন্য প্রসঙ্গে চলে এল রেমারিক। 'ফুরেলাকে আমি মার্সেলেসে পাঠিয়েছিলাম। বেশিরভাগ লেগওঅর্ক ওকে দিয়েই করিয়েছি, রোম আর মিলানোও গিয়েছিল ও।'

'ও খুব কাজের ছেলে,' মন্তব্য করল রানা।

ওয়েটার লাঞ্চ দিয়ে গেল।

খেতে শুরু করে রানা বলল, 'ফুরেলার বিপদ হতে পারে।'

'জানি,' বলল রেমারিক। 'তুমি শুরু করলেই ওকে আমি গোজোয় পাঠিয়ে দেব। গোটা ব্যাপারটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে ও।'

'গুড,' বলল রানা। 'ওকে ছাড়া ম্যানেজ করতে পারবে তো?'

'প্রেজো ফিসো বন্ধ করে দিচ্ছি,' বলল রেমারিক। 'শুধু যারা রেগুলার, তাদের জন্যে লাঞ্চ আর ডিনারের ব্যবস্থা থাকবে।' ক্যানভাস ব্যাগ খুলে পাঁচ গোছা চাবি বের করল সে, সাথে একটা রোড ম্যাপ, আর একটা ফোল্ডার। চাবির গোছাগুলো রানার দিকে বাড়িয়ে দিল, প্রতিটির সঙ্গে একটা করে ট্যাগ আছে। বলল, 'মিলানের অ্যাপার্টমেন্ট, ভাইজেনটিনোয় কটেজ, একটা আলফেটা জি. টি., রোমে অ্যাপার্টমেন্ট, আর রোমে একটা রেনল্ট টোয়েন্টি।'

চাবি নিয়ে হাসল রানা। 'আমার দেখছি প্রচুর সম্পত্তি!'

'ভাড়া করা,' জবাব দিল রেমারিক। 'এগুলো সবই তিন মাসের জন্যে ভাড়া নেয়া হয়েছে, মাস শুরু হয়েছে দশ দিন আগে।'

'খোঁজাখুঁজি শুরু হলে তোমার নাম বেরিয়ে আসবে না তো?'

মাথা নাড়ল রেমারিক। 'অসম্ভব। অ্যাপার্টমেন্ট দুটো আর কটেজটা

ব্রাসেলসের একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাড়া করেছে। আর গাড়ি দুটো ভাড়া নিয়েছে বিনো গারবাল্ডি।'

'আচ্ছা, বিনো কি···?'

'প্রেমিকাকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় বেড়াতে গেছে সে, ফিরতে মাস কয়েক দেরি হবে।' রোড ম্যাপ খুলে কালো কালি দিয়ে আঁকা দুটো বৃত্ত দেখাল রেমারিক। 'মিলানের অ্যাপার্টমেন্ট, আর এটা এখানে বাংলোটা।' এরপর এক এক করে গ্যারেজ, রোমের অ্যাপার্টমেন্ট, আরেকটা গ্যারেজ, সব দেখিয়ে দিল রানাকে। 'অ্যাপার্টমেন্ট আর বাংলোয় টিনের খাবার পাবে।' ফোল্ডারে টোকা দিল সে। 'এতে সবগুলোর ঠিকানা আছে।'

'ভেরি গুড,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল রানা। 'চার্জার?'

মুচকি একটু হেসে ব্যাগের ভেতর থেকে চকচকে দুটো সিলিণ্ডার বের করল রেমারিক। একটা হাতে নিয়ে সাবধানে পরীক্ষা করল রানা।

জিনিসটা অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। সাড়ে তিন ইঞ্চির মত লম্বা, ডায়ামিটারে পৌনে এক ইঞ্চি, প্রান্ত দুটো ঢালু। দু'দিক ধরে ঘোরাতেই মাঝখানে খুলে গেল সিলিণ্ডারটা। গর্ত দুটো দেখল রানা, বাইরের মত ভেতরের দিকও মসৃণ।

'এগুলো আমি লোকাল মেশিনশপে তৈরি করিয়েছি,' বলল রেমারিক। সিলিণ্ডার দুটো ব্যাগে ভরল সে। 'এগুলো সাধারণত আরেকটু বড় হয়—নিশ্চয়ই কষ্টকর, আমার ধারণা।'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'যত খুশি আপত্তি জানাতে পারে ব্যাটা, আমিও সহানুভূতি জানাব।'

ফোল্ডার ছাড়া বাকি সব ব্যাগে ভরে রাখল রেমারিক। 'আমার রেস্তোরাঁয় এক লোক খেতে আসে, নাম ডেরিক। সিসিলিতে ডন বাকালার হয়ে কাজ করেছে এককালে। সারাক্ষণ বক বক করে লোকটা, দুনিয়ার সব ব্যাপারে তার অভিযোগ। সিসিলির গল্প করতে ভালবাসে।'

'আমার সম্পর্কে কিছু জানে?'

মাথা নাড়ল রেমারিক। 'কিছুই জানে না। আসল কথা, ডন বাকালার ওপর ভারি চটা সে, ডন নাকি তার ওপর অন্যায় করেছে। ভিলা কোলাসি আর ওখানের সেট আপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না করেই তার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, লিখে এই ফোল্ডারে ভরে রেখেছি—তোমার কাজে লাগবে।'

ফোল্ডার খুলে দেখল রানা। ভিলার একটা স্কেচ ম্যাপ রয়েছে, আর কয়েক পাতা নোট। মুখ তুলল ও, বলল, 'চমৎকার, আমার অনেক খাটনি কমিয়ে দিলে।'

ওয়েটারকে ডেকে কফি দিতে বলল রেমারিক। ওয়েটার চলে যেতে বলল, 'ভিলা কোলাসিতে ঢোকা খুব কঠিন হবে তোমার জন্যে। গড ফাদার ভিলা থেকে

বেরোয় না বললেই চলে।'

রানা হাসল। 'যখন জানবে সে-ও টার্গেট, একেবারেই বেরুবে না।'

'কিভাবে ঢুকবে, কোন বুদ্ধি পেয়েছ?'

'কয়েকটা উপায়ের কথা ভেবে রেখেছি,' বলল রানা। 'কোনটা বেছে নেব সেটা নির্ভর করে আর কি তথ্য পাই তার ওপর।' আসলে ভিলা কোলাসিতে কিভাবে ঢুকবে রানা, ঠিক করা হয়ে গেছে। তিন মাস আগে পালার্মোয় গিয়েছিল ও, তখনই বুদ্ধিটা আসে মাথায়। ব্যাপারটা নিয়ে রেমারিকের সঙ্গে আলোচনা না করার একটা কারণ আছে।

কফি এল, কাপে চুমুক দিয়ে প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা। 'রোমে আতুনি বেরলিংগারের পর, আমি সম্পূর্ণ একা মুভ করব। কারও সঙ্গে কোন যোগাযোগ বা নির্দিষ্ট কোন ঘাঁটি থাকবে না। ততদিনে গাড়ি দুটো আর ভ্যানটা আমার কাছে থাকবে না—কেন বুঝতে পারছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। 'কারণ ততদিনে পুলিস আর ডন বাকালা হিসেব কষে বের করে ফেলবে কাজগুলো কার। তোমাকে চিনলে আমাকেও চিনতে সময় লাগবে না। ওরা আমাকে জেরা করতে আসবে, কিন্তু আমি যা জানি না তা ওদেরকে বলব কিভাবে?'

রানা গম্ভীর হল। 'তুমি না জানলে, ওরাও বুঝতে পারবে তুমি জান না। কাজেই এদিক থেকে তুমি নিরাপদে থাকছ। ইতিমধ্যে আমি যদি যোগাযোগ করতে চাই, কিভাবে করব? ফোন ব্যবহার করতে চাই না।'

ফোল্ডারটা দেখাল রেমারিক। 'সামনের পৃষ্ঠায়। নেপলস পোস্ট অফিসের একটা নাম্বার আছে—ফোন নাম্বার আর সময় জানিয়ে একটা তার পাঠিয়ে দিয়ো, বাইরে কোথাও থেকে ডায়াল করব আমি।'

ফোল্ডার খুলে পোস্ট বক্স নাম্বারটা পড়ল রানা। 'ঠিক আছে। সব যদি ভালভাবে এগোয়, কোন যোগাযোগই আমি করব না—পুরো কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।'

এরপর অনেকক্ষণ ওরা কেউ কথা বলল না।

রেমারিক এক সময় জিজ্ঞেস করল, 'কবে শুরু করছ?'

সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। নিচু গলায় জানাল।

আজই মিলানে যাবে রানা। কাল খুব সকালে বাংলোয় পৌঁছুবে ও। অগাস্টিন আর এলি প্রথম শিকার, কিন্তু ওদের শুধু একজনের সঙ্গে কথা বলার দরকার হবে রানার—সম্ভবত অগাস্টিনের সঙ্গে। দেখে তো মনে হয় পেশীসর্বস্ব একটা মূর্খ, এলির চেয়ে ওকেই সহজে ভাঙা যাবে। দু'একদিন নজর রাখবে রানা, তারপর একদিন তুলে নিয়ে আসবে।

ফোল্ডারটা টেবিল থেকে তুলে ব্যাগে ভরল রেমারিক। বলল, 'তুমি আগে

বেরিয়ে যাও।'

দাঁড়াল রানা। 'ফুরেলাকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো।'

'দেব,' বলল রেমারিক। 'ও তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

দাঁড়াল রেমারিক। ওর কাঁধে হাত রাখল রানা, চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ব্যাগটা নিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ

কাজের মধ্যে রয়েছে গিয়াকোমো অগাস্টিন। কাজটা মোটেও কষ্টকর কিছু না। গত দু'ঘন্টা ধরে এক এক করে পুব মিলানের অনেকগুলো বারে ঢুকেছে সে, বেরিয়ে এসেছে দু'এক মিনিট পর, প্রতিবার আরও ভারি হয়েছে হাতের লেদার ব্যাগটা। আজ বৃহস্পতিবার, আর বৃহস্পতিবার মানেই তার বসের টাকা জমা নেয়ার দিন।

ষাঁড় আকৃতির শরীরে ঘোড়া আকৃতির মুখ, স্বভাবটা গোঁয়ার-গোবিন্দ গণ্ডারের মত। একটু রাগ হলেই হাত চালিয়ে দেয়, লোকজনকে পিটিয়ে আনন্দ পায় সে। এই কাজের জন্যে উপযুক্ত লোক সে, কাজটা করেও নিখুঁতভাবে। তবে, একটু ধীরগতি; আর সব সময় একই রুটিন ধরে করে কাজটা।

মাঝরাতের দিকে বারগুলো থেকে টাকা আদায় শেষ করল অগাস্টিন। এবার ক্লাবগুলো ধরতে হবে। ঢিলে একটা জ্যাকেট পরে আছে সে, ফলে প্রকাণ্ড ধড় আরও বড় দেখাচ্ছে। জ্যাকেটের ভেতর, বাঁ বগলের নিচে, শোল্ডার হোলস্টারে একটা বেরেটা পিস্তল রয়েছে। লেদার ব্যাগটা লম্বা, চেইন টেনে বন্ধ করা, এরই মধ্যে ভরে গেছে অর্ধেক।

পিসমেকার নাইটক্লাবের সামনে, নো পার্কিং জোনে ল্যানসিয়া থামাল অগাস্টিন। নড়েচড়ে ওঠায় দুলতে শুরু করল গাড়ি, নেমে পেভমেন্টে দাঁড়াল সে। এই গাড়ি নিয়ে তার ভারি গর্ব। রঙটা মেটালিক সিলভার, স্টিরিও আছে, আছে মিউজিক্যাল হর্ন। ব্যাক-সিটের পিছনে, কার্নিসে বসে আছে একটা খেলনা পুতুল, গাড়ি ঝাঁকি খেলে পুতুলের মাথা ওঠা-নামা করে, মনে হয় ঘন ঘন উঁকি দিয়ে পিছনের রাস্তা দেখছে। প্রিয় বান্ধবীর দেয়া উপহার।

এত দামি একটা গাড়ি, গাড়িটার ওপর তার এত দুর্বলতা, তবু দরজায় তালা দেয়ার বা ইগনিশন থেকে চাবি সরাবার গরজ নেই অগাস্টিনের। মিলানের প্রতিটি চোর-ছ্যাঁচড় জানে কে এই গাড়ির মালিক, জানে কেউ ছুঁলে তার আর রক্ষে নেই।

শিস দেয়া বন্ধ করে ক্লাবে ঢুকল অগাস্টিন, গলাটা সত্যি শুকিয়ে গেছে। কাজে বেরিয়ে সব সময় এই ক্লাবেই প্রথমবার গলা ভেজায় সে। ক্লাবের মালিক তাকে দেখেই বারটেণ্ডারের উদ্দেশে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল। অগাস্টিন বারের সামনে

পৌঁছুবার আগেই বারটেণ্ডার তার জন্যে কাউন্টারে আধ গ্লাস স্কচ হুইস্কি রাখল। গ্লাসে আয়েশ করে চুমুক দিল অগাস্টিন, ঠাণ্ডা চোখে এদিকে ওদিক তাকাল।

পিয়ানোর মৃদু শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কয়েক জোড়া নারী-পুরুষ ধীর লয়ে নাচছে। পুরুষরা প্রায় সবাই মধ্য-বয়স্ক, ব্যবসায়ী; মেয়েগুলো হয় তাদের সেক্রেটারি, নয়ত গোপন প্রেমিকা—কারুরই বয়স পঁচিশের বেশি নয়। অত্যন্ত দামি ক্লাব এটা, শুধু ধনীলোকদের জন্যে। সুন্দরী কলগার্লরাও খদ্দের ধরার জন্যে আসে এখানে।

পাউডার রুম থেকে একটা মেয়েকে বেরিয়ে আসতে দেখল অগাস্টিন। বেশ লম্বা, মাথায় সোনালি চুল, খালি একটা টেবিলে বসে শ্যাম্পেনের গ্লাসে ছোট্ট করে চুমুক দিল। ছোট করে কাটা ব্লাউজ, ব্রা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে স্তন। মেয়েটাকে আগে কখনও দেখেনি অগাস্টিন। ঠিক করল, কাল বিকেলে ওর সঙ্গে শোবে সে।

গ্লাসে শেষ চুমুক দিল অগাস্টিন, এক তাড়া নোট নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল ক্লাব-মালিক। তাড়াটা নিয়ে নোটগুলো গুনল অগাস্টিন, ব্যাগ খুলে টাকা রাখল ভেতরে, চেইন টেনে বন্ধ করে দিল ব্যাগ। মুখ তুলে টেবিলে বসা সুন্দরী মেয়েটার দিকে চিবুক তাক করল সে, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ক্লাব-মালিকও মেয়েটার দিকে তাকাল।

'খাসা জিনিস! নতুন, না?'

'হ্যাঁ...মানে...জ্বী।'

'আমার ওখানে পাঠিয়ে দিয়ো। কাল বিকেল তিনটের সময়। মনে থাকবে?'

বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেল ক্লাব মালিক। 'সিনর!'

পেভমেন্টে বেরিয়ে এসে তাজা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিল অগাস্টিন, ল্যানসিয়ার দিকে এগোল। আরও একটু বেশি আলো থাকলে, কিংবা আরও যদি একটু সতর্ক থাকত সে, দেখতে পেত পুতুলের মাথাটা একটু একটু দুলছে।

গাড়িতে উঠে বসল অগাস্টিন, হাত বাড়াল ইগনিশনের দিকে। হঠাৎ ঘাড়ে শীতল ধাতব স্পর্শ পেয়ে স্থির হয়ে গেল হাতটা। ঠাণ্ডা একটা কণ্ঠস্বর শুনল সে, 'নোড়ো না!'

ভয় নয়, রাগও নয়, কৌতুক মেশানো বিস্ময় বোধ করল গিয়াকোমো অগাস্টিন। 'তুমি জান আমি কে?'

'গিয়াকোমো অগাস্টিন। আর যদি একটাও কথা বল, ওটাই তোমার শেষ কথা হবে।'

একটা হাত পিছন থেকে এগিয়ে এসে তার বাঁ বগলের তলায় সেঁধিয়ে গেল, হোলস্টার থেকে বের করে নিল পিস্তলটা। একেবারে পাথর হয়ে গেছে অগাস্টিন, এতক্ষণে ভয় পেয়েছে। পিছনের লোকটা তার পরিচয় জানে, টাকা ভরা ব্যাগটা

সে নিতে আসেনি। উদ্দেশ্য ডাকাতি নয়। হয়ত গামবেরি গ্রুপের সঙ্গে গোলমাল বেধেছে।

ভাবনা-চিন্তায় বাধা পড়ল। শান্ত, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার, 'এঞ্জিন স্টার্ট দাও, আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবে। কারও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা কোরো না। কখন কোন দিকে যেতে হবে আমি বলব। কোন রকম চালাকি করতে গেলে সাথে সাথে মারা যাবে।'

খুব সাবধানে গাড়ি চালাল অগাস্টিন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, এ লোক মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। নির্দেশ পেয়ে দক্ষিণ দিকে গাড়ি চালাল সে, শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলে এল। ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে সে, দ্রুত চিন্তা-ভাবনা চলছে মাথায়। এলাকার দখল নিয়ে যুদ্ধ বেধে থাকলে এতক্ষণে মারা যেত সে, হয় ক্লাবের ঠিক বাইরে, নাহয় এইমাত্র পেরিয়ে আসা নির্জন শহরতলির কোথাও। গলার আওয়াজটা তাকে বিমূঢ় করে তুলেছে। ক্ষীণ একটু নিয়াপলিটান সুর আছে, আরও কি যেন আছে অথচ ধরতে পারছে না সে। আন্দাজ করল, লোকটা ইটালিয়ান নয়। তার চিন্তা নতুন খাতে বইতে শুরু করল। মাস কয়েক আগে তার বস্, হিনো ফনটেলার সঙ্গে 'ইউনিয়ন কর্স'-এর একটা গ্রুপের বিবাদ বেধেছিল। মার্সেলেসের ওই গ্রুপের অভিযোগ ছিল, ড্রাগ শিপমেন্টে ফনটেলা নাকি কারচুপি করেছে। ওদের অভিযোগ কানে তোলেনি ফনটেলা, হুমকি দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। ওরা হয়ত হুমকি গ্রাহ্য করার বান্দা নয়। এতদিনে হয়ত তৈরি হয়েছে, এবার একহাত দেখাতে চায়। কিন্তু নিয়াপলিটান সুর কেন তাহলে?

আর অল্প দূরেই ভাইজেনটিনো! ওখানে পৌছবার আগেই একটা সাইড রোড ধরার নির্দেশ এল। এরপর মেঠো পথ। গাড়ি থেকে ওরা যখন নামবে, একটা ঝুঁকি নেয়া যায় কিনা দেখবে অগাস্টিন। তখন ওর ঘাড়ের ওপর পিস্তল থাকবে না। লোকটা কি জানে, তার এই বিশাল শরীরেও প্রয়োজনে বিদ্যুৎগতি খেলে যায়?

হেডলাইটের আলোয় নিচু একটা বাংলো দেখা গেল। এ-ধরনের সৌখিন কটেজ সাধারণত মিলানিজরা তৈরি করে, ছুটিছাঁটাতে এসে মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করবে বলে। নির্দেশ পেয়ে বাংলোর পিছন দিকে গাড়ি নিয়ে এল অগাস্টিন। চাকার নিচে কাঁকর পেষার আওয়াজ।

'থাম এখানে। হ্যাণ্ডব্রেক দাও। ইগনিশন অফ কর।'

সামনের দিকে ঝুঁকল অগাস্টিন, ঠাণ্ডা পিস্তল তবুও ঘাড়ে লেগে থাকল। ধীরে ধীরে সিটে হেলান দিল সে। হঠাৎ করেই ঘাড়ের ওপর থেকে সরে গেল চাপটা। তার পেশীতে টান পড়ল, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হল তার দৃষ্টি।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল তার, মাথার পিছনে ব্যথা, দপ দপ করছে। ব্যথার জায়গাটা হাত দিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করল সে, কিন্তু হাতটা নাড়তে পারল না।

তার চিবুক বুকে ঠেকে আছে, দৃষ্টি পরিষ্কার হতে দেখল, বাঁ হাতটা চেয়ারের হাতার সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকানো। অনেক কষ্টে মাথাটা ডান দিকে ফেরাল সে, একইভাবে টেপ দিয়ে আটকানো ডান হাতটাও। সারা শরীর একটা ঝাঁকি খেল, এক নিমেষে সব কথা মনে পড়ে গেছে। সন্ত্রস্ত, সেই সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে মাথা তুলে প্রথমে একটা কাঠের টেবিল দেখল। টেবিলের ওপর ছাড়াছাড়া ভাবে কয়েকটা জিনিস রাখা রয়েছে। একটা হাতুড়ি, বড় সাইজের দুটো ইস্পাতের পেরেক, পেরেকের পাশে ভারি একটা ছুরি, এক ফুট লম্বা একটা মেটাল রড। রডের এক প্রান্ত থেকে একটা ইলেকট্রিক কর্ড বেরিয়ে এসে টেবিলের কিনারা দিয়ে নেমে চোখের আড়ালে চলে গেছে। চোখ দুটো আরও একটু ওপরে তুলল সে। টেবিলের ওপারে, একটা চেয়ারে বসে আছে লোকটা। বয়স্ক লোক, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স, চোখ দুটো কুঁচকে আছে। এই লোককে কোথায় যেন দেখেছে সে!

লোকটার সামনে, টেবিলের কিনারায়, খোলা একটা নোটবুক আর কলম রয়েছে, কলমের পাশে চওড়া এক রোল অ্যাডহেসিভ টেপ।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল অগাস্টিন, ব্যথাটা বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। 'যেই হও তুমি, এর জন্যে তোমাকে ভুগতে হবে।'

তার কথা অগ্রাহ্য করে টেবিলের জিনিসগুলো ইঙ্গিতে দেখাল লোকটা। 'ভাল করে দেখ তোমার সামনে এগুলো কি রয়েছে, তারপর মন দিয়ে শোন।'

'কে তুমি?' হিস হিস করে জিজ্ঞেস করল অগাস্টিন, ব্যথা সহ্য করার জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে।

জবাব না দিয়ে লোকটা বলল, 'অনেকগুলো প্রশ্ন করব। প্রতিটি প্রশ্নের পুরোপুরি উত্তর দেবে, আর সত্যি কথা বলবে।'

'ইউনিয়ন কর্স?' অস্থির হয়ে জানতে চাইল অগাস্টিন। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে শত্রুর পরিচয় না জানার চেয়ে বড় অশান্তি আর নেই।

'উত্তর যদি মিথ্যে আর অসম্পূর্ণ হয়, টেপ খুলে তোমার বাঁ হাত টেবিলে রাখব, তারপর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে একটা পেরেক গাঁথব উল্টো পিঠে।'

শিউরে উঠল অগাস্টিন। 'তোমাকে আমি আগে কোথাও দেখেছি—কোথায়?'

'তারপর ছুরিটা দিয়ে তোমার আঙুল কাটব,' লোকটা বলে চলেছে, 'একটা একটা করে।'

ছুরির দিকে তাকাল অগাস্টিন।

'ভয় নেই, রক্ত পড়ায় তুমি মারা যাবে না,' বলল লোকটা। একটা আঙুল তুলে মেটাল রডটা দেখাল সে। 'এটা একটা শোল্ডারিং-আয়রন। কাটা আঙুল জোড়া লাগিয়ে ঝালাই করে দেব ক্ষতগুলো।'

দরদর করে ঘামছে অগাস্টিন। লোকটা সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে, চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব।

'তবু যদি কথা না বল, তোমার ডান হাত ধরব। এরপর পা, প্রথমে…'

অনেক নিষ্ঠুর লোকের মত, গিয়াকোমো অগাস্টিনও আসলে কাপুরুষ। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে উপলব্ধি করল, শুধু ভয় দেখাচ্ছে না, এই লোক প্রতিটি কাজ করে দেখাবে। কিন্তু কেন? কে ও? কোথায় ওকে দেখেছে সে?

অসহায় বোধ করল অগাস্টিন, রেগে উঠে ভয় তাড়াবার চেষ্টা করল। 'জাহান্নামে যাও তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল সে, অশ্লীল গাল পাড়তে শুরু করল। কিন্তু আচমকা চুপ মেরে গেল সে, লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে।

টেপের রোল হাতে নিল লোকটা। খানিকটা খুলে ছিঁড়ল, এগিয়ে এল টেবিল ঘুরে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল অগাস্টিন, কিন্তু আওয়াজ বেরুবার আগেই তার মুখে চেপে বসল টেপ। আলোর একটা ঝলকের মত লাগল লোকটার ডান হাত, পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল অগাস্টিন, চোখে শর্ষে ফুল দেখল। দ্বিতীয় ঘুসিটা লাগল চোয়ালে, চেয়ারের পিঠে থেঁতলে গেল আহত মাথা।

কোনরকমে জ্ঞানটুকু থাকল তার, সারা শরীর অবশ, স্নায়ুগুলো ভোঁতা। অস্পষ্টভাবে বুঝল তার বাঁ হাত মুক্ত করা হয়েছে, টেনে লম্বা করা হয়েছে সামনের দিকে। এক মুহূর্ত পর অসহ্য যন্ত্রণায় তার শরীর ধনুকের মত বেঁকে গেল, জ্ঞান হারাল সে।

দ্বিতীয়বার জ্ঞান ফেরার পর মাথার দপদপে ব্যথাটা অনুভব করল না অগাস্টিন। মনে হল বাঁ হাতে আগুন জ্বলছে। চোখ খুলে হাতের দিকে তাকাল সে, টেবিলের ওপর চিৎ করে রাখা। তালু ফুটো করে টেবিলে গেঁথে রয়েছে পেরেকটা। আঙুলের ফাঁক গলে গড়িয়ে নামছে রক্ত, টেবিলের ওপর কয়েক জায়গায় জমেছে বেশ অনেকটা করে।

চোখে দেখা দৃশ্যটা অবিশ্বাস করতে চাইল তার মস্তিষ্ক, কিন্তু এক চুল নড়তেই তীব্র ব্যথার পাগল করা ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়তে শুরু করল সারা শরীরে। টেপ দিয়ে মোড়া মুখ থেকে ভোঁতা একটু গোঙানির আওয়াজ বেরুল। চোখ দেখে বোঝা যায়, আতঙ্ক তাকে গ্রাস করেছে। নিষ্ঠুরতা নয়, অগাস্টিনকে আতঙ্কিত করে তুলেছে লোকটার শান্ত-নির্লিপ্ত ভাব-ভঙ্গি—একজন মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে অথচ সে-ব্যাপারে তার কোন অনুভূতি নেই, এমনকি ব্যাপারটা উপভোগও করছে না।

ঠাণ্ডা চোখ দুটোর দিকে আবার তাকাল সে। পলক নেই, একবারও পলক ফেলতে দেখেনি ওকে। এখনও কোন ভাব নেই চেহারায়। আবার লোকটা চেয়ার

ছাড়ল, টেবিল ঘুরে এগিয়ে এল। শিউরে উঠে আহত পশুর মত পিছিয়ে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করল অগাস্টিন। লক্ষণ দেখে বোঝা যায়, বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে তার। ঘন ঘন মাথা নাড়ার মানে হল নিঃশব্দে করুণা ভিক্ষা চাইছে। গলার ভেতর ঘড়ঘড় আওয়াজ। লোকটা মুঠো করে ধরল তার মাথার চুল। মাথাটা স্থির করে রেখে একটানে খুলে নিল মুখের টেপ। বমি করতে শুরু করল অগাস্টিন, কিন্তু সেদিকে খেয়াল না দিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল ও।

থরথর করে কাঁপছে অগাস্টিন, ভয়ে আর ব্যথায়।

একটু শান্ত হতে অনেক সময় নিল ঘোড়ামুখো। ঘাম, চোখের পানি, বমি আর রক্ত, তার শরীর থেকে তরল পদার্থ বেরিয়ে যাচ্ছে। পেরেক গাঁথা বাঁ হাত, শোল্ডারিং-আয়রন, আর ছুরি—পালা করে এই তিনটের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার দৃষ্টি। মুখের থুথু আর ফেনা গিলে নিয়ে কথা বলল সে, কোন রকমে শোনা গেল, 'কি চাও তুমি?'

নোটবুক টেনে নিয়ে কলমটা খুলল ও। 'লুবনা কিডন্যাপিং দিয়ে শুরু কর।'

মুহূর্তে চেহারাটা মনে পড়ল অগাস্টিনের।

এক ঘন্টার বেশি ধরে জেরা চলল। শুধু একবার, হিনো ফনটেলার প্রসঙ্গ উঠতে, ইতস্তত করল অগাস্টিন; কিন্তু হাতের কলম রেখে রানা আবার চেয়ার ছাড়তে যাচ্ছে দেখে গড় গড় করে জবাব দিতে শুরু করল সে।

কিডন্যাপের ঘটনা দিয়ে শুরু করল সে। গাড়িটা চালাচ্ছিল অগাস্টিন। প্রথমেই সে হড়বড় করে বলে নিল, বডিগার্ডকে গুলি করেছিল এলি, সে নয়। বাকি দু'জন ছিল চারিন আর সাইমিয়ানো, গুলি খাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

দাবি করা টাকা সম্পর্কে কিছুই জানে না অগাস্টিন। ওদেরকে শুধু নির্দেশ দেয়া হয়, নির্দিষ্ট একটা সময়ে, নির্দিষ্ট একটা জায়গা থেকে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে এসে নিগুয়াডা-র একটা বাড়িতে আটকে রাখতে হবে।

শুরুতেই গোটা ব্যাপারটা লেজেগোবরে হয়ে যায়। হিনো ফনটেলা ওদেরকে অভয় দিয়ে বলেছিল মেয়েটার সঙ্গে একজন বডিগার্ড থাকবে বটে, কিন্তু সে তেমন কোন কম্মের নয়, ওদের জন্যে কোন সমস্যার সৃষ্টি করবে না। চারিনের ওপর নির্দেশ ছিল, ফাঁকা দুটো গুলি করবে সে, তাহলেই বডিগার্ড ভয় পেয়ে পালাবে। কাজেই ওরা সবাই কাজটাকে হালকাভাবে নিয়েছিল, কেউই তেমন সতর্ক ছিল না।

'মেয়েটাকে রেপ করল কে?'

'এলি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল অগাস্টিন। চারিন মারা যাওয়ায় তার মাথায় আগুন ধরে যায়, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ওরা। তাছাড়া, ছোট মেয়েদের ওপর বরাবরই তার খুব লোভ। এই মেয়েটা আবার ধস্তাধস্তি করার সময় তার মুখে খামচি

দেয়…।' নার্ভাস ভঙ্গিতে জিভের ডগা দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল সে।

'আর তুমি?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি ওকে রেপ করনি?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল অগাস্টিন, তারপর অনেকটা যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই ওপর নিচে মাথা দোলাল, কথা বলার সময় কাঁপা কাঁপা লাগল তার কণ্ঠস্বর, 'হ্যাঁ…মানে, এলির পর। ভাবলাম যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তাই আমিও…।' টেবিলের ওপর দিয়ে যমদূতের দিকে তাকাল সে। স্থির পাথর হয়ে আছে রানা। অগাস্টিনের মনে হল, লোকটার মন যেন এখানে নেই, অন্য কোথাও চলে গেছে। আবার শুরু হল জেরা।

'আর কেউ?'

মাথা নাড়ল অগাস্টিন। 'মেয়েটার সঙ্গে আমরা এই দু'জনই ছিলাম। সময় কাটতে চাইছিল না, সাংঘাতিক একঘেয়ে লাগছিল—আমরা ভেবেছিলাম দু'এক-দিনের মধ্যে সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু দাবির টাকা নিয়ে কি যেন একটা গোলমাল দেখা দেয়, বাড়িটায় আমরা দু'হপ্তা আটকা পড়ে গেলাম।'

'তাই তোমরা ওকে বারবার রেপ করলে?'

ধীরে ধীরে নিচু হল অগাস্টিনের মাথা, চিবুক বুকে ঠেকল, ঘামে চকচক করছে চওড়া কপাল। অস্ফুট, কর্কশ শোনাল তার গলা, 'হ্যাঁ…মানে, তেমন কিছু করার ছিল না আমাদের…আর মেয়েটা ছিল খুব সুন্দরী…'

ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল তার কণ্ঠস্বর, মুখ তুলে দেখল টেবিলের ওপার থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে মৃত্যুদূত।

'ফনটেলা? সে কি বলল?'

'উনি খেপে যান। মেয়েটা মারা গেল, সে তো আমাদের কোন দোষ না, স্রেফ একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু উনি কোন কথাই শুনলেন না। প্রত্যেকের আমাদের দশ মিলিয়ন লিরা করে পাবার কথা ছিল, কিন্তু উনি আমাদের কিছুই দিলেন না।'

নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা, 'টাকা দিল না—ব্যস, এইটুকুই শাস্তি?'

অগাস্টিনের চিবুক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম পড়ছে বুকে, মাথা ঝাঁকাল সে। 'একদিক থেকে আমরা ভাগ্যবান, কারণ বস্ ফনটেলার ভাগ্নে হয় এলি। আমাকে শাস্তি দিলে ভাগ্নেকেও দিতে হয়, তাই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলেন না।'

কলম তুলে নিল রানা। 'হ্যাঁ,' মৃদু গলায় বলল ও। 'ভাগ্যবানই বটে। এবার এলি সম্পর্কে বল।'

এলি সম্পর্কে যা কিছু জানে অগাস্টিন, সব বের করে নিল রানা। কারা তার বন্ধু, তার গতিবিধি, তার অভ্যেস—কিছুই বাদ দিল না। এরপর হিনো ফনটেলা প্রসঙ্গ। একে একে সব জেনে নিল রানা।

জেরার এক পর্যায়ে অগাস্টিন অভিযোগ করল, হাতের ব্যথা সে আর সহ্য

করতে পারছে না।

'আর বেশি দেরি নেই,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। 'এবার ডন বেরলিংগার আর ডন বাকালার কথা বল।'

কিন্তু এই মহারথীদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না অগাস্টিন। যতদূর শুনেছে, ডন বাকালা তাঁর ভিলা কোলাসি থেকে কদাচ বের হন। না, অগাস্টিন তাঁকে কখনও দেখেনি।

'তবে আমার বস্ সিনর ফনটেলা ভিলা কোলাসিতে ঘন ঘন যান, প্রতি মাসে একবার তো বটেই। বস্ রোমেও যান, ডন বেরলিংগারের কাছে।'

আর কোন প্রশ্ন নেই। নোটবুক বন্ধ হল, ক্যাপ লাগানো হল কলমে।

অগাস্টিনের আতঙ্ক মাথাচাড়া দিতে শুরু করল। আবার সে কথা বলছে, বক বক করে যাচ্ছে বেরলিংগার আর বাকালাকে নিয়ে, কিন্তু তার কথায় রানার আর কোন আগ্রহ নেই। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও, হাত ঢোকাল জ্যাকেটের ভেতর। ওর হাতে পিস্তল দেখে অগাস্টিনের বকবকানি থেমে গেল। এখন সে তার শরীরে কোথাও কোনরকম ব্যথা অনুভব করছে না। তার সামনে দাঁড়িয়ে পিস্তলের মাজলে সাইলেন্সার ফিট করছে রানা, সম্মোহিতের মত সেদিকে তাকিয়ে আছে সে। টেবিল ঘুরে এগিয়ে এল রানা। ওর চেহারায় কোন ভাব নেই, ঠাণ্ডা চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি।

সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে থাকল অগাস্টিন, ওটাকে তার বেঢপ আর কুৎসিত লাগল। দেখল, পিস্তলটা ওর দিকে তোলা হল। এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে!

চোখের পাপড়িতে পিস্তলের স্পর্শ পেল অগাস্টিন। চোখ বন্ধ করল সে। তার বন্ধ ডান চোখের ওপর চেপে বসল ঠাণ্ডা ইস্পাত। শেষবারের মত ভারি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।

'নরকে যাচ্ছ, অগাস্টিন—ওখানে তোমার সঙ্গে আর সবার দেখা হবে।'

গিদা'স-এ ভিড় দেখলে মনে হবে, সুপুরুষ আর সুন্দরীদের মেলা বসেছে। শুক্রবার দুপুরের পরিচিত পরিবেশ, ঢিলেঢালা ভাব নিয়ে লাঞ্চে বসে ভোজন রসিকরা গালগল্প করছে।

পিছনের অ্যালকোভ টেবিলে একা বসে খাচ্ছেন বার্নাদো গুগ্লি। বাইরে কোথাও খেতে বসলে সংখ্যায় দু'জন হওয়া চাই, প্রাচীন এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী তিনি—কিন্তু, খাচ্ছেন আজ একা।

সুদর্শন চেহারাই তাঁকে আর সবার চেয়ে আলাদা করে তোলে। কাপন ম্যাগ্রো খাচ্ছেন তিনি, অন্যান্য টেবিল থেকে রূপসী মেয়েরা চোরা চোখে বারবার দেখে নিচ্ছে তাঁকে। সুন্দরভাবে কাটা গাঢ় খয়েরি স্যুট পরে আছেন, আকাশি নীল শার্ট, সঙ্গে চওড়া তামাটে লাল সিল্ক টাই। কাফ লিঙ্ক আর প্যাটেক ফিলিপ হাতঘড়ি

থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো।

একটু সরু, রোদে ঝলসানো মুখ; প্রায় ঈগলের মত খাড়া নাক। এমনকি পুরুষরাও একবার তাকালে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে পারছে না। সবার মনেই কৌতূহল, কি উনি? সফল একজন অভিনেতা, প্রখ্যাত কোন ফ্যাশন ডিজাইনার, নাকি ইন্টারন্যাশনাল প্লে-বয়?

আসলে তিনি একজন পুলিস অফিসার। যদিও তাঁর মা, একজন অভিজাত মহিলা, কথাটা শুনে নাক কোঁচকাবেন, তড়িঘড়ি শুদ্ধ করে দিয়ে বলবেন, 'কারাবিনিয়ারিতে ও একজন কর্নেল।' কথাটা সত্যি। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে এই পদে খুব কম অফিসারই উঠতে পারে।

বার্নাদো গুগলি পুলিসের চাকরি বেছে নেয়ায় সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর মা। ছেলেকে তিনি চেনেন, জানেন রাজনীতি বা ব্যবসার লাইনে গেলে ছেলে তাঁর জাদু দেখিয়ে দিত। একইভাবে তাঁর বড় ছেলেও তাঁকে হতাশ করে। ডাক্তারী পড়া শেষ করে। সে এখন একজন সফল সার্জেন। মায়ের ধারণা, পেশাটা মন্দ নয়, কিন্তু বড়ই নিরস। এরচেয়ে পুলিসের চাকরি তবু ভাল। বার্নাদো গুগলি নিজেও মাঝে মধ্যে ভাবেন, কারাবিনিয়ারিতে তিনি কেন এলেন । হয়ত তাঁর অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মনই এর জন্যে দায়ী। কিংবা অন্যায়ের ভেতর কখনও কখনও ন্যায় থাকলেও সেদিকে কারও কোন খেয়াল থাকে না দেখে তাঁর বিবেক বিদ্রোহ করে ওঠে, তাই এ পথ বেছে নিয়েছেন—সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখবেন এ-ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা।

তাঁর শত্রুরাও একবাক্যে স্বীকার করবে, তিনি একজন ভাল পুলিস অফিসার। সততা, এবং ব্যক্তিগত বিশাল সয়-সম্পত্তি থাকায় দুর্নীতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ক্ষুরের মত ধারাল বুদ্ধি, অঢেল প্রাণচাঞ্চল্য, আর মানুষের মন বোঝার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁকে একজন সফল পুলিস অফিসার হিসেবে গড়ে তুলেছে।

তাঁর জীবনের চারটে দুর্বলতার একটা হলো এই চাকরি। বাকি তিনটে—ভাল খাবার, সুন্দরী মহিলা, আর ব্যাকগ্যামন। বার্নাদো গুগলির দৃষ্টিতে আদর্শ একটা দিন বলতে বোঝায়ঃ দিনের শুরুতেই তদন্তে নেমে চমকপ্রদ একটা সূত্র আবিষ্কার, দুপুরে মিলানের সেরা কোন রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ, বিকেলে অফিসে বসে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পাঠ, তারপর রাতে মনের মত ডিনারের জন্যে নিজের হাতে রান্নাবান্না, সেই রান্না মনের মত কোন সুন্দরী মেয়েকে খাওয়ানো, সেই মেয়ের অন্তত এইটুকু বুদ্ধি থাকতেই হবে যাতে ব্যাকগ্যামন খেলায় দু'একবার সে তাঁকে ভড়কে দিতে পারে। এবং সবশেষে, মেয়েটিকে নিয়ে বিছানায় যাওয়া।

গত চার বছর চাকরি জীবন তাঁর ভালই কেটেছে। তিনি অনুরোধ করেছিলেন, কর্তৃপক্ষ সাড়া দিয়ে তাঁকে নতুন একটা ডিপার্টমেন্টে বদলি করেছেন। এই ডিপার্টমেন্ট সংঘবদ্ধ অপরাধীদের পিছনে লেগে আছে।

অর্গানাইজড ক্রাইমের ধরন, আর মাহাত্ম্য বোঝার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তিনি, মাসের পর মাস ফাইল পড়েছেন, এবং মাফিয়া চক্রের জটিল সাংগঠনিক গোপনীয়তা সম্পর্কে যতই জেনেছেন ততই বিস্মিত হয়েছেন।

তাঁর প্রথম তিন বছর কেটেছে গবেষণায়। তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেগুলো যাচাই করেছেন, ভুল হলে বাতিল করেছেন, একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়েছেন, তথ্যের সঙ্গে যোগ করেছেন নাম আর চেহারা। দক্ষিণ এবং উত্তরের শহরগুলো থেকে আসা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে মিল খুঁজেছেন—মিলানের একটা নারী ব্যবসায়ী চক্রের সঙ্গে কালাব্রিয়ার মদ চোলাইকারী দলের বা নেপলসের ড্রাগ-স্মাগলারদের কি সম্পর্ক জানতে চেষ্টা করেছেন।

তিন বছর পর ইটালিয়ান মাফিয়া সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন বার্নাদো গুগলি। মাফিয়ার বাইরে থেকে মাফিয়া সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তাঁর সহকারী, ক্যাপ্টেন কোসিমা পাধানি একবার ঠাট্টা করে বলেছিল, তিনি যদি কখনও দল বদল করেন, প্রথম দিনই নতুন কাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন।

গত এক বছর ধরে এই জ্ঞান কাজে লাগাচ্ছেন গুগলি। হুকুমদখল করা জমির ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত একটা জালিয়াতির ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে রেগিয়োর ডন ব্যামবিনো ফেটুচিনিকে তিনি কোণঠাসা করে ফেলেন। এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর যোগসাজশে গরীব মানুষদের বিস্তর জমি হুকুমদখল করায় ফেটুচিনি, তাদেরকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়, তারপর সমস্ত জমি আরও একশো গুণ কম দরে নিলামে কিনে নেয় সে। দু'বছরের জেল হয় তার। মাস কয়েক ধরে মিলানের প্রধান দুটো পরিবারের ওপর নজর রাখছেন গুগলি, এ-দুটোর কর্তা হল ডন গামবেরি, আর ডন ফনটেলা। নারী-ব্যবসা, ড্রাগ স্মাগলিং, আর ছিনতাই, এই তিন ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ওরা। ধীরে ধীরে প্রমাণ আর সাক্ষী যোগাড় করছেন গুগলি। ওদের টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করেছেন, ওদের দলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন নিজের লোক; কর্তাদের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছেন। দু'এক বছরের মধ্যে তাঁর হাতে যথেষ্ট প্রমাণ জমা হবে, আশা করছেন দু'চারটে রুই-কাতলাকে আটকাতে পারবেন তিনি, তাদের মধ্যে সম্ভবত গামবেরি আর ফনটেলাও থাকবে।

এদের বিরুদ্ধে লেগে থাকা তাঁর জন্যে অনেক সহজ হয়ে গেছে, কারণ সাধারণ মানুষ এখন অত্যাচারী মাফিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার। যদিও অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে এখনও অনেক দেরি। কারাদণ্ড এদের জন্যে কোন শাস্তিই নয়, অর্থাৎ আইন পাল্টানো দরকার। সাক্ষী পাওয়া এখনও সাংঘাতিক কঠিন, আরও কঠিন সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তবে, একটু একটু করে পরিস্থিতি ভাল হচ্ছে। বড় ধরনের কোন অপরাধ হতে দেখলেই মাফিয়ার বিরুদ্ধে আরও একটু

বেশি খেপছে মানুষ।

লাঞ্চের পর তরুণী এক অভিনেত্রীর কাছে যাবেন। কাল সন্ধের এক পার্টিতে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়। জাপানী পুতুলের মত গড়ন, ছোটখাট, চোখ ধাঁধানো রূপ। খুশির খবর, মেয়েটি ব্যাকগ্যামন খেলে। তাঁকে দাওয়াত দিয়েছে, দু'এক দান খেলা হবে। সেই আনন্দেই আজ তিনি লাঞ্চে বসে ডেজার্টের জন্যে জিলাটো ডি টুটি ফ্রুটি-র অর্ডার দিয়ে ফেললেন।

মিষ্টি খাবার মুখ তাঁর, বিশেষ করে ফল আর আইসক্রীমের সঙ্গে মিষ্টি খেতে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু যে লোক শরীরের যত্ন নেয়, সে কখনও পেটে চর্বি জমতে দিতে পারে না, তাই হপ্তায় মাত্র রোববারে ডেজার্ট খান তিনি। সত্যি বলতে কি, নিজেকে তিনি চিট করছেন, কারণ আজ মাত্র শুক্রবার। আসলে বিকেলে মেয়েটার সঙ্গ পাবেন এই আনন্দে উদার হয়ে পড়েছেন তিনি।

হেডওয়েটার এগিয়ে এল। কিন্তু ডেজার্টের বদলে তার হাতে ফোনের রিসিভার। 'আপনার অফিস, কর্নেল।'

কথা বলল কোসিমো পাধানি, তাঁর সহকারী। কিছুক্ষণ শোনার পর তিনি বললেন, 'আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব ওখানে।' টেবিলে রিসিভার রেখে হেড-ওয়েটারকে ডাকলেন তিনি, গাম্ভীর্যের সঙ্গে ডেজার্টের অর্ডার বাতিল করে দিলেন। এরপর তিনি ফোন করলেন তরুণী অভিনেত্রীকে, আজ ওঁদের দেখা হচ্ছে না। মেয়েটার কথায় মনে হল, মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে সে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গুগলি জানালেন, রোববারে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে ওর জন্যে নিজের হাতে ডিনার তৈরি করবেন তিনি। বিল মেটাবার সময় হেডওয়েটারকে বললেন, কাপন ম্যাগ্রোতে রোজমেরী একটু বেশি হয়ে গেছে।

মিলান তুরিন মটর ওয়ের পাশেই একটা ডোবা, রাস্তা থেকে ত্রিশ মিটার দূরে। অনেকগুলো নর্দমা চারদিক থেকে এসে নেমেছে এই ডোবায়। আবর্জনার ওপর চিৎ হয়ে ভাসছে গিয়াকোমো অগাস্টিনের লাশ। রাস্তার পাশে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর কয়েকটা পুলিস কার দেখা গেল। স্ট্রেচারের ওপর ভাঁজ করা রয়েছে বড়সড় কালো একটা প্লাস্টিক ব্যাগ। একজন পুলিস ফটোগ্রাফার ঘুরেফিরে ছবি তুলছে।

সহকারী পাধানির পাশে দাঁড়িয়ে লাশের দিকে তাকিয়ে আছেন গুগলি, ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গ মেশানো ক্ষীণ একটু হাসির রেশ। 'একজন কালেক্টরকে কালেক্ট করা হয়েছে, তাই না?'

'কাল রাতে কোন এক সময়,' বলল পাধানি। 'লাশ পাওয়া গেছে ঘন্টাখানেক আগে।'

'চোখে একটা মাত্র বুলেট,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন গুগলি। 'ব্যস, ফুরিয়ে গেল সব।'

'হ্যাঁ—একেবারে ক্লোজ রেঞ্জ থেকে।' লাশের মুখের দিকে আঙুল তুলল পাধানি। 'চোখের চারপাশে পোড়া দাগ। ঠিক পাতার ওপর মাজল চেপে ধরে ট্রিগার টানা হয়েছে।'

'এ যেন খুনীর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ। ওর হাতে কি হয়েছিল?'

তীক্ষ্ণ চোখে লাশের হাতের দিকে তাকাল পাধানি। 'ফুটো করা হয়েছে হাতটা।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কি দিয়ে···বলতে পারব না।'

ফটোগ্রাফার এসে তার প্রাথমিক কাজ শেষ করল। একজন পুলিস এগিয়ে এসে জানতে চাইল, 'কর্নেল, লাশ এবার নিয়ে যেতে পারি?'

'হ্যাঁ,' বললেন গুগলি। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যাথোলজিস্টের রিপোর্ট চাই আমি।'

পানির ওপর আধ হাত পুরু হয়ে আবর্জনা জমে আছে, লাশ তাই ডোবেনি। ডোবার কিনারায় দাঁড়িয়ে একজন অ্যাম্বুলেন্স কর্মী প্লাস্টিক ব্যাগের ভেতর লাশ ঢোকাতে শুরু করল। নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন গুগলি, পিছু নিল পাধানি।

'আপনার কি ধারণা, স্যার, আবার একটা যুদ্ধ শুরু হল?'

গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন গুগলি, মনে মনে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাখ্যা পাবার চেষ্টা করছেন। তিনটে সম্ভাবনা দেখতে পেলেন তিনি। এলাকার দখল নিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে পারে ফনটেলা আর গামবেরি। এর সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ ব্যবসায়িক স্বার্থেই শহরটাকে তারা নিজেদের মধ্যে নিখুঁতভাবে ভাগ করে নিয়েছে, কেউ কারও ব্যাপারে নাক না গলিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে ওরা। তাছাড়া, যুদ্ধ করতে হলে প্রথমে বেরলিংগার, তারপর বাকালার সম্মতি আদায় করতে হবে ওদের, কিন্তু এই মুহূর্তে তারা কোন যুদ্ধ চায় না। আরেকটা সম্ভাবনা, আদায়করা টাকা হয়ত মেরে দিচ্ছিল অগাস্টিন, ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু এ-ও প্রায় অসম্ভব। পনেরো বছর ধরে এই কাজ করছে অগাস্টিন। লোকটা হয়ত বোকা ছিল, কিন্তু তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কখনও কোন প্রশ্ন ওঠেনি। আরেক হতে পারে, কাজটা বাইরের কারও।

কে সে?

কেন?

কাঁধ ঝাঁকালেন গুগলি, গাড়িতে উঠে বসলেন। সহকারীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, 'অগাস্টিনের ফাইল চাই আমি। গত বাহাত্তর ঘন্টায় আড়িপাতা যন্ত্রে যা ধরা পড়েছে সব লিখে আমার কাছে পাঠাবে।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পাধানি।

গুগলি বললেন, 'সন্ধেয় কোন প্রোগ্রাম থাকলে বাতিল করে দাও।' তাঁর চেহারায় অস্বস্তির একটা ছায়া পড়ল। 'আমারটা আমি আগেই বাতিল করে দিয়েছি।' এক সেকেণ্ড চিন্তা করলেন তিনি। 'রেড লিস্টে যারা আছে তাদের ওপর

নজর রাখার ব্যবস্থা আরও জোরদার কর।'

এঞ্জিন চালু হল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললেন, 'অফিসে দেখা হবে।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গাড়িটার চলে যাওয়া দেখল পাধানি। তিন বছর ধরে ওঁর সহকারী হিসেবে কাজ করছে সে। প্রথম দিকে, প্রায় পুরো একটা বছর ধরে, এই মানুষটার কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একটা ঝোঁক ছিল তার মধ্যে। কিন্তু বদলি হতে চাইলে সঙ্গত কারণ দেখানো চাই।

কর্নেল গুগলিকে যে সে পছন্দ করেনি তা নয়। ভদ্রলোক তাকে শুধু ভয়ঙ্কর একটা অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বদলির আবেদন জানাবার জন্যে কোন কারণই সে খুঁজে বের করতে পারেনি। তাঁর শ্লেষ মেশানো মন্তব্য, হঠাৎ কঠোর হয়ে ওঠা, নায়কসুলভ সুন্দর চেহারা, এমনকি বংশ গৌরবও পাধানির জন্যে কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি। তার অস্বস্তি লাগার কারণ ছিল, একজন সিনিয়র কারাবিনিয়ারি অফিসারকে যা কিছু মানায় না বলে তার ধারণা, সেগুলো সবই রয়েছে কর্নেলের মধ্যে। বলা কঠিন পাধানি হয়ত নিজেও জানে না যে সে সম্ভবত ঈর্ষা করে তাঁকে।

দুটো কারণে পালিয়ে যাবার ঝোঁকটা তার মন থেকে দূর হয়ে যায়। এক বছর কাজ করে হঠাৎ পাধানি তার বসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অসাধারণ স্মরণশক্তির পরিচয় পেয়ে যায়। এই গুণ দুটো কর্নেলের মধ্যে আগে থেকেই ছিল, কিন্তু এতদিন তার চোখে পড়েনি। দ্বিতীয় কারণ ছিল, তার বোন। ডাক্তারী পড়ার জন্যে কাটানযারো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চায় সে, তার রেজাল্টও ভাল, কিন্তু ওপর মহলের কারও সঙ্গে ওদের পরিবারের দহরম-মহরম ছিল না। তার আবেদন বিবেচনা না করেই বাতিল করে দেয়া হয়। পাধানির ঠিক মনে নেই, কথায় কথায় অফিসে হয়ত ঘটনাটা বলেছিল সে। কোথাও কিছু নেই, এক হপ্তা পর পাধানির বোন ইউনিভার্সিটি থেকে একটা চিঠি পেল, কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলেছেন। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শুরু করার পরই শুধু তার বোন জানতে পারে, কে এক প্রফেসর গুগলি, নেপলসের কারদারেলি হাসপাতালের সিনিয়র সার্জেন, তার ব্যাপারে নাকি সুপারিশ করেন।

প্রসঙ্গটা একদিন তুলল পাধানি।

বিস্মিত দেখাল কর্নেলকে। বললেন, 'কি আশ্চর্য! তুমি আমার সঙ্গে কাজ কর, তোমার সুবিধে-অসুবিধে আমি দেখব না তো কে দেখবে!'

বদলি হবার চিন্তাটা সেই মুহূর্তে বাতিল করে দেয় পাধানি। কর্নেল উপকার করেছেন বলে নয়। তাঁর প্রকাশভঙ্গিটা ওর ভাল লেগেছিল। তুমি কাজ কর আমার 'সঙ্গে,' আমার 'জন্যে' নয়।

তারপর দু'বছর ধরে চমৎকার একটা টিম হিসেবে কাজ করছে ওরা। এখনও আগের মতই আছেন কর্নেল, তাঁর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের ধার এতটুকু কমেনি,

মাঝেমধ্যে অসম্ভব একগুঁয়ে হয়ে ওঠেন, এবং কোনরকম দ্বিধা না করেই বলা যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও যেন সুপুরুষ ও সুদর্শন হয়ে উঠেছেন তিনি। কিন্তু ভেতরের মানুষটাকে এখন বুঝতে পারে পাধানি, সেই সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু অভ্যেস আর আচরণ অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আগের চেয়ে খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে, বেশি ভাড়া দিয়ে ভাল ফ্ল্যাটে থাকে, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করে। শুধু ব্যাকগ্যামন খেলাটা তার ধাতে সয় না।

প্যাথোলজিস্টের রিপোর্টটা জটিল পরিভাষার সাহায্যে লেখা, তাই প্রথমে একবার পড়ে নিয়ে সহজ করে পরিবেশন করছে পাধানি। 'মৃত্যুর সময়ঃ মাঝরাত থেকে সকাল ছ'টা, তেরো তারিখ।'

রিভলভিং চেয়ারে দোল খেতে খেতে গুগলি জানতে চাইলেন, 'পিসমেকার থেকে মাঝরাতে বেরোয় ও, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল পাধানি, ডেস্কের এ-ধারে একটা চেয়ারে সিধে হয়ে বসে আছে সে। 'তাই তো বলছে ওরা। কিন্তু রেডসানে পৌঁছায়নি সে। পিসমেকার থেকে ওখানেই তার যাবার কথা ছিল।'

'পড়।'

'মৃত্যুর কারণঃ বুলেট ঢুকে ব্রেন ছাতু করে দিয়েছে। গুলি করা হয় ডান চোখের ওপর পিস্তল ঠেকিয়ে। চোখের চারপাশে গানপাউডারের দাগ ছিল। মাথার পিছন দিকে বড় একটা গর্ত করে বেরিয়ে গেছে বুলেট, তারমানে বড় ক্যালিবারের নরম নাকের বুলেট ছিল ওটা।'

'হাতের কথা কি লিখেছে?' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন গুগলি।

'ধারাল, কিংবা ছুঁচাল কিছু হাতের উল্টো পিঠে গাঁথা হয়, সেটা তালু ফুটো করে অপরদিকে বেরোয়। কাঠের সূক্ষ্ম গুঁড়ো পাওয়া গেছে তালুতে, সম্ভবত সমতল কোন টেবিলে চেপে ধরা হয়েছিল হাতটা (কাঠের গুঁড়ো ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে)। জমাট বাঁধা রক্তের পরিমাণ দেখে আন্দাজ করা যায়, মৃত্যুর দু'ঘন্টা আগে ফুটো করা হয় হাত।'

চেয়ারে হেলান দিলেন গুগলি, ঠোঁটে বিদ্রূপ মেশানো ক্ষীণ একটু হাসি। 'যীশুর মত ক্রুশ বিঁধে মরার মধ্যে গৌরব আছে, একটুর জন্যে সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে অগাস্টিন।'

মুচকি একটু হেসে রিপোর্টের ওপর চোখ বুলাল পাধানি। 'লাশের হাত-পা, আর মুখে আঠা পাওয়া গেছে, সম্ভবত অ্যাডেসিভ টেপ লাগানো হয়েছিল।' কাগজটা ভাঁজ করল সে।

চোখ বন্ধ করে বসে আছেন গুগলি, গভীর চিন্তায় মগ্ন। মন্তব্য শোনার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে পাধানি।

'পিসমেকার ছেড়ে বেরুবার পরপরই অগাস্টিনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়,' বললেন গুগলি। 'নির্জন কোথাও নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে টেপ দিয়ে আটকানো হয় হাত-পা। নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্ন করা হয় তাকে, জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে ছেঁদা করা হয় তার হাত। সব কথা আদায়ের পর ওরা তাকে গুলি করে, তারপর লাশটা ডোবায় ফেলে চলে যায়।'

মন দিয়ে শুনছে পাধানি।

ঝুঁকে ডেস্কের ওপর থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে খুললেন গুগলি, চোখ বুলালেন কাগজে। 'সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে আজ বেলা দুটোয় অগাস্টিনের ল্যানসিয়া পাওয়া গেছে, তাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না, শুধু একটা ওয়ার্নিং সিস্টেম বাদে।'

ভুরু প্রায় কুঁচকে উঠল পাধানির। 'ওয়ার্নিং সিস্টেম, স্যার?'

'জাপানি পুতুলটার কথা বলছি। ওটা একটা স্প্রিং লাগানো পুতুল, গাড়িতে কেউ চড়লে ঘন ঘন ওপর-নিচে দোলার কথা। ক্লাবে বেশিক্ষণ ছিল না অগাস্টিন, কাজেই যখন বেরিয়ে এল, তখনও একআধটু দুলছিল পুতুলটা। আততায়ী মাত্র কিছুক্ষণ আগে উঠেছিল তার গাড়িতে।'

'কিন্তু অগাস্টিন পুতুলের দোল খাওয়া লক্ষ করেনি···।'

'ভুলের খেসারত কিভাবে দিয়েছে দেখলেই তো।' মাফিয়া সদস্যরা টেলিফোনে কে কি আলাপ করেছে জানার জন্যে আরেকটা ফাইল খুললেন গুগলি। বেশি কিছু আশা করেন না তিনি, কারণ ফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা গোটা দেশেই আজকাল অতি সাধারণ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে যাদের ফোনে জিনিসটা ফিট করা হয় তারাও ব্যাপারটা জেনে ফেলে।

ফাইলের কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন গুগলি, পাধানি মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তেমন কিছু নেই—আজ সকালে শুধু অগাস্টিনের খোঁজে ওরা সবাই সবাইকে ফোন করতে শুরু করে।'

ফাইলটা বন্ধ করে রেখে দিলেন গুগলি। 'একটাই সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি—ইউনিয়ন কর্স। ড্রাগসের চালান নিয়ে ওদের সঙ্গে ফনটেলার একটা গোলমাল বেধেছিল। হুমকি-ধামকি দিয়ে ফনটেলা ওদেরকে চুপ করে যেতে বাধ্য করলেও, রাগ পুষে রেখেছিল ওরা। সুযোগ পেয়ে ছোবল দিয়েছে। এ যদি সত্যি হয়, খুন এখন একটার পর একটা ঘটতেই থাকবে, আর ঘটবে নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন নিয়ে। গ্রুপের খুদে একটা ঘুঁটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে বড়গুলোর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য আদায় করেছে ওরা। যে-কোন মুহূর্তে ব্যাপক হামলা শুরু হয়ে যেতে পারে।'

পাধানি কিছু বলতে যাবে, তাকে বাধা দিলেন গুগলি। 'কিন্তু একটা জিনিস মিলছে না, পাধানি। চোখে গুলি করল কেন? এ তো ব্যক্তিগত আক্রোশের পরিচয়। ওই চোখ দিয়ে অগাস্টিন কিছু দেখেছিল, তার এই দেখাটা যেন পছন্দ

করেনি খুনী। উঁহুঁ, এর সঙ্গে ইউনিয়ন কর্সের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না…।'

'ব্যক্তিগত শত্রুতার জের বলছেন?' সংশয় প্রকাশ করল পাধানি। 'কিন্তু সার্ভেইল্যান্স রিপোর্ট হল, আজ সকাল থেকে ফনটেলা আর তার লোকেরা সাংঘাতিক সতর্ক হয়ে গেছে। প্রত্যেকের জন্যে আরও বেশি করে বডিগার্ড, আস্তানাগুলোয় কড়া পাহারা, বাইরে কেউ এক রকম বেরুচ্ছেই না…।'

'হ্যাঁ।' চিন্তিত দেখাল কর্নেলকে। 'এ-সব লক্ষণ দেখে বোঝা যায়, ইউনিয়ন কর্সকেই ভয় পাচ্ছে ওরা।' দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। 'মঁশিয়ে দ্য জিলাম্বুকে ফোনে পাওয়া যায় কিনা দেখ দেখি।'

ইটালিতে যেমন মাফিয়া, ফ্রান্সে তেমনি ইউনিয়ন কর্স। ইউনিয়ন কর্সের প্রধান ঘাঁটি মার্সেলেসে। কর্নেল গুগলির মত একই পদমর্যাদার পুলিস অফিসার দ্য জিলাম্বু দক্ষিণ ফ্রান্সে কাজ করেন। দু'জনের মধ্যে ভাল সম্পর্ক রয়েছে, অনেকদিন থেকে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। বেশ কয়েকটা কনফারেন্সে দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছে ওঁদের।

কিন্তু দ্য জিলাম্বু কোন সাহায্য করতে পারলেন না। কিছুই শোনেননি তিনি। তবে বললেন, এর পিছনে যদি ইউনিয়ন কর্স থাকে, তারা সম্ভবত কর্সিকা থেকে গানম্যান ভাড়া করেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, তিনি সজাগ থাকবেন, কিছু টের পেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন কর্নেলকে।

'এ ইউনিয়ন কর্স না হয়েই যায় না,' ডন বাকালার গম্ভীর, কর্কশ গলা গমগম করে উঠল।

পালার্মোয় আতুনি বেরলিংগারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে ডন বাকালা। রোম থেকে এইমাত্র এসে পৌঁচেছে বেরলিংগার। ডন বাকালার স্টাডিরুমে তার দু'জন প্রধান উপদেষ্টাও রয়েছে, ট্যানডন আর বোরিগিয়ানো। ডন আতুনি বেরলিংগারকে একটু চিন্তিত আর আড়ষ্ট দেখাচ্ছে—কারণ, মিলান সরাসরি তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, ওখানে কিছু ঘটলে সব দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

'কিছুদিন থেকে একের পর এক ভুল করে যাচ্ছে ফনটেলা,' বলল সে। 'আমি তাকে বলেওছি, ড্রাগস স্মাগলিঙের ব্যাপারটায় ফরাসীদের ঠকানো বোকামি হয়ে গেছে তার। ওকে নিয়ে মুশকিল হল, মাঝে-মধ্যে অতি চালাক হয়ে ওঠে। ওটাই শেষ শিপমেন্ট ছিল, এরপর ব্যাংকক থেকে ড্রাগস আনার ব্যবস্থা হবে, মোটা একটা দাঁও মারার সুযোগটা তাই ছাড়েনি।'

ট্যানডন মন্তব্য করল, 'কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে পারছে না। কিডন্যাপিঙের ঘটনাটা ভাবুন একবার।' একে একে সবার দিকে তাকাল সে। 'নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের—আভান্তি পরিবারের মেয়েটার কথা বলছি। তাকে রাস্তা থেকে তুলে আনার সময়ই গোটা ব্যাপারটা লেজেগোবরে হয়ে গেল।

তারপর, কি অন্যায়, গাড়ির ভেতর মারা গেল মেয়েটা। সাধারণ মানুষ এধরনের ঘটনা খুব খারাপভাবে নিচ্ছে। ঘটনাটার পর চারদিক থেকে চাপ আসতে শুরু করে।'

এবার বোরিগিয়ানোর পালা। 'হ্যাঁ, বিশেষ করে ওই কাজটা সুষ্ঠুভাবে সারা উচিত ছিল। আর, যারা দায়ী, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত ছিল তাদের। ওদের একজন ফনটেলার ভাগ্নে, তাই সে কোনরকম শাস্তি না দিয়ে শুধু টাকার ভাগ থেকে বঞ্চিত করল ওদের।' চেহারায় বিষাদ নিয়ে মাথা নাড়ল সে। 'ব্যবসার মধ্যে শৃংখলা না থাকলে চলে কি করে! আমার মনে হয় ফনটেলা বোধহয় নরম হয়ে পড়েছে।'

বেরলিংগার মাথা ঝাঁকাল। 'ওই কাজটায় অগাস্টিনও ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ওটা ছিল একটা বোকা পাঁঠা।'

সবাই যে যার কথা শেষ করে এবার ডন বাকালার দিকে ফিরল, উনি এখন কি বলেন। ডন বাকালা মানুষটা মাঝারি গড়নের, কিন্তু ধড়টা চওড়া আর নিরেট। বুলেট আকৃতির মাথায় ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুল। এই মুহূর্তে তার চেহারায় কোন ভাব নেই। ভারি, কর্কশ কণ্ঠস্বর, কিন্তু শান্ত। নির্দেশ দেয়ার সময় কখনও তাকে উত্তেজিত হতে দেখা যায় না।

'ট্যানডন, তুমি যদি ফ্রান্সে গিয়ে বেলোরির সাথে কথা বল, আমি খুশি হব। এটা যদি ওরা শুরু করে থাকে, আমি চাই ওদের সাথে তুমি একটা সমঝোতায় আসবে। ব্যাখ্যা করে বলবে, লোক ঠকানর ব্যবসায়ে আমরা নেই। ফনটেলা যদি কোন অন্যায় করেই থাকে, ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে তাকে।' হঠাৎ একটু তীক্ষ্ণ হল তার কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু ক্ষমা চাইবে না। বুঝিয়ে দেবে আপস করতে চাইছি ভয়ে নয়, আমরা সম্মানিত লোক বলে, আর ব্যবসায় কারচুপি পছন্দ করি না বলে।'

'কালই আমি রওনা দেব, রোম হয়ে,' বলল ট্যানডন।

কিন্তু নেতাদের নেতা মাথা নাড়ল। 'না। দু'তিন দিন অপেক্ষা করো। ওরা যেন ভেবে না বসে গোলমাল শুরু হতে না হতেই নার্ভাস হয়ে পড়েছি আমরা।'

বোরিগিয়ানোর দিকে ফিরল বাকালা। 'মিলানে গিয়ে ফনটেলার সাথে কথা বল তুমি। তাকে বলবে, আমরা অসন্তুষ্ট। ভবিষ্যতে যেন তার কাজে বিশৃঙ্খলা না দেখি। আর, বেলোরিকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

বাকালা এবার বেরলিংগারের দিকে ফিরল। 'সিনর, আমি জানি, ফনটেলা আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবু অন্তত এই ব্যাপারে ধমকটা তার আমার কাছ থেকেই পাওয়া দরকার।'

সায় দিয়ে সামান্য একটু মাথা দোলাল বেরলিংগার।

বাকালা আবার ট্যানডনের দিকে ফিরল। 'কাজটা তুমি গোপনে সারবে। আমি চাই না গামবেরি জানুক ফনটেলা এখন আর আমাদের গুড বুকে নেই।

জানলে তার মাথায় হয়ত কুবুদ্ধি গজাবে। তাছাড়া, সব মিলিয়ে মিলানের পরিস্থিতি ভালই।' কথা শেষ করে বেরলিংগারের দিকে তাকাল, সমর্থন জানিয়ে আবার সামান্য একটু মাথা দোলাল বেরলিংগার।

বলল, 'পরস্পরের ব্যাপারে ওরা নাক গলায় না, সেজন্যেই মিলানের পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে—সেটা নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

বৈঠকের ফলাফলে ডন বাকালা খুশি। উঠে গিয়ে ককটেল কেবিনেটের সামনে দাঁড়াল সে। নিজের হাতে সবাইকে স্কচ হুইস্কি পরিবেশন করল। মার্টিনি হলে ভাল হত, ভাবল বেরলিংগার। কিন্তু ডন বাকালা তার গ্লাসে বিষ ঢেলে দিলেও হাসিমুখে সেটুকু তার গিলতে হবে।

নেপলস, শনিবার সকাল। টেরেসে বসে কফি খাচ্ছে রেমারিক। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল সে, দেখল, খবরের কাগজ নিয়ে এগিয়ে আসছে ফুরেলা। টেবিলের ওপর কাগজটা রাখল ছেলেটা, আঙুল দিয়ে একটা খবরের দিকে রেমারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অগাস্টিন নামে এক লোক খুন হয়েছে, গুলি করে মারা হয়েছে তাকে। ধারণা করা হচ্ছে, অর্গানাইজড ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত ছিল লোকটা। মাত্র এই ক'লাইনের খবর। খুন-খারাবির শহর মিলান, দু'একজন খুন হলে কাগজগুলো তেমন গুরুত্ব দেয় না। পড়া শেষ করে মুখ তুলল রেমারিক, বলল, 'তারমানে ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। জিনিস-পত্র সব গুছিয়ে রাখ, কাল তুমি গোজোয় চলে যাচ্ছ।'

ছয়

দু'বার গড়ান দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল সিনেল এলি, মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। বেডসাইড টেবিল থেকে হাতঘড়ি নিয়ে ডায়ালে চোখ বুলাল—মাত্র দশটা বেজেছে। ন্যাংটো অবস্থাতেই জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। পর্দা সরিয়ে নিচের অন্ধকার রাস্তায় তাকাল। তার কালো আলফা রোমিও ঠিক নিচেই পার্ক করা রয়েছে, এতটা ওপর থেকে শুধু বারুন-এর ভাঁজ করা কনুই সহ হাতের খানিকটা দেখা যায়, ড্রাইভারের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আছে। সন্তুষ্ট হয়ে পর্দা ছেড়ে দিল সে, জানালার দিকে পিছন ফিরল। বিছানায় শুয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। চোখাচোখি হতে জিভের ডগা সামান্য একটু বের করে এদিক-ওদিক নাড়াল এলি।

'কেমন লাগছে, লক্ষ্মী সোনা?' আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করল সে। 'তোমাকে খুশি করতে পেরেছি তো?'

'যাহ্, অসভ্য!' লালচে হয়ে উঠে বলল মেয়েটা, এলির সুঠাম নগ্ন শরীরের

ওপর চোখ। 'তোমার কি এখুনি না গেলেই নয়?' জানতে চাইল সে। 'বড়জোর এক ঘন্টা, তার বেশি কোন দিন থাক না—একা একা থাকতে কি যে একঘেয়ে লাগে আমার!'

তোমার মত মেয়ে না থাকলে জীবনটা আমার কাছেও একঘেয়ে লাগত, ভাবল এলি। মনে মনে খুশি আর তৃপ্ত সে, আবার একই সঙ্গে একটা অস্বস্তিও বোধ করছে। খুশি এইজন্যে যে এই বয়সেও পনেরো বছরের একটা মেয়েকে সন্তুষ্ট করতে পারে সে। আর অস্বস্তির কারণ হল, এমন ভাব দেখাচ্ছে মেয়েটা যেন তার ওপর ওর একটা অধিকার জন্মে গেছে।

কাপড় পরতে শুরু করে এলি ভাবল, কেউ যদি অল্প-বয়েসী গার্লফ্রেণ্ড পছন্দ করে, এ-ধরনের ছেলেমানুষি আচরণ মেনে না নিয়ে তার কোন উপায়ও নেই। কাপড় পরে বিছানায় বসল সে, মেয়েটার বুকে হাত দেয়ার জন্যে ঝুঁকল। কিন্তু একটা গড়ান দিয়ে দূরে সরে গেল মেয়েটা। অস্বস্তি আরও একটু বাড়ল এলির।

'সুখে থাকলে ভূতে কিলায়,' বলল সে। 'এত সুন্দর একটা জায়গায় রেখেছি তোমাকে, প্রচুর টাকা দিচ্ছি খরচ করতে—নাকি বেটোলায় ফেরত যেতে চাও?'

মেয়েটার কোন জবাব নেই। বিছানা থেকে উঠে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল এলি। চট্ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এটাকে বাদ দিয়ে নতুন আরেকটা যোগাড় করতে হবে। অর্গানাইজড ক্রাইমের এমন একটা পজিশনে রয়েছে সে, নারীদেহ উপভোগের রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটানো তার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। মামা ফনটেলার অনেক রকম ব্যবসা, তার মধ্যে নারী-ব্যবসাটা সে-ই দেখাশোনা করে।

দেশের সব জায়গা থেকে বড় শহরগুলোয় আসে ওরা। আসে টাকা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর উত্তেজনার লোভে। পনেরো থেকে বিশের মধ্যে বয়স ওদের, দুনিয়া সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। এখানে-সেখানে ধাক্কা খেয়ে শেষ পর্যন্ত বোকা মেয়েগুলো এলি আর তার সহকারীদের খপ্পরে পড়ে। মেয়েগুলোকে ওরা বার, ক্লাব আর ব্রথেলে চাকরি দেয়—সব চাকরির একটাই শর্ত, দেহদান করতে হবে। এই শর্ত সহজে কেউ মেনে নিতে চায় না, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে সবাইকেই এক সময় মেনে নিতে হয়। এদের মধ্যে থেকে কাউকে মনে ধরলে, সে যদি খুব সুন্দরী আর অল্প-বয়েসী হয়, নিজের ব্যবহারের জন্যে তাকে আলাদা করে রাখে এলি। কিছুদিন তাকে নিয়ে মৌজ করে, তারপর বাতিল করে আরেকটা খুঁজে নেয়।

কালই এটাকে মিজানোর হাতে তুলে দেবে সে, ঠিক করল এলি। মিজানো পাকা লোক, হপ্তাখানেকের মধ্যে মেয়েটাকে ড্রাগে আসক্ত করে তুলবে—তখন অর্গানাইজেশনের ওপর ভরসা না করে আর উপায় থাকবে না সুন্দরীর।

নিজের ওপর সন্তোষ বোধ করল এলি। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা জরুরি। একটা সমস্যা অবশ্য তৈরি হল—নতুন একটা মেয়ে যোগাড করতে হবে। এবারেরটা আরও কম-বয়েসী হলে ভাল হয়। বয়স যত

বাড়ছে, ততই আরও অল্প বয়েসী মেয়েদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে সে। ওরা যে মেয়েটাকে কিডন্যাপ করেছিল, তার কথা মনে পড়ল…হ্যাঁ, শালা, মেয়ে ছিল বটে একখানা! কচি বলে কাকে! শরীরটা সবে মাত্র টসটসে হতে শুরু করেছিল। দেখ কাণ্ড, ওর কথা ভাবতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছে সে। মুহূর্তের জন্যে ইচ্ছে হল, আবার বিছানায় ওঠে। কিন্তু না, মামা তাকে এগারোটার সময় তৈরি থাকতে বলে দিয়েছে। পালার্মো থেকে বোরিগিয়ানো এসেছে, নিশ্চয়ই অগাস্টিনের খুন হওয়া নিয়ে আলোচনা করবে। ফরাসীরা খেপেছে, তাদেরকে ঠাণ্ডা করার ব্যাপারটা নিয়েও আলাপ হবে।

বিছানার কিনারায় বসে জুতো পরছে এলি। ইউনিয়ন কর্স-কে নিয়ে ভাবছে সে। কি যে একটা উটকো ঝামেলায় পড়া গেল! অন্তত কিছুদিন সবাইকে সাবধানে থাকার নির্দেশ দিয়েছে মামা। তারমানে বডিগার্ড ছাড়া চলাফেরা করা যাবে না। সঙ্গে একটা লেজুড় রাখা ভারি অস্বস্তিকর। তবে তার ভাগ্যটা ভাল, বারুন তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না। তাছাড়া, বারুনকে তার বডিগার্ড হিসেবে পাঠানয় বোঝা গেল, দিনে দিনে তার গুরুত্ব আর মর্যাদা বাড়ছে। আত্মপ্রশংসায় কয়েক মুহূর্ত বুঁদ হয়ে থাকল এলি। তাঁর ধারণা, এই উন্নতির মূলে রয়েছে তার বুদ্ধি। অগাস্টিনের চেয়ে অনেক বেশি চালাক-চতুর সে। ওটা তো ছিল এক নাম্বার গবেট আর ভোঁতা। দু'হপ্তা একটা বাড়িতে অগাস্টিনের সঙ্গে আটকা পড়েছিল সে, ঘটনাটা মনে পড়ায় গম্ভীর হয়ে উঠল এলি। লুবনা নামের সেই কচি মেয়েটা ছাড়া একঘেয়েমি দূর করার আর কোন উপকরণ ছিল না।

উঠে দাঁড়িয়ে শোল্ডার হোলস্টার পরল এলি, তাতে পিস্তল ভরল। জ্যাকেট পরার সময় দেখল, মেয়েটা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আবার কখন আসবে তুমি?' অভিমানের সুরে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে মেয়েটার ঠোঁট আলতোভাবে চুমু খেল এলি। 'কাল,' মুখে হাসি টেনে বলল সে। 'আজ বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না, কাল তার ক্ষতিপূরণ দেব—বাইরে লাঞ্চ খেতে নিয়ে যাব তোমাকে। তারপর, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

ছোট অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলল সে, বেরিয়ে এল ল্যাণ্ডিঙে। ভারি একটা কণ্ঠস্বর শুনল, 'এলি।' ঘুরতে শুরু করল এলি, জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। সত্যিই বুদ্ধি রাখে সিনেল এলি। দেখার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা চিনতে পারল সে—একটা শটগানের কালো ব্যারেল, একেবারে চোখের সামনে। তারপরই সাদা আর হলুদ রঙের বিস্ফোরণ ঘটল।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে বার্নাদো গুগলির। অভিনেত্রীর ভাগ্য অস্বাভাবিক ভাল। মেয়েটা খেলে চমৎকার, খেলার সূক্ষ্ম কিছু কলা-কৌশলও জানা

আছে তার, এ-সবই তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তার সঙ্গে পাঁচটা খেলার তিনটেতেই জিততে হলে অবশ্যই ভাগ্য দরকার। ছক্কাগুলো নেড়ে সবুজ পশমী আচ্ছাদনের ওপর ফেললেন তিনি, বিড়বিড় করে বললেন, 'ছক্কা!' কিন্তু একটা দুই, আর একটা এক হল। 'ধেত্তেরি!' হতাশায় তাঁর চেহারা কালো হয়ে গেল। চেহারায় সহানুভূতি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা—দক্ষ একজন অভিনেত্রী।

এবার মেয়েটার পালা। দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করছেন গুগলি। সবগুলোয় জিততে না পারলেও, ছয়টা খেলায় তিনটেয় জিতে সমান সমান তাঁকে হতেই হবে, তা না হলে ওকে নিয়ে বিছানায় ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। অহঙ্কারে ঘা লাগছে, মর্যাদা হুমকির সম্মুখীন—হাজার হোক তিনি একজন এক্সপার্ট। চট্ করে একবার ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। প্রায় এগারোটা।

সন্ধেটা কিন্তু শুরু হয়েছিল সুন্দরভাবে। মেয়েটা যখন ঘরে ঢুকল, মনে হচ্ছিল আগুনের লাল শিখা তাকে জড়িয়ে আছে। ড্রেসটা পছন্দ হয় তাঁর—ছোট করে ছাঁটা, একটু ঢিলেঢালাভাবে গায়ে ফিট হয়েছে। ছক্কা ফেলার জন্যে যতবার ঝুঁকেছে মেয়েটা, প্রতিবার তার ভরাট স্তনের অনেকটা দেখতে পেয়েছেন তিনি। দেখেছেন, আর মনে মনে অস্থিরতায় ভুগেছেন। এই অস্থিরতার জন্যেই প্রথম দিকের খেলাগুলোয় মন লাগাতে পারেননি।

রান্নাবান্না আগেই সেরে রেখেছিলেন। কচি ভেড়ার মাংসের সঙ্গে ডিম আর লেমন সস। শ্যাম্পেন আর হুইস্কি। ভোজন পর্ব শেষ হয়, স্বভাবতই জিলাটো ডি টুটি ফ্রুটি দিয়ে। তাঁর হাতের রান্না খেয়ে এক কথায় মুগ্ধ হয় তরুণী অভিনেত্রী। তার ভাব দেখে গুগলি উপলব্ধি করেন, এরপর শুধু যদি তিনি ব্যাকগ্যামন খেলায় জিততে পারেন তাহলেই কেল্লা ফতে, ওকে বিছানায় তোলা কোন সমস্যাই হবে না।

তাঁর পালসের গতি বেড়ে গেল। ছয় দরকার ছিল মেয়েটার, কিন্তু ছক্কায় দেখা যাচ্ছে তিন আর এক। এখন শুধু যদি তাঁর একটা ছয় পড়ে, জেতার সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ। আর এবার জিততে পারলে, দশ মিনিট লাগবে ওকে বিছানায় তুলতে...।

অনেকক্ষণ ধরে নেড়ে ছক্কা ছুঁড়লেন তিনি। 'ছক্কা!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর চিৎকার চাপা পড়ে গেল টেলিফোনের কর্কশ আওয়াজে।

আলফা রোমিওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে পাধানি। সামনেই একটা পুলিস ভ্যান, জেনারেটার সহ। গোটা দৃশ্যটা ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। গাড়ি থেকে নামলেন গুগলি। অত্যন্ত অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাঁকে। পনেরো মিনিট আগে যখন তিনি ফোনে কথা বললেন, তখনকার মতই বদরাগী লাগল। পাধানির সঙ্গে চোখাচোখি হতে 'হুম' করে একটা শব্দ করলেন, যেন সবকিছুর জন্যে

পাধানিই দায়ী।

গাড়ির ভেতর উঁকি দিলেন গুগলি।

'বারুন,' তাঁর পাশ থেকে পাধানি বলল, 'এলি ওপরে।'

'এভাবেই ওকে পাওয়া গেছে?' গুগলি জানতে চাইলেন।

'না,' জবাব দিল পাধানি। 'হুইলের পিছনে, ড্রাইভিং সিটে বসানো ছিল লাশ, জানালা দিয়ে বেরিয়ে ছিল ভাঁজ করা কনুই। টহলে এসে একজন পুলিস তাকে গাড়ি থেকে বেরুতে বলে। যখন বেরুল না, লোকটা তখন দরজা খোলে। লাশটা তার গায়ের ওপর ঢলে পড়ে, ইউনিফর্মে রক্ত লেগে যা তা অবস্থা।'

আলফা রোমিওর ভেতর আবার তাকালেন গুগলি। সামনের সিটের ওপর পড়ে আছে লাশ, ওদিকের দরজায় ঠেকে রয়েছে মাথা। সিট, ড্যাশবোর্ড আর মেঝেতে রক্ত দেখা যাচ্ছে। বারুনের চিবুকের নিচে, গলায়, বিশাল একটা গর্ত, সেটা থেকে এখনও একটু একটু রক্ত ঝরছে।

চোখ-মুখ বিকৃত করে ঘুরে দাঁড়ালেন গুগলি। 'কি করুণ মৃত্যু, অথচ এ-ধরনের মৃত্যু এদের প্রাপ্য নয় সে-কথা বলা যাবে না। চল, ওপরে যাই।'

একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, তাকে আবার কাজ শুরু করার ইঙ্গিত দিয়ে বসের পিছু নিল পাধানি।

তিন তলার ল্যাণ্ডিঙে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে এলি। একটা তোয়ালে দিয়ে তার কাঁধ আর মাথা ঢেকে রাখা হয়েছে, এক সময় তোয়ালেটা সাদা ছিল। পুলিস বিভাগের ফটোগ্রাফার তার ক্যামেরা খাপে ভরে ঘুরে দাঁড়াল।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলা, ল্যাণ্ডিং থেকে বেডরুমে দৃষ্টি চলে। বিছানায় একটা মেয়েকে বসে থাকতে দেখলেন গুগলি। মেয়েটার পরনে কিছু আছে বলে মনে হল না, গায়ে শুধু একটা চাদর জড়ানো। তার পাশে বসে একজন পুলিস নোটবুকে কি যেন লিখছে। লেখার ফাঁকে ফাঁকে চাদরের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাচ্ছে সে, তবে কারও চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে খুব সাবধান।

মেয়েটাকে দেখিয়ে পাধানি বলল, 'গার্ল-ফ্রেণ্ডের সাথে সময় কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল এলি।'

বিড়বিড় করে গুগলি বললেন, 'তাহলে তো বলতে হয় আমার চেয়ে ভাগ্যবান ও।' ঝুঁকে তোয়ালের একটা কোণ তুললেন তিনি। 'তা বোধহয় না,' আবার অস্ফুটে বললেন, ছেড়ে দিলেন তোয়ালের কোণ। এলির ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

'শটগান,' বলল পাধানি। 'একেবারে কাছ থেকে।'

মাথা ঝাঁকালেন গুগলি, রক্ত-লাল তোয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে। প্যাথোলজিস্টের রিপোর্টে কি লেখা হবে বুঝতে পারছি—ম্যাসিভ ব্রেন ড্যামেজ···।' ঘাড় ফিরিয়ে একবার বেডরুমের

দিকে তাকালেন তিনি। 'কি জান তুমি?'

যা জানে, সব বলে গেল পাধানি। এই অ্যাপার্টমেন্ট ছিল এলির প্রেম-নিকেতন। অ্যাপার্টমেন্টটা অনেক দিন থেকে ভাড়া নিয়ে রেখেছিল এলি, কিন্তু মেয়ে বদল হত ঘন ঘন। এখানে সে প্রায় রোজ রাতেই একবার করে আসত। কিছুদিন হল, অগাস্টিন খুন হবার পর থেকে, বারুনকে বডিগার্ড হিসেবে নিয়ে আসত, তার জন্যে গাড়িতে অপেক্ষা করত বারুন। বারুনের গলা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কেটে ফেলে খুনী, তারপর লাশটাকে ড্রাইভিং সিটের ওপর খাড়া করে বসিয়ে দেয়। রাস্তাটা ওখানে অন্ধকার, পথিকরা গাড়ির দিকে তাকালেও কিছু বুঝতে পারার কথা নয়। বারুনকে খুন করে এখানে উঠে আসে খুনী, এলির জন্যে অপেক্ষায় থাকে। লোকটা সম্ভবত ঢোলা একটা কোট পরে ছিল, শটগানটা তারই নিচে লুকানো ছিল। এলি দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই তার মুখের ওপর দুটো ব্যারেল বিস্ফোরিত হয়।

'মেয়েটা কিছু দেখেনি?' জানতে চাইলেন গুগলি।

'না,' বলল পাধানি। 'বয়স একেবারেই কম, কিন্তু খুব একটা বোকা নয়। বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা মাত্র বালিশের তলায় মুখ লুকিয়েছিল, পুলিস না আসা পর্যন্ত ওভাবেই শুয়েছিল।' ওপরতলার দিকে একটা আঙুল তাক করল সে। আওয়াজ শুনে চারতলা থেকে এক মহিলা নেমে এসেছিলেন, ল্যাণ্ডিঙে এলিকে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার জুড়ে দেন। স্বাভাবিক। মাথার অর্ধেকটাই উড়ে গেছে এলির। এই তো মাত্র মিনিট কয়েক আগে মহিলার চিৎকার থেমেছে। আমাদের কে যেন আছে তার সঙ্গে, শান্ত করার পর একটা জবানবন্দি নেবে।'

'ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করলেন গুগলি।

'জ্বী?'

'একটু আগে তুমি একবচন ব্যবহার করে বললে—খুনী একজন কেন? দু'জন, বা আরও বেশি লোক নয় কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল পাধানি। 'কি জানি—এ স্রেফ আমার একটা অনুভূতি। কেন যেন মনে হচ্ছে, অগাস্টিন, আর এদের দু'জনকে একই লোক খুন করেছে।'

'স্রেফ অনুভূতি, কিন্তু অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত,' বলে খোলা দরজা দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকলেন গুগলি। তরুণ পুলিস তাঁকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এসে থামল তাঁর সামনে, নোটবুকে চোখ রেখে পড়তে শুরু করল।

'পাননা বেলি, বয়স পনেরো, বেটোলা থেকে এসেছে—সম্ভবত বাড়ি থেকে পালিয়ে। ছয় হপ্তা আগের হারানো বিজ্ঞপ্তিতে নামটা থাকতে পারে, এলির সঙ্গে তখন থেকেই ছিল ও।'

মেয়েটার দিকে তাকালেন গুগলি। ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর চিবুক ঠেকিয়ে বিছানায় বসে আছে, চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব। 'ওকে বল জিনিস-পত্র গুছিয়ে

নিয়ে তৈরি হোক, হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে। ওর সম্পর্কে আরও জান, তারপর ওকে হারানো মেয়েদের বিভাগে পাঠিয়ে দাও। মিলানে যতদিন থাকবে, চব্বিশ ঘন্টা প্রোটেকশন দিতে হবে ওকে।'

বেডরূম থেকে বেরিয়ে এলেন গুগলি, তাঁর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। কি মনে করে আবার তিনি বেডরূমের দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিলেন, তরুণ পুলিস লোকটাকে শুকনো গলায় বললেন, 'তুমি বরং বাইরে দাঁড়িয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা কর।' হতাশ তরুণ মুখ কালো করে বেরিয়ে এল বাইরে।

পাধানি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। 'মনে হয় পুরোদস্তুর একটা যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকালেন গুগলি, অন্যমনস্ক। 'ইউনিয়ন কর্স—শটগান আর ছুরি ওদের প্রিয় অস্ত্র। তবু একটা কিন্তু থেকেই যায়।'

'কিন্তু, স্যার?'

'এরকম হবার কথা নয়। বড় বেশি রিয়্যাক্ট করছে ওরা।' যতটা না উদ্বিগ্ন তারচেয়ে বেশি বিমূঢ় দেখাল তাঁকে। 'চারদিক থেকে হামলা শুরু হয়ে গেলে অবস্থা কি দাঁড়াবে ভাবতেও ভয় হয়।' এলির লাশের দিকে তাকালেন তিনি। 'ওকে কোথায় পাওয়া যাবে অগাস্টিনের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল ওরা। ভাবছি আর কি জেনেছে…।'

'যা জানতে চেয়েছে সবই গড়গড় করে বলে গেছে…।'

'আমার হাতে পেরেক গাঁথলে আমিও বলতাম।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গুগলি। 'কিন্তু ওদের প্রশ্নগুলো কী ছিল?'

এলির লাশ প্লাস্টিক ব্যাগে ভরা হল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ওরা। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন গুগলি, কাঁধের ওপর দিয়ে বললেন, 'অফিসে এসো, অনেক কাজ।'

এবার খবরের কাগজগুলো আগ্রহী হয়ে উঠল। বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে তিনটে খুন, গুরুত্ব না দিয়ে আর পারা যায় না। বার এবং বিছানা থেকে ডেকে নেয়া হল ক্রাইম রিপোর্টারদের, ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য যোগাড় করে রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ পেল তারা। সবাই অন্ধকারে রয়েছে, কাজেই সবচেয়ে সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছুল—খুনগুলোর জন্যে ইউনিয়ন কর্সই দায়ী। পরদিন সকালের কাগজগুলোয় বড় বড় হেডিংয়ে ছাপা হল, ইটালিয়ান মাফিয়া চক্রের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ ইউনিয়ন কর্সের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অপরাধের নিন্দা করা হল। সম্পাদকীয়তে লেখা হল, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির এই অবনতি মেনে নেয়া যায় না।

ওপরমহল থেকে বার্নাদো গুগলির ওপর চাপ আসতে শুরু করল। জেনারেল, তাঁর বস্, বললেন, কিছু একটা করা দরকার। ইটালিয়ান ক্রিমিন্যালরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে, সেটা যথেষ্ট খারাপ; কিন্তু অন্য দেশের লোকেরা এসে

ওদেরকে মেরে রেখে যাবে, এ অত্যন্ত মর্যাদা হানিকর।

গোজোয়ও পৌঁছুল খবরটা। বিশালদেহী বিদ্রোহী হাতে একটা কাগজ নিয়ে রুচিতা'স-এ ঢুকল। কিন্তু, ক্ষতি কি, গুঁফো, অক্লান্ত, হাজির—ওরা সবাই রয়েছে বারে। ওদেরকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকল বিদ্রোহী। সবাই এক জায়গায় জড়ো হতে হাতের কাগজটার ভাঁজ খুলে টেবিলের ওপর ফেলল সে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই।

তারপর জল্পনাকল্পনা শুরু হল। এখানেই কি এর সমাপ্তি? প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হয়েছে হাসানের?

নেপলসে রেমারিক, আর মার্সেলেসে গগলও খবরটা পড়ল। ওরা জানে, মাত্র শুরু করেছে রানা।

উদ্বিগ্ন তো বটেই, প্রচণ্ড রেগেও আছে হিনো ফনটেলা। উদ্বিগ্ন এই জন্যে যে তার লোকদের মেরে ফেলা হয়েছে। আর রেগে গেছে ডন বাকালার ধমক খেয়ে। গোটা ব্যাপারটা তার মনে গভীর বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছে। ডন বাকালাকে কোনদিনই পছন্দ হয়নি তার। লোকটা নেতাদের নেতা হলে কি হবে, মাফিয়া সাম্রাজ্যের ভালমন্দে তার তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান বা ত্যাগ নেই। পালার্মোর কাছে নিজের ভিলায় বসে থাকে, কালেভদ্রে বের হয় কি হয় না, কোন রকম বিপদের ভাগিদার হতে রাজি নয় সে, কিন্তু সব কিছু থেকে লাভের ভাগিদার হওয়া তার চাই-ই। ফনটেলা ভাবল, বেজন্মা রাজনীতিকদের সঙ্গে ওই হারামজাদার কোন পার্থক্যই নেই।

গাড়িতে বসে দাঁতে দাঁত চাপল ফনটেলা, ট্যানডনের মেসেজটা মনে পড়ে গেছে—'আমরা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট।' বেজন্মা, বুড়ো শিয়াল, মনে মনে গাল পাড়ল সে। বাকালার সঙ্গে বেরলিংগারের খাতির রয়েছে, তা না হলে কড়া একটা পাল্টা জবাব দিত সে। মুশকিল হল, কূটনীতির চাল চেলে ইটালির প্রায় সবগুলো মাফিয়া পরিবারকে হাত করে রেখেছে বাকালা। তার বিরুদ্ধে কথা বললে কারও সমর্থন পাওয়া যাবে না। 'শালা বানচোত সত্যিকার একজন পলিটিশিয়ান।'

বুধবারের রাত, বিয়ানকো গ্রামে যাচ্ছে ফনটেলা, মায়ের সঙ্গে বসে ডিনার খাবে। মায়ের সুপুত্র সে, বুধবার রাতে মাকে একবার দেখতে যাবেই। কোন কারণে যদি যেতে না পারে, আরেক বুধবার পর্যন্ত অপরাধ বোধে জর্জরিত হয়। না গেলে মা-ও খুব রেগে থাকে, আর মা রেগে গেলে ফনটেলার মত লোকও তাকে সামলাতে পারে না।

সতর্কতা অবলম্বনে কোন খুঁত রাখা হয়নি, অন্তত ফনটেলার সেই রকমই ধারণা। তার গাড়ির সামনে আর পিছনে বডিগার্ড ভর্তি আরও দুটো গাড়ি রয়েছে। ওরা সবাই সশস্ত্র, জানে, যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে বসের ওপর হামলা

হতে পারে।

আর শালার ওই নোংরা ইউনিয়ন কর্স, ভাবল ফনটেলা। সামান্য চল্লিশ মিলিয়ন লিরার শোকে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। যাই হোক, টাকাটা নিয়ে তার লোক খুব তাড়াতাড়ি মার্সেলেসে যাচ্ছে, ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়ে গেলে তাকে আর কোন টেনশনে ভুগতে হবে না।

ঝড়ের বেগে বিয়ানকো গ্রামে ঢুকল কনভয়টা। টেরেস সহ বিশাল বাড়ি, ফনটেলার মা এত বড় বাড়িতে একাই থাকে। তৃপ্তি আর গর্ব অনুভব করল ফনটেলা, মা জননীকে সুখে রেখেছে সে। বুড়ি মার যত্ন নেয়ার জন্যে চার-পাঁচজন চাকরাণী আছে, মার নিজের পছন্দ করা মেয়েলোক তারা, কারও বয়সই পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর কম নয়। গাড়িগুলো থামতেই লাফ দিয়ে নামল বডিগার্ডরা, রাস্তায় পা ফেলার আগেই জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকে গেছে। অতি নাটুকে আচরণ, ভাবল ফনটেলা। এমনকি ইউনিয়ন কর্সের ইতর জানোয়ারগুলোও ব্যবসায়িক জটিলতার মধ্যে পরিবারগুলোকে টেনে আনে না।

'সবাই এখানে অপেক্ষা কর,' নির্দেশ দিল সে, এতগুলো সশস্ত্র বডিগার্ড সঙ্গে নিয়ে মার সঙ্গে দেখা করতে এসে অস্বস্তি বোধ করছে সে। 'দু'ঘন্টার বেশি লাগবে না আমার।'

লোকটা ছোটখাট, কিন্তু অবাধে চর্বি জমতে দিয়েছে শরীরে, সিঁড়ির ধাপক'টা টপকাতে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠল সে। করিডর ধরে ধীর পায়ে এগোল, জানে, ছেলেকে একান্তভাবে কাছে পাবার জন্যে চাকরাণীদের ছুটি দিয়ে দিয়েছে মা। প্রতি বুধবারেই তাই দেয়। দরজা খোলাই রয়েছে, কিন্তু কবাট ভিড়ানো।

রাগে কটমট করে তাকাল মা। কিছু বলার চেষ্টা করল না, কারণ তার মুখ টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে। একটা চেয়ারে বসে রয়েছে বুড়ি, চেয়ারের সাথে টেপ দিয়ে হাত আর পা-ও আটকে রাখা হয়েছে। বয়স্ক এক লোক, চোখে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে, দাঁড়িয়ে রয়েছে চেয়ারের পাশে। লোকটার হাতে একটা শটগান। ব্যারেলটা ছোট, সেটা বুড়ির কাঁধে ঠেকে আছে। আর মাজ্‌ল জোড়া বুড়ির বাঁ কান ছুঁয়ে আছে।

'একটু শব্দ কর,' শান্ত সুরে বলল লোকটা। 'সাথে সাথে এতিম হয়ে যাবে।'

ফনটেলাকে নির্দেশ দেয়া হল, দেয়ালের দিকে মুখ কর, হাত দুটো দু'দিকে লম্বা করে দেয়ালে তালু ঠেকাও, পা ফাঁক করে দাঁড়াও। নির্দেশ পালন করল ফনটেলা। লোকটা এগিয়ে এল, কিন্তু পায়ের আওয়াজ হল না। ফনটেলা ভাবল, কে হতে পারে লোকটা? শটগানের ব্যারেল সজোরে আঘাত করল তার মাথায়, জ্ঞান হারাল সে।

হিসেব করা বাড়ি, খানিক পরই জ্ঞান ফিরে এল ফনটেলার। মাথায় অসহ্য ব্যথা অনুভব করল সে, কিন্তু কাতর শব্দগুলো গলা থেকে বেরুতে পারল না, মুখে

টেপ লাগানো রয়েছে। এরপর দুই হাঁটু, আর দুই গোড়ালি এক করে টেপ জড়ানো হল। বাড়ির পিছন দিকটা একবার দেখে এল রানা, ফিরে এসে ডন ফনটেলাকে তুলে নিল কাঁধে।

বাড়ির পিছনে নেই কেউ। অশ্লীল গালিগালাজ করল ফনটেলা—নিজেকে। এমন বোকামি মানুষ করে! অপমান লাগছে তার, রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। একজন মাত্র লোক তাকে কাবু করে ফেলল! সে যেন অবোধ, অসহায় একটা শিশু, কাঁধে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে!

বাড়ির পিছনে কাঁকর ছড়ানো রাস্তা, রাস্তার ওপর খয়েরি রঙের একটা ভ্যান, পাশের দরজাটা খোলা। ফনটেলাকে ছুঁড়ে ফেলা হল ভ্যানের ভেতর। আরামখেকো শরীরটা থেঁতলে গেল। দরজা বন্ধ করল রানা, কোন আওয়াজ হল না। কয়েক সেকেণ্ড পর স্টার্ট না নিয়েই গড়াতে শুরু করল ভ্যান। ফনটেলার মনে পড়ল, ঠিক এখানটা থেকেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে রাস্তাটা। অতি নাটুকে দেহরক্ষীদের কথা ভাবল সে। কত কাছে রয়েছে ওরা, কিন্তু কিছুই টের পেল না। নিজেকে অভিশাপ দিল সে। এখন আর রাগ নয়, ভয় হচ্ছে। তার চোখ বাঁধা হয়নি। ভ্যানের গায়ে লেখাটা দেখেছে সে—বিনো গারবাল্ডি, ভেজিটেবল ডিলার। লেখাটার বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে কিনা ধরতে পারেনি সে, তবে লেখাটা তাকে দেখতে দেয়ায় বুঝতে পারছে, এটা একটা ওয়ান ওয়ে জার্নি; যাচ্ছে, কিন্তু ফিরে আসবে না সে।

অনেকটা দূরে, অনেকটা নিচে নেমে এসে স্টার্ট নিল ভ্যান। এতদূর থেকে দেহরক্ষীরা এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাবে না, পেলেও কিছু সন্দেহ করার নেই তাদের। সময় বয়ে চলল। ভ্যান ছুটছে—খুব একটা দ্রুতগতিতে নয়, আবার শম্বুকগতিও বলা চলে না। এখনও গ্রাম এলাকায় রয়েছে ওরা, তবু লোকটা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না।

হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এল ফনটেলার। তারপর ব্যথা করতে শুরু করল। ভ্যানের মেঝেতে কতক্ষণ পড়ে আছে সে, বলতে পারবে না। মাত্র দু'ঘন্টা পেরিয়েছে, অথচ তার মনে হল সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। সারারাত ধরে গাড়ি চালিয়ে কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? এখন আর তার হাত-পায়ে ব্যথা নেই, অসাড় হয়ে গেছে। ফনটেলার বুদ্ধি লোপ পায়নি, কিন্তু মাথা ঘামিয়েও উদ্ধারের কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না সে।

এক সময় থামল ভ্যান। বন্ধ হল এঞ্জিন। পাশের দরজা খুলে গেল। খুব শান্তভাবে, এবং সহজ ভঙ্গিতে আবার তাকে কাঁধে তোলা হল। চারদিক অন্ধকার হলেও, আকাশের গায়ে বড় বড় গাছের কাঠামো, সাদা চুনকাম করা ছোট একটা বাংলো দেখতে পেল সে। তাকে কাঁধে নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল কিডন্যাপার। পায়ের ঠেলা দিয়ে দরজার কবাট খুলল। মেঝেতে নামানো হল তাকে. মোটেও

যত্নের সঙ্গে নয়। খুট শব্দের সঙ্গে জ্বলে উঠল আলো। ফনটেলা নড়ল না, শুনতে পেল তার কিডন্যাপার ঘরের ভেতর হাঁটাহাঁটি করছে। কয়েক মিনিট পর পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এল, পাঁজরে লাথি খেয়ে চিৎ হয়ে গেল ফনটেলার শরীর। সিলিঙের দিকে মুখ করে আছে সে, পাশে দাঁড়ানো কিডন্যাপারকে প্রায় সিলিং পর্যন্ত লম্বা বলে মনে হল তার। হাঁটু মুড়ে তার পাশে বসল লোকটা, ফনটেলার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিল। তারপর খুলল হাঁটু আর গোড়ালির টেপ। ইচ্ছে বা শক্তি, কোনটাই অবশিষ্ট নেই, ধস্তাধস্তির চিন্তা বাদ দিয়ে অসাড় পেশী ডলে রক্ত চলাচল সহজ করার চেষ্টা করল সে। পিঠের নিচে টেপ দিয়ে আটকানো হাত দুটো চাপা পড়ে আছে, সারা শরীরে টনটনে ব্যথা। এবার শুধু ভয় নয়, অজানা একটা আতঙ্ক গ্রাস করতে উদ্যত হল তাকে। তার বেল্ট খুলে নিল কিডন্যাপার, চেইন টেনে ঢিলে করল ট্রাউজার। কিডন্যাপারের একটা হাত তার পিছনে চলে গেল, সামান্য একটু উঁচু করা হল তার শরীর, টেনে কোমর থেকে নামানো হল ট্রাউজার আর আণ্ডারপ্যান্ট। কিডন্যাপার উঠে দাঁড়াল। আবার একটা লাথি খেয়ে উপুড় হল ফনটেলা। তার পা দুটো যথাসম্ভব দু'দিকে টেনে ফাঁক করা হল। কি ঘটতে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছে না ফনটেলা। তার আতঙ্ক বাড়তেই থাকল। নিতম্বে কিডন্যাপারের হাতের স্পর্শ পেল সে। দুই নিতম্ব টান দিয়ে ফাঁক করা হচ্ছে। তীক্ষ্ণ একটা ব্যথায় কুঁকড়ে গেল সে, গোঙানির ভোঁতা আওয়াজ হল গলার ভেতর, পা দুটো মেঝের ওপর ঘন ঘন আছাড় খেতে লাগল।

একটু পরই স্থির হয়ে গেল ফনটেলা। কানের পিছনে ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে সে।

আবার জ্ঞান ফিরল ফনটেলার। তীক্ষ্ণ কোন ব্যথা অনুভব করছে না, শুধু আড়ষ্ট একটা ভাব, ভীষণ অস্বস্তিকর।

তার সামনে কাঠের একটা টেবিল। টেবিলের ওপর, ঠিক মাঝখানে নয়, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে, খুদে একটা ফুটোকে ঘিরে শুকনো, কালচে দাগ দেখল ফনটেলা। সেই রিপোর্টটা মনে পড়ে গেল—অগাস্টিনের হাতে পেরেক গাঁথা হয়েছিল। শিউরে উঠল সে। দরদর করে ঘামছে। টেবিলের ওদিকে বসা কিডন্যাপারের দিকে তাকাল। লোকটার চেহারায় কোন ভাব নেই, শুধু চোখে কঠিন দৃষ্টি। কিডন্যাপারের সামনে টেবিলের ওপর খোলা নোটবুক ছাড়াও আরও কয়েকটা জিনিস রয়েছে, পুরানো আমলের একটা অ্যালার্ম ঘড়িও দেখা যাচ্ছে। ঘড়িতে বাজে ন'য়টা দুই।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

অস্বস্তিকর আড়ষ্ট ভাব নিয়ে মাথা দোলাল ফনটেলা। তার হাত আর পা চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা থাকলেও, মুখ থেকে খুলে নেয়া হয়েছে টেপ। কিন্তু তবু সে

কথা বলল না—বয়স আর অভিজ্ঞতা, দুটোই অগাস্টিনের চেয়ে বেশি তার।

সামনের দিকে ঝুঁকে টেবিল থেকে একটা মেটাল সিলিণ্ডার তুলে নিল কিডন্যাপার, জিনিসটার দু'প্রান্ত ঢালু। প্যাঁচ ঘুরিয়ে সিলিণ্ডারটা খুলল ও, দুই অংশের গভীর গর্ত দুটো ফনটেলাকে দেখাল। 'এটা একটা চার্জার। সাধারণত কয়েদীরা দামি কিছু জিনিস লুকাবার কাজে ব্যবহার করে—টাকা, ড্রাগস, এই সব। শরীরের ভেতর লুকানো থাকে এটা—রেকটামে।'

চেয়ারে বসা অবস্থায় আরও একটু কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল ফনটেলা। আড়ষ্ট ভাব···কারণটা মনে পড়ে গেল। খয়েরি রঙের কি যেন একটা হাতে নিল কিডন্যাপার, দেখে মনে হল প্লাস্টিসিন। বলল, 'প্ল্যাস্টিক—হাই এক্সপ্লোসিভ।' জিনিসটা সিলিণ্ডারের এক অংশের গর্তে ভরল সে, আঙুলের চাপ দিয়ে ভাল করে ভেতরে ঢোকাল।

'এটা একটা ডিটোনেটর।' কিডন্যাপারের হাতে ছোট একটা, গোল, ধাতব বস্তু দেখল ফনটেলা, এক প্রান্ত থেকে একটা সূঁচ বেরিয়ে আছে। সূঁচটা প্লাস্টিকের ভেতর গেঁথে দেয়া হল।

'আর এটা একটা টাইমার।' আরেকটা গোল জিনিস, দুটো কাঁটা সহ। কাঁটা দুটো ডিটোনেটরের বাইরের দুই সকেটে ঢোকানো হল, তারপর সিলিণ্ডারের দুই অংশ এক করে প্যাঁচ লাগানো হল।

সিলিণ্ডারটা দু'আঙুলে ধরে একটু ওপরে তুলল কিডন্যাপার। 'এটা আর এখন শুধু একটা চার্জার নয়, বোমাও। খুব ছোট, কিন্তু ভারি শক্তিশালী।'

বোকার মত তাকিয়ে আছে ফনটেলা। একবার মনে হল, এসব সত্যি নয়, স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু স্বস্তিকর ভুলটা এক সেকেণ্ডও টিকল না। একটা ঢোক গিলল সে, কপাল বেয়ে ঘামের একটা ফোঁটা চোখে পড়ায় মাথা ঝাঁকাল।

'বোমাবাজিতে অভিজ্ঞ লোক তুমি, তোমাকে আর নতুন কি শেখাব আমি। বুঝতেই পারছ, জিনিসটা আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান। দশ বছর আগে এ-ধরনের একটা বোমার ওজন হত এক কিলোরও বেশি।' কিডন্যাপারের ঠাণ্ডা, কঠিন দৃষ্টি ফনটেলার মুখের ওপর যেন গেঁথে আছে। 'ঠিক এই রকম একটা বোমা পেছন দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি তোমার শরীরের ভেতর। সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে, দশটার সময় ফাটবে।'

ঝট করে অ্যালার্ম ক্লকের দিকে তাকাল ফনটেলা। ন'টা সাত।

শান্ত সুরে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল কিডন্যাপার। ফনটেলাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। উত্তরগুলো সে যদি সঠিকভাবে দেয়, দশটা বাজার আগে, তাহলে হয়ত বোমাটা শরীর থেকে সরিয়ে ফেলার অনুমতি পাবে সে।

কিন্তু ফনটেলা বুঝল, তাকে মিথ্যে আশ্বাস দেয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাকে খুন করা হবেই।

কিডন্যাপার আরও বলল, আর সবার মত হয়ত ফনটেলাকে মেরে ফেলা হবে না, তাকে হয়ত ওর পরে অন্য কাজে লাগবে। ফনটেলা বিশ্বাস করল না। অগত্যা, নির্লিপ্ত একটা ভাব দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল কিডন্যাপার, চুপ করে বসে থাকল—যেন তার কোন তাড়া নেই।

অ্যালার্ম ক্লক কিট কিট করছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে ফনটেলা। ঘরে আর কোন শব্দ নেই। পেটের ভেতর মোচড় অনুভব করল সে, ল্যাট্রিনে গিয়ে পেট খালি করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কিডন্যাপারকে বললে লোকটা হাসবে। মোচড়টা বাড়তে বাড়তে এক সময় অসহ্য হয়ে উঠল, শরীরের আর সব ব্যথার কথা মনে থাকছে না। ন'টা বাইশ মিনিটে মচকাল ফনটেলা। ভেবে দেখেছে, উত্তর দিলে নতুন কিই-বা তার হারাবার আছে।

'বল, কি জানতে চাও।'

কলমটা তুলে নিয়ে ক্যাপ খুলল কিডন্যাপার। 'আতুনি বেলিংগার, আর বাকালা সম্পর্কে জানতে চাই আমি। কিন্তু সবচেয়ে আগে জানতে চাই, একজন বুদ্ধিমান লোক হয়ে ওই মেয়েটাকে কিডন্যাপ করতে গেলে কেন তুমি? ওর বাপের হাতে তখন টাকা ছিল না জেনেও?'

ন'টা তিপ্পান্ন মিনিটে উত্তর দেয়া শেষ করল ফনটেলা। কলমে ক্যাপ লাগাল কিডন্যাপার, নোটবুক তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কয়েক সেকেণ্ড ফনটেলার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর পিছন ফিরে দরজার দিকে এগোল। ফনটেলার ইচ্ছে হল পিছু ডাকে, বলে, আমি তো তোমার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছি, এবার বোমাটা আমাকে বের করতে দাও। কিন্তু অভিজ্ঞ লোক, জানে, শত অনুরোধেও এই লোককে নরম করা যাবে না।

একটু পর ভ্যানের আওয়াজ পেল ফনটেলা। তার আরেকবার মনে হল, এ-সব স্বপ্ন। ভ্যানের আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে। এখন শুধু অ্যালার্ম ক্লকের টিক্ টিক্ শোনা যাচ্ছে।

ফনটেলা চেঁচাল না, বা ধস্তাধস্তি করল না। স্রেফ শক্ত হয়ে বসে থাকল চেয়ারে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ডায়ালের দিকে। ন'টা আটান্ন মিনিটে পাগল হয়ে গেল ফনটেলা, তার মন আর মাথা কাজ করছে না। কিন্তু বোমাটা ঠিক সময়েই কাজ করল। বিদ্যুৎবেগে সিলিঙের দিকে উঠে গেল ডন ফনটেলা।

রানা তখন ভ্যান নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে, বিস্ফোরণের আওয়াজ ওর কানে পৌঁছুল না। তবে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কাঁটায় কাঁটায় দশটা বাজতে দেখে ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠল। বিড়বিড় করে বলল ও, 'আমি জেগে আছি, লুবনা, আমি জেগে আছি।'

অন্ধকার বারান্দা। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তরুণী। পাশে বার্নাদো গুগলি।

অভিনেত্রীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন তিনি। ছোট্ট, নরম ফুল। একটু চাপ দিলেন, কিন্তু পাল্টা সাড়া পেলেন না। হতাশার একটা ঢেউ বয়ে গেল সারা শরীরে, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন।

বশীকরণের সমস্ত মন্ত্র, মন ভোলানর যাবতীয় কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, অভিনেত্রীকে মুগ্ধ করতে পেরেছেন তিনি। তরুণী নিজের মুখেই স্বীকার করেছে, কোন পুরুষমানুষের মধ্যে এতগুলো গুণ একসঙ্গে দেখেনি সে। অথচ আসল কাজের বেলায় ওর তরফ থেকে কোন সাড়া পাচ্ছেন না তিনি। অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে, ভয়টা সেখানেই, এদের দেমাকের কথা কেউ কিছু বলতে পারে না। তিনি প্রস্তাব দিলে হঠাৎ যদি খেপে যায়, যদি খারাপভাবে নেয় ব্যাপারটাকে! তাই চাইছেন, প্রস্তাবটা ওর তরফ থেকে আসুক। এ-সব বিষয়ে সরাসরি কথা হয় না, তিনি জানেন। আভাসে-ইঙ্গিতে, ঠারে-ঠোরে সারে মানুষ। সেজন্যই সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছিলেন তিনি—এইবার নিয়ে তিনবার তিনি ওর হাতে হাত রাখলেন।

কিন্তু কই, ওঁর হাতের ভেতর মেয়েটা তো একটা আঙুলও নাড়ল না।

সন্ধেটা চমৎকারভাবে শুরু হয়েছিল। আজ আবার দাওয়াত করে নিজের বাড়িতে আনিয়েছেন তিনি অভিনেত্রীকে। নিজের হাতে রান্না করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাইছেন ওকে। মেয়েটা রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখে তাঁর মনের আশা তুঙ্গে উঠে যায়। এরপর ব্যাকগ্যামন খেলায় দ্রুত পর পর তিন বার জিতে নিঃসন্দেহে ধরে নেন, একবার শুধু আভাস দিলেই তার সঙ্গে বিছানায় উঠবে অভিনেত্রী।

হতাশায় ভুগছেন গুগলি, এই সময় তাঁর হাতের ভেতর নড়ে উঠল অভিনেত্রীর হাত। সামান্য একটু চাপ, কিন্তু কি পরম সুখ! তিনিও আবার একটু চাপ দিলেন, পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হতে চাইলেন। পাল্টা চাপ দিয়ে মেয়েটা বলল, 'চল, ঘরে যাই!'

গর্ব আর সুখ অনুভব করলেন গুগলি। মেয়েটার হাত ধরে ঘরে ফিরে এলেন তিনি। একবার সুইচবোর্ডের দিকে তাকালেন, তারপর মেয়েটার চোখে—আলো নেভাবার অনুমতি চাইছেন। অভিনেত্রী তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তার ঠোঁটের দিকে মুখ নামালেন গুগলি। এই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা।

সাত

'উঁহুঁ, ইউনিয়ন কর্স হতেই পারে না,' জোর দিয়ে বললেন বার্নাদো গুগলি, প্যাথোলজিস্টের রিপোর্টের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। ডেস্কের ওধারে একটা হাতলহীন চেয়ারে বসে রয়েছে পাধানি।

'এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে, স্যার?' জানতে চাইল সে।

রিপোর্টের ওপর মধ্যমা দিয়ে টোকা দিলেন গুগলি। 'এ-ধরনের কল্পনাশক্তি ওদের নেই।' ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে। 'ছুরি, হ্যাঁ; শটগান, হ্যাঁ; রিভলভার, হ্যাঁ; বোমা, হ্যাঁ—কিন্তু রেকটামে নয়।' এদিকে-ওদিকে মাথা নাড়লেন তিনি। 'এ বুদ্ধি সম্পূর্ণ অন্য এক ধরনের মাথা থেকে বেরিয়েছে।'

ফনটেলার লাশ পাওয়ার পর দু'দিন পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিন ওপরমহল থেকে চাপ আসছে তাঁর ওপর, রহস্যের মীমাংসা কর। কাগজগুলো পুলিস আর কারাবিনিয়ারের অযোগ্যতা নিয়ে যা তা লিখছে। ফনটেলার হত্যাকাণ্ড এমন ফলাও করে ছাপা হয়েছে, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ফ্রেঞ্চ পুলিস অফিসার দ্য জিলাম্বুর সঙ্গে টেলিফোনে আবার আলাপ করেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে দ্য জিলাম্বু জানিয়েছেন, ইটালিতে যে হত্যাকাণ্ড ঘটছে তার সঙ্গে ইউনিয়ন কর্স জড়িত নয়, অন্তত সে-ধরনের কোন তথ্য তাঁর জানা নেই। মার্সেলেসের ইউনিয়ন কর্স গ্রুপ পুলিস এবং ডন বাকালার প্রতিনিধি বোরিগিয়ানোকে বিশ্বাস করাতে পেরেছে, খুনগুলোর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

ইটালির মাফিয়া পরিবারগুলোর মধ্যে দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। যাকে কখনও উত্তেজিত হতে দেখা যায় না, সেই ডন বাকালা নাকি টেবিলে ঘুসি মেরে তার উপদেষ্টাদের ঘাবড়ে দিয়েছে। দুই দশকের অটুট, নিস্তরঙ্গ শান্তিময় পরিবেশ নষ্ট করছে কেউ একজন। কে সে?

আশা করা হচ্ছে, ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী কর্নেল গুগলি, সবার আগে এই প্রশ্নের উত্তর যোগাতে পারবেন। দু'দিন ধরে অফিস থেকে বলতে গেলে বেরই হননি তিনি। বের হবার জরুরি কোন প্রয়োজনও অবশ্য দেখা দেয়নি—অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে।

'সব কিছুর একটা সীমা আছে,' মেয়েটা বলেছে তাঁকে। এরই মধ্যে প্রায় প্রতিষ্ঠিত নায়িকা সে, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই আশাবাদী, তার সৌন্দর্যের গুণগানে সবাই পঞ্চমুখ। 'এ-ধরনের বাধা আমার জন্যে অবমাননাকর,' জানিয়ে দিয়েছে সে।

কাজেই গুগলি এখন কাজে মন বসাতে পারছেন। যারা খুন হয়েছে, আরও একবার করে তাদের প্রত্যেকের ফাইল পড়লেন তিনি। অগাস্টিন, বারুন, এলি আর ফনটেলা। মোট চারজন। যোগফল থেকে বারুনকে বাদ দিতেই যোগাযোগটা কিসের সঙ্গে, ধরে ফেললেন তিনি। বোকামির জন্যে তিরস্কার করলেন নিজেকে—বারুনের হত্যাকাণ্ড স্রেফ একটা দুর্ঘটনা, বা বাধা অপসারণ মাত্র। সে এলিকে পাহারা দিচ্ছিল।

'লবনা কিডন্যাপিং!'

'তার সাথে এর কি সম্পর্ক?' চোখে প্রশ্ন আর বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল পাধানি।

'কিসের আবার, প্রতিশোধের!' গুগলির ইচ্ছে হল আবিষ্কারের আনন্দে বগল বাজান। 'অগাস্টিন আর এলি এই কিডন্যাপিঙের সাথে ছিল। আয়োজনটা ছিল ফনটেলার।'

পরবর্তী এক ঘন্টা ভীষণ ব্যস্ত থাকল ওরা। দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন গুগলি, আভান্তি পরিবার সরাসরি এ-সব খুনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না, তবে ভিটো আভান্তি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করে থাকতে পারে। এরপর তিনি লুবনার বডিগার্ডের দিকে মনোযোগ দিলেন। প্রথম দিকে হাসান তেমন কোন গুরুত্ব পেল না। লোকটা ছিল প্রিমিয়াম বডিগার্ড। বয়স খুব বেশি, তার ওপর অ্যালকোহলিক। কিন্তু ফোনে হাসপাতালের সঙ্গে কথা বলার পর গুগলির পালস্ রেট বেড়ে গেল। সিনিয়র একজন সার্জেনের সঙ্গে কথা বললেন তিনি, ভাগ্যই বলতে হবে সে ভদ্রলোক তাঁর বড় ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গুগলি জানলেন, আহত বডিগার্ড এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে যে হাসপাতালের সবাই রীতিমত অবাক হয়ে যায়। প্রায় মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাকে। লোকটা বেঁচে ওঠে শুধু প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তির জোরে। প্রাণধারণের তীব্র আকুতি ছাড়া ও-ধরনের গুরুতর জখম নিয়ে কারও পক্ষে বেঁচে ওঠা সম্ভব নয়। এরপর গুগলি ফোন করলেন এজেন্সিতে, এই এজেন্সিই আভান্তি পরিবারে বডিগার্ডের কাজটা যুগিয়ে দিয়েছিল লোকটাকে। জানা গেল, বডিগার্ড এক সময় মার্সেনারি ছিল। জরুরি টেলেক্স পাঠানো হল প্যারিসে। ইন্টারপোল থেকে উত্তরের আশায় অপেক্ষা করছেন তিনি, ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়ে বডিগার্ডের সঙ্গে জনৈক ভিটেলা রেমারিকের সম্পর্কের ব্যাপারটাও জানতে পারলেন। এই রেমারিক বডিগার্ডের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নেপলসে তার একটা বোর্ডিং হাউস-কাম-রেস্তোরাঁ আছে, নাম প্রেজো ফিসো।

পদ, খ্যাতি আর যোগাযোগ, তিনেট অস্ত্রই কাজে লাগালেন গুগলি। চারদিক থেকে হুড়মুড় করে তাঁর প্রশ্নের জবাব আসতে শুরু করল। রোম ইমিগ্রেশনের ডিরেক্টরকে সরাসরি ফোন করলেন তিনি, ডিপার্টমেন্টের কমপিউটর থেকে পাওয়া তথ্য প্রকাশ করে ডিরেক্টর জানালেন, বডিগার্ড অমুক তারিখে মাল্টার উদ্দেশে ইটালি ত্যাগ করে।

তারমানে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার ছয় দিন পর। কিন্তু মাল্টা ছেড়ে আবার ইটালিতে ফিরে এসেছে কিনা, সে সম্পর্কে কোন তথ্য কমপিউটরে জমা নেই।

এরপর মাল্টায়, বন্ধু মেনিনোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন গুগলি। মেনিনোর সঙ্গেই রোমে ট্রেনিং শেষ করেছেন তিনি, দুই পুলিস অফিসারের মধ্যে খাতির

আছে। অল্প কিছুক্ষণ কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন গুগলি, চিন্তিতভাবে বললেন, 'অবাক কাণ্ড!'

'স্যার?'

'বডিগার্ডের মাল্টায় পৌঁছুনর সময়টা কনফার্ম করল মেনিনো, বলল তিন হপ্তা হল জাহাজে করে মার্সেলেসে চলে গেছে।'

'ব্যস, আর কিছু না?'

'না।'

'কিন্তু আপনি বললেন অবাক কাণ্ড...'

গুগলি হাসলেন। 'মাল্টিজি পুলিস দক্ষ, ব্রিটিশদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে ওরা। তাই বলে এতটা দক্ষ নয় যে প্রত্যেক টুরিস্ট সম্পর্কে খবর রাখবে—ওদের ডাটা কমপিউটারাইজডও নয়। অথচ তথ্যগুলো মুখস্থ করা ছিল মেনিনোর, জিজ্ঞেস করতেই গড়গড় করে বলে ফেলল। মানেটা কি? মানে, বডিগার্ডের প্রতি ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট ছিল তার, বা এখনও আছে। তারপর, আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা সম্পর্কে আর কিছু তুমি জান কিনা, উত্তরে কি বলল জান? বলল, বছরে পাঁচ লক্ষ লোক বেড়াতে আসে মাল্টায়, ক'জনের খবর রাখবে তারা! নিশ্চয়ই কিছু গোপন করছে সে। কি হতে পারে সেটা? কেনই বা গোপন করবে?'

প্যারিস থেকে টেলেক্সের জবাব এল। তিন ফিট লম্বা কাগজের রোল পড়া শেষ করে গুগলি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, 'মানুষ নয়, এই হাসান একটা কিলিং মেশিন।' ঘুণাক্ষরেও তিনি টের পেলেন না, এইমাত্র যার ডোশিয়ে পড়া শেষ করেছেন তিনি, সে মারা গেছে।

উঠে দাঁড়ালেন গুগলি। 'চল, কোমো থেকে একবার ঘুরে আসি। ভিটো আভান্তির সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক আরও কিছু জানা যায় কিনা।'

স্বামী-স্ত্রী ডিনারে বসেছে। টেবিলের এক প্রান্তে লরা। আগের চেয়ে রোগা হয়েছে লরা, তবে তার রূপ টসকায়নি। ভিটো আগের মতই আছে, কিছুই বদলায়নি তার। মেয়ে মারা যাবার পর উপলব্ধি করেছে লরা, কি হারিয়েছে সে। কিন্তু মেয়ে মারা গেলেও, ভিটোর আরেকটা অবলম্বন আছে—স্ত্রী।

দরজা খোলার শব্দে ওরা দু'জনই ঘাড় ফেরাল, ডেজার্ট নিয়ে আথিয়ার ঢোকার কথা। দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লুবনার সেই বডিগার্ড—হাসান।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, দু'জনকে দেখছে। ওরাও তাকিয়ে আছে, চোখে ভাষাহীন বোবা দৃষ্টি।

প্রথমে সামলে উঠল ভিটো। 'কি চান আপনি?' তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করল সে, ভাবটা যেন রানা এসে ভারি অন্যায় করে ফেলেছে।

এগিয়ে এসে একটা চেয়ার ধরল রানা, ঘুরিয়ে নিয়ে বসল তাতে, হাত দুটো

থাকল চেয়ারের পিঠে। ভিটোর দিকে তাকাল ও। 'তোমার স্ত্রীর সাথে কথা বলব। তুমি যদি নড়ো বা বাধা দাও, সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে।' জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ভারি একটা পিস্তল বের করে টেবিলের ওপর রাখল ও। 'এতে গুলি ভরা আছে।'

পিস্তলটা দেখে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল ভিটো। লরার দিকে তাকাল রানা। ওর চেহারা থেকে কঠিন ভাব একটু যেন শিথিল হল।

'কেন…আপনি কেন…কি চান…?' কোন প্রশ্নই পুরোটা উচ্চারণ করতে পারল না লরা। তার মনে পড়ল, এই লোককে প্রথম দিন দেখেই সে ভয় পেয়েছিল।

'আপনাকে একটা গল্প বলব আমি,' বলল রানা। 'নিজের মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাহিনী।' তারপর শুরু করল।

এসব ফনটেলার কাছ থেকে জেনেছে রানা। লুবনার কিডন্যাপিং প্রথম থেকেই ছিল একটা সাজানো ব্যাপার। ইন্সুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায় করার একটা কূটকৌশল। লণ্ডনের লয়েড'স-এর কাছ থেকে দুই বিলিয়ন লিরার একটা পলিসি কেনে ভিটো। চুক্তি ছিল, বীমা কোম্পানির কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে অর্ধেক টাকা ভিটোকে ফেরত দেবে ফনটেলা। ভিটো আর ফনটেলার মাঝখানে দালাল হিসেবে কাজ করে আলবারগো লোরান। অর্গানাইজড ক্রাইমের সঙ্গে তার যোগাযোগ বহুদিনের। তার স্বার্থ ছিল, এই টাকা থেকে কমিশন পাবে সে। গোটা ব্যাপারটা গড়গড় করে বলে গেল রানা, মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। শোনার সময় রানার মুখ থেকে একবারও চোখ সরল না লরার। শুধু রানার কথা শেষ হবার পর স্বামীর দিকে তাকাল সে। তার সমগ্র অস্তিত্ব থেকে যেন উথলে পড়ছে ঘৃণা। পিঠ বাঁকা করে আরও কুঁকড়ে গেল ভিটো। একবার মুখ খুলল, আবার সেটা বন্ধ করল। চোরের মত লাগছে তাকে। মাথা নিচু করে নিল সে, অন্য দিকে তাকাল।

'বাকি সবাই? কাজটা যারা করেছিল? আপনিই কি ওদের খুন করেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এ থেকে যারা লাভবান হয়েছে তাদের প্রত্যেককে আমি খুন করব।'

ডাইনিংরুমে আবার নেমে এল নিস্তব্ধতা। অনেকক্ষণ পর কথা বলল লরা, অনেকটা আপন মনেই, 'ও আমাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে পরস্পরের জন্যে আমরা তো এখনও আছি—কেটে যাচ্ছে দিন।' পরমুহূর্তে যেন বাস্তবে ফিরে এল সে, কঠিন হয়ে উঠেছে দৃষ্টি, রানার দিকে তাকাল। 'আপনি বললেন ওদের সবাইকে?'

টেবিল থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি ওকে খুন করতে এসেছি।'

মুখ তুলে তাকাল ভিটো, রানার দিকে নয়, স্ত্রীর দিকে। ঘামে চকচক করছে তার মুখ। চোখ দুটো যেন অনন্তের দিকে মেলে দেয়া একজোড়া গরাদহীন

জানালা।

পিস্তলটা সরিয়ে রাখল রানা, উঠে দাঁড়াল। 'ওকে আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম।'

'হ্যাঁ!' বোধহয় স্বস্তিতেই বিকৃত দেখাল লরার চেহারা, কাঁপা গলায় বলল, 'আমার হাতে ছেড়ে দিন—প্লীজ!'

দরজার দিকে এগোল রানা, কিন্তু লরার কণ্ঠ বাধা দিল ওকে। 'লোরানের ব্যাপারে কি করছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রানা, ওর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

লেকের পাশ দিয়ে চওড়া রাস্তা, বার্নাদো গুগলির গাড়ি ছুটে চলেছে কোমের দিকে। গুগলি ড্রাইভ করছেন, পাশে বসে আছে পাধানি। নীল রঙের একটা আলফেটা পাশ দিয়ে চলে গেল উল্টো দিকে।

পেন্ট হাউস অ্যাপার্টমেন্টে ডিনারে বসতে যাবে আলবারগো লোরান, ফোন এল ভিটোর। লোরান রিসিভার তুলতেই চেচাঁতে শুরু করল ভিটো, কি বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

'একটু অপেক্ষা কর,' লোরান বলল তাকে। 'আমি আসছি।'

ব্যস্ত হাতে জ্যাকেট পরল লোরান। স্ত্রীর চোখে বিস্ময় দেখে বলল, হঠাৎ একটা ঝামেলা দেখা দিয়েছে, ফিরতে দেরি হতে পারে তার।

বেসমেন্ট গ্যারেজে নেমে এল লোরান। মার্সিডিজে চড়ল। ইগনিশন কী ঘোরাতেই বিস্ফোরিত হল আধ কিলো বিস্ফোরক। হাড়-মাংস ছাতু হয়ে গেল আলাবারগো লোরানের।

খুই প্রভাবিত হলেন বার্নাদো গুগলি। আরাম করে চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি, পরম তৃপ্তিতে একটা ঢেঁকুর তুললেন, দরাজ গলায় মন্তব্য করলেন, 'এমন স্বাদের ফ্রিটো মিসটো জীবনে কখনও খাইনি—আই রিপিট—জীবনেও না।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রেমারিক। 'এ আর এমন কি, আমার মায়ের হাতের রান্না খেলে আপনি পাগল হয়ে যাবেন।'

'আপনিও কি আমাকে পাগাল হতে বাকি রাখছেন?' মুচকি হেসে বললেন গুগলি। 'একজন প্রাক্তন ক্রিমিন্যাল, প্রাক্তন কয়েদী, প্রাক্তন মার্সেনারি, তার রান্নার হাত এত ভাল হয় কি করে? আচ্ছা, আপনি ব্যাকগ্যামন খেলেন না, না?—নাকি তাও খেলেন?'

বিমূঢ় দেখাল রেমারিককে। 'খেলি, কিন্তু ব্যাকগ্যামনের সাথে কিসের কি

সম্পর্ক?'

রহস্যময় হাসি দেখা গেল কর্নেলের ঠোঁটে। 'সম্পর্ক আমার সাথে। এখানে সময়টা আমার আনন্দেই কাটবে বলে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে বলেছি, বোর্ডিং বন্ধ হয়ে গেছে—আপনি কোন হোটেলে উঠুন।'

কথা না বলে শ্যাম্পেনের গ্লাসে ধীরেসুস্থে চুমুক দিলেন গুগলি। অনেকক্ষণ পর যখন মুখ খুললেন, তাঁর গলা গম্ভীর, 'পরিস্থিতির গুরুত্ব কেউ যদি বোঝে তো সে আপনি। খুনগুলো কে করছে ডন বাকালা এখন তা জানে। খবর পাবার সুযোগ-সুবিধে আমার চেয়ে খারাপ নয় তার। আপনি হাসানের বন্ধু, এটা জানতে খুব বেশি সময় লাগবে না ওদের। আপনই বলুন, তখন কি হবে?'

রেমারিক চুপ করে থাকল।

'মাফিয়ানদের সম্পর্কে আমি আর আপনাকে নতুন করে কি বলব,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গুগলি। 'কয়েকজন টাফ লোককে পাঠাবে ওরা। আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে, কিংবা এখানেই মেরে রেখে যেতে পারে—মারার আগে হাসান সম্পর্কে সব আপনার কাছ থেকে জেনে নেবে ওরা।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেমারিক বলল, 'নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় আমি জানি।' তবে কর্নেলের যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারল না সে। মাত্র ঘন্টা খানেক আগে ফোন করেছিল রিসো। তার অফিসে সুবেশী দু'জন লোক এসেছিল, জানতে চায় হাসানের সঙ্গে রিসোর কি সম্পর্ক, কেন রিসো হাসানের ব্যাপারে সুপারিশ করেছিল। রিসোর সুপারিশেই এজেন্সি থেকে আভান্তি পরিবারে বডিগার্ডের চাকরির জন্যে পাঠানো হয়েছিল হাসানকে। লোক দু'জন রিসোকে প্রচ্ছন্ন হুমকিও দেয়। এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে, সেটা আন্দাজ করেছিল রেমারিক। তাই ভাইকে সে আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল কি বলতে হবে। শেখানো কথাই লোক দু'জনকে বলেছে রিসো, সে তার বড় ভাইর অনুরোধে সুপারিশ করেছিল।

কোন সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে লোক দু'জন, ঘন্টা কয়েকের মধ্যে টোকা পড়বে রেমারিকের দরজায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, কারাবিনিয়ারির একজন কর্নেল যদি থাকে এখানে, মাফিয়ানরা কেউ বোর্ডিং হাউসের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না। 'ঠিক আছে, এতই যখন জেদ করছেন, থেকে যান—খুলে দিচ্ছি একটা ঘর,' বলল রেমারিক। 'কিন্তু বিছানায় ব্রেকফাস্ট পাবার আশা থাকলে ভুলে যান।'

হাত নেড়ে অভয় দিলেন গুগলি। 'বিশ্বাস করুন, আমি কোন সমস্যাই নই। দেখবেন, আমার সাথে গল্প করে সময়টা আপনার ভালই কাটবে।'

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে মিলান থেকে আজ সন্ধের সময় এখানে পৌঁচেছেন গুগলি। গাড়ি চালাতে পছন্দ করেন তিনি, কারণ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ মেলে। পথে পুরো হপ্তার ঘটনা এক-এক করে স্মরণ করেছেন তিনি। শুধু মুগ্ধ

হননি, স্তম্ভিত হয়েছেন—দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী একদল লোককে মাত্র একজন লোক কেমন আতঙ্কিত করে তুলেছে। লোকটার প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর মাথা নত হয়ে আসতে চেয়েছে। যদিও, মুহূর্তের জন্যেও ভোলেননি, তিনি একজন পুলিস অফিসার, আইনের রক্ষক—অপরাধীকে ভক্তি করা তাঁকে মানায় না।

আভান্তি পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। স্মার্ট, সুদর্শন ভিটো আভান্তিকে চেনাই যাচ্ছিল না, কেউ যেন ছাই ঘষে দিয়েছে তার চেহারায়, আক্ষরিক অর্থেই কাঁপছিল লোকটা। তার স্ত্রী, লরা আভান্তি—সুন্দরী, কিন্তু বরফের মত ঠাণ্ডা।

প্রথমে ভিটো দেখা করতেই চায়নি। দেখা যা-ও বা করল, কথা বলতে চায় না। তারপর একটু নরম হল, বলল, আমার আইন-উপদেষ্টা আসছেন, এলে কথা বলব। এই সময় খবর এল ভিটোর আইন-উপদেষ্টা আলবারগো লোরান বোমা বিস্ফোরণে বেসমেন্ট গ্যারেজে মারা গেছে। আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল ভিটোর মধ্যে। খবরটা শুনেই গুগলির গায়ে ঢলে পড়ল সে। হড়বড় করে যা বলল, তার অর্থ দাঁড়ায়, পুলিসই এখন তার মা-বাপ, তারাই তাকে রক্ষা করতে পারে। এরপর প্রশ্নের উত্তর পেতে কোন অসুবিধে হয়নি কর্নেলের। ভিটো নিজের বোকামি আর লোভের কথা অকপটে গড়গড় করে বলে গেল। গুগলির সবচেয়ে খারাপ লাগল, যখন দেখলেন, ভিটো তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতি পাবে বলে আশা করছে। যে লোক নিজ মেয়েকে পুঁজি করে ব্যবসা করতে চায়, সুস্থ একজন মানুষ তাকে সহানুভূতি জানায় কি করে!

ভিটো যা বলল, খস খস করে সব লিখে নিল পাধানি। বোবা হয়ে বসেছিল লরা, চোখ দুটো একবারও স্বামীর মুখ থেকে সরেনি। স্বামীর প্রতি মহিলার ঘৃণা উপলব্ধি করে মনে মনে শিউরে উঠেছিলেন গুগলি।

ভিটোর সঙ্গে কথা বলে তাঁর মস্ত একটা লাভ হয়েছে, তিনি আবিষ্কার করেছেন কিলিং মেশিন চারজনকে খুন করেই থামছে না, তার তালিকায় আতুনি বেরলিংগার তো আছেই, আছে মোড়ল পরিবারের মাথা ডন বাকালাও। এই তথ্য হতভম্ব করে দেয় কর্নেলকে। তাঁর মনে হল, এ লোক কিলিং মেশিনও নয়, সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে পাঠানো মূর্তিমান অভিশাপ। তিনি ভেবেছিলেন, ফনটেলাকে খুন করার পর প্রতিশোধের আগুন নিভে যাবে। ধরে নিয়েছিলেন, ফনটেলাকে খুন করেই সীমান্তের দিকে খিঁচে দৌড় দিয়েছে বডিগার্ড, জান বাঁচাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু না! এ লোক মূর্তিমান খোদার মার, আগে চিনতে পারেননি।

ভিটো আভান্তির বিরুদ্ধে আইনগত কি ব্যবস্থা নেয়া যায় সে-সম্পর্কে পাধানিকে পরামর্শ দিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়েছিলেন কর্নেল, নিরিবিলিতে বসে চিন্তা-ভাবনা করবেন বলে।

পরিস্থিতিটা তাঁকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে।

একদিকে, বডিগার্ড আঘাত হেনেছে মাফিয়ার ঠিক হার্টের ওপর—একেবারে গর্বমূলে। একটা মাত্র লোক! এভাবে যদি চালিয়ে যায় সে, মারতে পারে আতুনি বেরলিংগারকে, মাফিয়ানদের ভেতর এমন সব বিশৃংখলা দেখা দেবে যে আবার সব গুছিয়ে আনতে সময় লাগবে দশ বছর। আর যদি অকল্পনীয় ঘটনাটা ঘটে, বডিগার্ড যদি বাকালাকে খুন করতে পারে, স্রেফ মুখ থুবড়ে পড়বে মাফিয়া চক্র।

বেরলিংগার আর বাকালার সম্প্রীতি আসলে একটা প্রাচীর, মাফিয়া চক্রকে সম্ভাব্য সমস্ত বিপদ থেকে আড়াল করে রেখেছে। এই প্রাচীর ভেঙে পড়লে দিকবিদিক ছুটোছুটি শুরু করবে মাফিয়ানরা, শুরু হয়ে যাবে মহা গোলমাল। সেই সুযোগে তিনি, গুগলি, অন্যান্য বস্‌দের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগতে পারবেন। ফলে দুই দশকের আগে মাফিয়ানরা কোনভাবেই আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ওদের সম্পর্কে তাঁর কোন ভুল ধারণা নেই। এই দানবকে তিনি চিরকালের জন্যে ধ্বংস করতে পারবেন না। শুধু এর আকৃতি কেটেছেঁটে ছোট করতে পারবেন। সে-সুযোগ একশো বছরে এক আধবার আসতে পারে, না-ও আসতে পারে। তাঁর ভাগ্য, সেই দুর্লভ সুযোগটাই তাঁকে এনে দিয়েছে বডিগার্ড লোকটা।

আরেক দিকে, তাঁর দায়িত্ব হল খুনীকে গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেয়া, যে-কারণে বা যাকেই খুন করুক সে। সংকট তাঁর বিবেককে নিয়ে নয়। খুদে একটা ইস্পাত মোড়া বাক্সে যত্নের সঙ্গে নিজের বিবেককে তালা দিয়ে রাখতে পেরেছেন বলে গর্ব অনুভব করেন গুগলি।

সংকট ঔচিত্যবোধকে নিয়ে। তাঁর দর্শন হল, আইন অবশ্যই থাকতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে আইনকে বাঁকা করার সুযোগও থাকা চাই; আর শুধু আইনের রক্ষকদেরই থাকবে আইনকে বাঁকা করার অলিখিত অধিকার। কাজেই বডিগার্ড লোকটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে তাঁর মনে। অপূর্ব একটা সুযোগ এনে দিয়েছে সে, কিন্তু সেই সঙ্গে কর্নেল গুগলির ঔচিত্যবোধের ওপর একটা আঘাত হেনেছে। প্রায় সারারাত এই বোধের সঙ্গে মনে মনে কুস্তি লড়লেন তিনি, তারপর একটা সম্মানজনক আপসে পৌঁছুলেন। খুব সকালে তাঁর বস্‌, জেনারেলের কাছে ছুটে গেলেন তিনি। সব ঘটনা খুলে বললেন তাঁকে, নিজের সঙ্গে কিভাবে আপস করতে চান তা-ও ব্যাখ্যা করলেন। জেনারেল গুগলিকে বিশ্বাস করেন, তাঁর ওপর আস্থার কোন অভাব নেই। দু'জনে একমত হলেন, কেসটার পুরো দায়িত্বে শুধু গুগলিই থাকবেন। প্রেসকে কিছুই জানানো হবে না, যদিও দু'চারদিনের মধ্যেই গন্ধ শুঁকে সব কিছু জেনে যাবে তারা।

ঠিক হল, মিলানের কাজ সেরে রোমে চলে যাবে পাধানি, আতুনি বেরলিং-গারের কাছাকাছি থাকবে। আর গুগলি আসবেন নেপলসে। নেপলসে রেমারিক রয়েছে, বডিগার্ডের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গুগলি আগেই সন্দেহ করেছেন, রহস্যের

অন্তত একটা চাবি এই রেমারিক, সম্ভবত প্রস্তুতির কাজে এই লোক বডিগার্ডকে সাহায্যও করেছে। নিদের্শ দেয়া হল, প্রেজো ফিসো বোর্ডিং হাউসের টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করতে হবে, খুলে দেখতে হবে সমস্ত চিঠি-পত্র। গুগলি বডিগার্ড সম্পর্কে সব কিছু জানতে চান—তার যোগ্যতা, চরিত্র, আদর্শ, বাঁধন। শুধু রেমারিকই তাঁর কৌতূহল মেটাতে পারে।

মিলান থেকে নেপলসে আসার জন্যে রওনা হলেন গুগলি, দু'ঘন্টা পর মিলান কারাবিয়ানরির রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার একটা কনফিডেনশিয়াল মেমোর কপি ফাইল বন্দি করল, কিন্তু তার আগে মেমোটা বার বার পড়ল, মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত থামল না। সন্ধের পর এক বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খেল সে, সেই সঙ্গে টাকা ভর্তি একটা ভারি ব্যাগ হাতবদল হল। গুগলি যখন রেমারিকের রান্না করা ফ্রিটো মিসটোর স্বাদ আস্বাদন করছেন, রোমে বসে বেরলিংগার তখন ফোনে গামবেরির কথা শুনছে, অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে উঠেছে তার চোখ। বলাই বাহুল্য, ফনটেলার অনুপস্থিতিতে গামবেরিই এখন মিলানের সর্বময় কর্তা।

গামবেরির তথ্যে কোন গলদ নেই, শুধু কর্নেল গুগলির মত সে-ও রানার আসল পরিচয় জানতে পারল না। ওকে তারা দু'জনই মার্সেনারি হাসান বলে ভুল করছে। হাসানের অতীত ইতিহাস জানাবার সময় গামবেরিকে তেমন উৎকণ্ঠিত বলে মনে হল না। কারণ বডিগার্ডের মৃত্যু তালিকায় তার নাম নেই।

কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল বেরলিংগার, তারপর চিন্তা করতে বসল। খানিক পর বিশেষ একটা নাম্বারে ডায়াল করে পালার্মোর সঙ্গে যোগাযোগ করল সে, কথা বলল ডন বাকালার সঙ্গে। হত্যাকারীর পরিচয় সম্পর্কে একটা কথাও বলল না, জানে, ডন বাকালা তা ইতিমধ্যে জেনেছেন। পুলিস আর কারাবিনিয়ারি বলতে গেলে খুনীর বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশনই নিচ্ছে না। জেনারেল অ্যালার্ট পর্যন্ত ইস্যু করা হয়নি। কেসটার সমস্ত দায়িত্ব নাকি কর্নেল গুগলির হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, কিন্তু কর্নেল মিলান ছেড়ে চলে গেছে আজ সকালে, কোথায় গেছে কেউ জানে না। বোঝাই যাচ্ছে, এর সঙ্গে রাজনীতি জড়িত। সবশেষে বেরলিংগার বলল, 'বেজন্মারা আমাদের দুরবস্থা দেখে খুশিতে বগল বাজাচ্ছে।'

ডন বাকালার সঙ্গে কথা বলার পর বেরলিংগারকে আগের চেয়েও চিন্তিত দেখাল। কারণ, সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, ডন বাকালা ভয় পেয়েছে। জোরাল কোন আশ্বাস তো দিলই না, স্পষ্ট কোন নির্দেশও এল না। গডফাদারকে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হল। উল্টে বেরলিংগারের কাছ থেকে পরামর্শ চাইল সে। বেরলিংগার অবশ্য কার্পণ্য করেনি, যথা সম্ভব অভয় দিয়েছে। পুলিসও যদি বডিগার্ডকে সাহায্য করে, মাফিয়ানদের হাত থেকে তবু তার নিস্তার নেই। পরিচয় যখন জানা গেছে, ঘন্টা কয়েকের মধ্যে খুঁজে বের করা হবে তাকে। অর্গানাইজেশনের প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এরই

মধ্যে।

কিন্তু বেরলিংগার ভাবছে, ডন বাকালার প্রতিক্রিয়া এরকম হবে কেন! সন্দেহ নেই, খুনী ভয়ঙ্কর একটা হুমকি। একেবারে একা হয়েও এতগুলো লোককে খুন করে কেটে পড়া, তার অসাধারণ বুদ্ধি আর বিস্ময়কর যোগ্যতার পরিচয়ই বহন করে। কিন্তু তাই বলে ডন বাকালার মত একজন সম্রাট নিঃসঙ্গ একজন খুনীকে ভয় পাবে কেন? বেরলিংগার ধারণা করল, বাকালার এই প্রতিক্রিয়া আসলে একজন রাজনীতিকের প্রতিক্রিয়া। সে নিজে এই সম্মানজনক অবস্থায় পৌঁচেছে খুন-খারাবির সাহায্যে। প্রচুর মৃত্যু দেখেছে সে। কিন্তু ডন বাকালার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা, সে উঠেছে কূটনীতির সাহায্যে। খুন-খারাবির নির্দেশ দিয়েছে বটে, কিন্তু নিজের হাতে কখনও রক্ত লাগতে দেয়নি। আমি যদি একজন সৈনিক আর জেনারেল হই, ভাবল বেরলিংগার, বাকালা তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান। বাকালার ভয় পাবার আরও একটা কারণ খুঁজে পেল সে—এই প্রথম কেউ তার জন্যে হুমকি হয়ে দেখা দিল। এর আগে সরাসরি কেউ তাকে খুন করবে বলে ভয় দেখায়নি। হয়ত এ-লাইনে অভিজ্ঞতার অভাবই ডন বাকালাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

গোটা ব্যাপারটার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা দেখতে পেল বেরলিংগার। ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার, আর নজর রাখা দরকার এরপর কি ঘটে। সবশেষে, বিছানায় যাবার আগে, নিজের ব্যক্তগত নিরাপত্তার ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দিল সে। এই দশ তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সে-ই মালিক, পেন্টহাউসে থাকে সে। বেসমেন্ট গ্যারেজ থেকে টপ ফ্লোর পর্যন্ত সিকিউরিটির ব্যবস্থা আরও কড়া, আরও নিশ্ছিদ্র করতে হবে, গার্ডদের অগোচরে একটা পিঁপড়েও যেন ঢুকতে না পারে। একই নির্দেশ দেয়া হল তার অফিসের বেলায়, সে বিল্ডিংটাও তার নিজস্ব।

এক বিল্ডিং থেকে আর এক বিল্ডিঙে আসা-যাওয়ার ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা নেই। তার একটা বিস্ময়কর ক্যাডিলাক আছে। তিন ইঞ্চি পুরু আর্মার প্লেটিং, বুলেটপ্রুফ জানালা। এই গাড়িটাকে নিয়ে বেরলিংগারের গর্বের অন্ত নেই। গত ক'বছরে দু'বার তার গাড়িকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়, একবার হেভী ক্যালিবার পিস্তল দিয়ে, আরেকবার সাবমেশিনগান দিয়ে। দু'বারই গাড়িতে ছিল সে, কিন্তু তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। তবু, নতুন একটা নির্দেশ জারি করল সে। এখন থেকে গাড়ি ভর্তি বডিগার্ড ক্যাডিলাকের পিছু নেবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও খাবে না সে। জানে, যত মাফিয়ান বস্ মারা যায় তাদের বেশিরভাগই মরে রেস্তোরাঁয়—কিন্তু ফুড পয়জনিঙে নয়।

সত্যি ভয় পেয়েছে ডন বাকালা। এ তার কাছে সম্পূর্ণ এক নতুন অনুভূতি। দুর্ধর্ষ একজন খুনী তাকে খুন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এই চিন্তাটাই তাকে অসুস্থ করে

তুলেছে।

বেরলিংগার অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে—আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পর বিপদ কেটে যাবে। কিন্তু তবু খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না বাকালা। প্যানেল লাগানো স্টাডিতে ডেস্কের পিছনে বসে আছে সে, কেমন যেন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে তার। কাগজ-কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসল, ভিলা কোলাসির নিরাপত্তার জন্যে জরুরি ভিত্তিতে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। ভিলাটাকে সে দুর্গম একটা দুর্গ বানাতে চায়।

নির্দেশগুলো লেখা শেষ হল না, ফোন বাজল। নেপলসের বস্ জানাল, প্রেজো ফিসোর মালিকের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। সেই বজ্জাত কর্নেল গুগলি পাহারা দিচ্ছে ভিটেলা রেমারিককে।

ডন বাকালার ভয় আরও একটু বাড়ল।

পশমের আচ্ছাদনের ওপর ছক্কা ফেলল রেমারিক। দুটো চার। ব্যস্ত হাতে কলম তুলে নিয়ে দ্রুত হিসেব করল সে। বলল, 'পঁচাশি হাজার লিরা।'

ক্ষীণ একটু কষ্টসাধ্য হাসি দেখা গেল কর্নেলের ঠোঁটে। 'আপনি ঠিক বুদ্ধিই দিয়েছিলেন, কোন শ্লেটেলেই ওঠা উচিত ছিল না আমার।'

আজ তিন দিন প্রেজো ফিসোতে আছেন তিনি। ভোজন রসিক মানুষ, কিচেনে সাহায্যও করেছেন রেমারিককে। রেগুলার কাস্টমারদের কোন ধারণাই নেই যে তাদের সালাদ আজ একজন পুরোদস্তুর কর্নেল তৈরি করেছেন। ব্যাকগ্যামনে এ-পর্যন্ত তিনশো হাজার লিরা হেরেছেন বটে, কিন্তু রেমারিকের সঙ্গে চমৎকার সময় কেটেছে। সত্যি কথা বলতে কি, রেমারিকের প্রতি শ্রদ্ধা এসে গেছে তাঁর, ব্যাকগ্যামনে ও একটা জিনিয়াস।

কিন্তু শুধু শ্রদ্ধা নয়, মধুর একটা বন্ধুত্বও গড়ে উঠছে। এর একটা কারণ এই হতে পারে, বিপরীত চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ। দু'জন মানুষের মধ্যে এর চেয়ে বেশি অমিল থাকতে পারে না। রেমারিক গম্ভীর, মিতভাষী, সতর্ক, তার নাক ভাঙা। গুগলি হাসিখুশি, সদালাপী, লম্বা, সুদর্শন। তবু এই নিয়াপলিটান লোকটাকে দারুণ ভাল লেগে গেল কর্নেলের। আড়ষ্ট ভাবটা দূর হবার পর রেমারিক যখন মুখ খুলল, বোঝা গেল নিজের সমাজ আর দুনিয়াদারি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে সে। শুকনো এক ধরনের রসিকতাবোধও আছে তার মধ্যে। রেমারিকের অতীত সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন তিনি, সেজন্যই বর্তমান পেশায় সে সন্তুষ্ট কিনা বারবার জানতে চান। এভাবে জীবন কাটাতে একঘেয়ে লাগে না?

মাথা নেড়ে, মৃদু হেসে জবাব দিয়েছে রেমারিক, উত্তেজনা দরকার হলে অতীত রোমন্থন করে সে। তাছাড়া, মাঝে-মধ্যে দু'একটা দুর্লভ সুযোগ আসে, তখন উত্তেজনার কোন অভাব থাকে না—এই যেমন, ব্যাকগ্যামন খেলায় অতি শিক্ষিত পুলিস অফিসারকে হারিয়ে দেয়া।

প্রথম দিকে কর্নেলকে একটা ধাঁধা বলে মনে হয়েছিল রেমারিকের। তারপর ভদ্রলোকের বিদ্রূপ মেশানো মন্তব্য, দিল খোলা হাসি, খেলায় গো-হারা হেরেও প্রতিপক্ষকে প্রশংসা করার ধরন, ইত্যাদি দেখে ভেতরের সরল আর সৎ মানুষটাকে চিনতে পারে সে। দ্বিতীয় রাতে কর্নেলের বড় ভাই ডিনার খেতে এসেছিলেন। তিনজন মিলে একটা উৎসব মত করেন। অত বড় সার্জেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে গর্ব বা অহমের ছিটেফোঁটাও দেখেনি রেমানিক। দু'ভাইয়ের দরাজ গলার হাসির সঙ্গে তাকেও হাসতে হয়েছে। তিনজন ওরা দু'বোতল মদ সাবাড় করে ফেলে।

দু'ভাইয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা রয়েছে। পারিবারিক আলোচনায় তারা রেমারিককে ভিড়িয়ে নিল। তারপর এক সময় লুবনার বডিগার্ডের প্রসঙ্গও উঠল। কর্নেলের বিশ্বাস, বডিগার্ডের সঙ্গে রেমারিকের কোন না কোন যোগাযোগ আছে। কিন্তু স্বীকার করার জন্যে রেমারিককে চাপ দিলেন না তিনি। দিনে কয়েকবার করে রোমে টেলিফোন করেন, কথা বলেন সহকারী পাধানির সঙ্গে। প্রতিবারই পাধানি তাঁকে জানায়, রেমারিকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ কোন ফোনকল আসেনি। চিঠিগুলোর ব্যাপারেও একই কথা। 'আড়িপাতা যন্ত্রে শুধু আপনার-আমার কথা টেপ হয়েছে।'

তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই কর্নেলের। সাংবাদিকরা ইতিমধ্যে আসল ঘটনা প্রায় জেনে ফেলেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন কাগজে বডিগার্ডের পরিচয় ছাপা হয়নি। অসৎ শিল্পপতিকে গালাগাল করছে কাগজগুলো, যে-লোক টাকার লোভে নিজের মেয়েকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, তার মত হীন-চরিত্র ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। নামকরা ল-ইয়ার আলবারগো লোরানকেও ছেড়ে কথা বলছে না তারা। এক সম্পাদকীয়তে লেখা হল, এ-ধরনের শিক্ষিত লোকগুলো আসলে সমাজের বিষফোঁড়া; কে জানে, হয়ত বিস্ফোরণের সাহায্যে এদেরকে উৎখাত করাই সবার জন্য মঙ্গল।

এ-সব ঘটনা জোড়া দিয়ে একটা গল্প দাঁড়িয়ে গেছে, আসল কাহিনীর সঙ্গে তার পার্থক্য সামান্যই। গুগলি মনে মনে ভাবেন, সব যখন ফাঁস হয়ে যাবে, দেশের সাধারণ মানুষ কিভাবে নেবে সেটাকে? মানুষ জানবে, ব্যাপারটার ইতি ঘটেনি, নিকট ভবিষ্যতে আরও রোমহর্ষক ঘটনা ঘটবে। কি ভাববে তারা, তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে?

বডিগার্ডকে নিয়ে অনেক কথা ভাবেন গুগলি। একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করেছেন তিনি, রেমারিক কখনও ভুলেও তার নাম উচ্চারণ করে না। ও, বন্ধু, এইসব বলে। রেমারিকের কথা শুনে বডিগার্ডের একটা ছবি কল্পনা করে নিয়েছেন তিনি। লুবনার প্রতি লোকটার ভালবাসা তিনি উপলব্ধি করেন। লুবনার রক্ষক ছিল সে, কিন্তু তাকে রক্ষা করতে পারেনি। লোকটার প্রতি সহানুভূতি বোধ করেন

তিনি। এমনকি তার এই প্রতিশোধ স্পৃহাও মনে শ্রদ্ধার ভাব এনে দেয়।

রেমারিক বলেছে, বন্ধুকে সে শেষবার দেখেছে হাসপাতালে। গুগলি তর্ক করেননি, কাঁধ ঝাঁকিয়ে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাই ঘটুক, তাঁর ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। বেরলিংগার আর বাকালা ভুগুক না দুশ্চিন্তায়।

কিন্তু আসল কথা, ব্যাকগ্যামন খেলায় তিনি হারছেন। 'যথেষ্ট হয়েছে,' রেমারিক আরেক দফা খেলার আয়োজন করছে দেখে বললেন তিনি। 'আর নয়। পাবলিক সার্ভেন্ট হয়ে প্রতিদিন এক হপ্তার বেতন হারার সামর্থ্য আমার নেই।'

টেরেসে বসলেন গুগলি, অন্যমনস্ক। তাঁকে শ্যাম্পেন অফার করল রেমারিক। সূর্য দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে। একটু পর ডিনার তৈরি করার জন্যে কিচেনে গিয়ে ঢুকবে রেমারিক।

আধঘন্টা পর মিলান থেকে একটা ফোন পেলেন গুগলি। কথা শেষ করে কিচেনে ঢুকলেন তিনি। 'ভিটো আভান্তি,' মৃদু কণ্ঠে বললেন। 'আত্মহত্যা করেছে।'

'ঠিক জানেন, আত্মহত্যা?' জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

মাথা ঝাঁকালেন গুগলি। 'সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আটতলার অফিসে ছিল সে, জানালা দিয়ে কার্নিসে নেমে পড়ে। মনস্থির করার আগে ওখানেই আধ ঘন্টা বসেছিল।'

মাংস কাটায় ব্যস্ত হয়ে উঠল রেমারিক। তারপর, হঠাৎ হাত থামিয়ে মুখ তুলল, 'ওর স্ত্রীকে আপনি চেনেন?'

'একবার দেখেছি,' বললেন গুগলি। 'কোন কথা হয়নি।' সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা বর্ণনা করলেন তিনি।

রেমারিক বলল, 'প্রথম দিকে তার আচরণ অন্য রকম ছিল। সব দোষ আমার বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়েছিল সে।'

রেমারিককে সাহায্য করার প্রস্তাব দিলেন গুগলি। নিস্তব্ধতা ভেঙে এক সময় বললেন, 'ভিটো যখন মনস্থির করার চেষ্টা করছে, পুলিস তখন কোন উপায় না দেখে তার স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলে। সে যেন বুঝিয়ে-শুনিয়ে স্বামীকে ক্ষান্ত করে। জানেন, লরা আভান্তি কি বলেছে?'

'কি?'

মাথা নাড়লেন গুগলি। 'কিছুই না—কিচ্ছু বলেনি, শুধু খিলখিল করে হেসেছে ফোনে।'

আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা। খানিক পর বিড়বিড় করে গুগলি বললেন, 'আশ্চর্য এক মহিলা—কিন্তু ভারি সুন্দরী।'

ভুরু কুঁচকে তাঁর দিকে তাকাল রেমারিক, কিছু বলতে গেল, কিন্তু তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করেই থাকল সে।

আট

ইউরোপের প্রতিটি রাজধানীতে একটা করে অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাস আছে, আর প্রতিটি দূতাবাসের পাশের রাস্তায় পার্ক করা অবস্থায় পাওয়া যাবে হাউজ-ট্রেইলর ও মোবাইল হোম। সাধারণত গরম কালে, দিনের বেলা দেখা যায় ওগুলোকে। সবই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, বিক্রি করার জন্যে। কিন্তু শুধু অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাসের কাছে কেন, কেউ তা জানে না।

রোমও এর ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু সময়টা শেষ গ্রীষ্ম বলে ভেহিকেল দেখা গেল মাত্র একটা—বেডফোর্ড চেসিসের ওপর একটা মোবেক্স।

সুসান আর রকি, প্রেমিক প্রেমিকা। একজন খদ্দেরের আশায় অপেক্ষা করছে ওরা।

রকির বয়স আটাশ। তার চেহারার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ক'টা রঙের চুল। মাথা থেকে ফুলেফেঁপে নেমে এসে চুলগুলো তার ঘাড়, গলা, কাঁধ, পিঠ আর বুক ঢেকে ফেলেছে। চুলের রাজ্য থেকে পিট পিট করছে বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া খুদে আকারের চোখ। পরনে ডেনিম ওভারঅল, মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিলে ধুলে ক'সের ময়লা বের হবে তাই নিয়ে দেশ জুড়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যাবে।

সুসানের বয়স পঁচিশ। আগাগোড়া বিশাল তার আকৃতি। মোটা নয়, স্রেফ বড় বেশি বাড়। দেখতে খারাপ নয় সুসান, কিন্তু তার বিশাল কাঠামো ঠিক নারীসুলভ নয়।

ওরা অস্ট্রেলিয়ান, ওদের গল্পও প্রবাসী আর সব অস্ট্রেলিয়ানদের মত। দেশে অধ্যাপনা করছিল রকি, একটা কলেজে প্রবাসী ইটালিয়ানদের ইংরেজি পড়াত। একই কলেজের একজিকিউটিভ সেক্রেটারি ছিল সুসান। মন দেয়া-নেয়া চলছিল আগে থেকেই, হঠাৎ দু'জন ঠিক করল, এই নিরানন্দ জীবন ভাল্লাগছে না, জ্ঞান বাড়াবার জন্যে দুনিয়াকে একবার ঘুরে দেখে আসতে পারলে হয়। যেই ভাবা সেই কাজ, ব্যাংকে যা ছিল সব তুলে জাহাজে চেপে বসল ওরা। চলে এল ইটালিতে। কিন্তু দুনিয়া দেখার সাধ তাদের মিটল না, কারণ ইটালিতে একমাস কাটিয়ে তাদের পকেট খালি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে প্রচুর শিক্ষা হয়েছে ওদের, মোবেক্সটা বিক্রি করে এখন ওরা ঘরের সন্তান ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচে।

তিন দিন কেটে গেল এখানে, অথচ খদ্দেরের দেখা নেই। মোবেক্স বিক্রি করতে না পারলে জাহাজের টিকেট কেনা হবে না। দু'জনেই খুব উদ্বিগ্ন। এই সময় একজন সম্ভাব্য খদ্দের পেয়ে ভীষণ খুশি হয়ে উঠল সুসান।

বয়স্ক একজন লোক, কিন্তু হাবভাবে প্রাণচঞ্চল তরুণ। দেখে মনে হয় বিদেশী, কিন্তু বিশুদ্ধ ইটালিয়ান ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি বিক্রির জন্যে?'

রকি চিরকালই একটু বেয়াড়া টাইপের, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে, বলল 'না, এখানে এটাকে রেখেছি লোককে দেখাবার জন্যে।'

কথা না বলে লোকটা ঘুরেফিরে ভাল করে দেখল ভেহিকেলটা। চাপা উত্তেজনা নিয়ে পেভমেন্ট থেকে উঠে দাঁড়াল সুসান, বিশাল পশ্চাদ্দেশ থেকে ধুলো ঝাড়ল হাত চাপড়ে। 'সত্যি তোমার কেনার ইচ্ছে আছে?' জানতে চাইল সে। তার কণ্ঠস্বর কিছুটা পুরুষালি।

লোকটা তার দিকে তাকাল, মাথা ঝাঁকাল ছোট্ট করে। অমলিন হাসি দেখা গেল সুসানের মুখে। রকিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হল।

'এঞ্জিনটা দেখতে পারি?'

মোবেক্সের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করছে সুসান, ওদের পিছু পিছু ঘুরছে রকি। তারপরই সুসান প্রস্তাব দিল, ভেতরে বসে ঠাণ্ডা বিয়ার খাওয়া যাক। মোবেক্স মাত্র দু'বছরের পুরানো, দশ হাজার মাইল চলেছে। দর কষাকষিতে সুসানকে টলানো খুব কঠিন, বুঝতে পেরে বেশি জেদ করল না লোকটা। শেষ পর্যন্ত দশ মিলিয়ন লিরায় রফা হল। লোকটা জানতে চাইল, ট্র্যান্সফার পেপার তৈরি আছে তো?'

'আছে,' বলল সুসান। 'পুলিস স্টেশনে গিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে হবে।' ফর্মটা পূরণ করা হল। ক্রেতা নিজের নাম লিখলঃ বর্দিয়ের মন্টি। জাতীয়তাঃ ফ্রেঞ্চ।

'তিন দিন পর ডেলিভারি নেব আমি,' ছোট ফোল্ডিং-টেবিলের ওপর কাগজটা ঠেলে দিয়ে বলল লোকটা।

সন্দেহের চোখে তাকাল সুসান। 'অ্যাডভান্স করছ তো?'

এরপর ওরা একটা ধাক্কা খেল। জ্যাকেটের পকেট থেকে টাকার বড় একটা তাড়া বের করল লোকটা, নোটগুলো এক লক্ষ লিরার। গুনে গুনে একশো নোট তাড়া থেকে আলাদা করে টেবিলের ওপর রাখল সে। 'কিন্তু কাগজগুলো তার আগেই রেজিস্ট্রি কোরো না।'

অনেকক্ষণ কথা বলল না কেউ। নিস্তব্ধতা ভাঙল রকি, 'তুমি দেখছি সরল ভাবে বিশ্বাস করলে আমাদের। টাকা আর মোবেক্স নিয়ে আমরা যদি পালিয়ে যাই?'

খুদে চোখ জোড়ার দিকে তাকাল লোকটা। কিছু বলল না, শুধু হাসল।

সুসান জানতে চাইল, 'এখান থেকে ডেলিভারি নেবে তো?'

মাথা নাড়ল লোকটা। পকেট থেকে রোমের একটা রোড ম্যাপ বের করে ভাঁজ খুলল, আঙুল রাখল একটা ক্রস চিহ্নে। জায়গাটা শহরের বাইরে, পুব অটোস্ট্র্যাডার কাছাকাছি। 'মন্টি অ্যান্টিনি ক্যাম্পসাইটটা···ওখানেই বিকেলের দিকে গিয়ে বুঝে নেব। কোন অসুবিধে নেই তো?'

'না, অসুবিধে কি,' বলল সুসান। 'ইতিমধ্যে আমরা আমাদের ব্যাগগুলো

রেলওয়ে স্টেশনে রেখে আসতে পারব।'

'কোন দিকে যাচ্ছ তোমরা?'

'ব্রিন্দিসি,' বলল সুসান। 'ওখান থেকে ফেরি ধরে গ্রীসে।' চট করে একবার রকির দিকে তাকাল সে, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রকি। লোকটার কাছ থেকে বেশ কিছু বেশি টাকা আদায় করা গেছে, কাজেই গ্রীস হয়ে দেশে ফিরতে কোন অসুবিধে নেই এখন।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল লোকটা, চারদিকে আরেকবার চোখ বুলাল। মোবেক্সের ভেতরটা ছোট, কিন্তু আরামদায়ক। কি যেন ভাবছে। সুসান, তারপর রকির দিকে তাকাল সে। নিঃশব্দে দেখল দু'জনকে। অবশেষে মুখ খুলল, 'আমিও দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি। চাইলে তোমাদেরকে লিফট দিতে পারি।'

প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। মন্দ কি, বলল সুসান। রকি খানিক ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল। লোকটা ব্যাখ্যা করে বলল, তার কোন ব্যস্ততা নেই। তিন থেকে চার দিন পথেই থাকবে সে। কথা প্রসঙ্গে বলল, তাহলে ব্রিন্দিসিতে না পৌঁছুনো পর্যন্ত রেজিস্ট্রি করার দরকার নেই।

লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, কাজেই লোকটাকে আরও কিছুক্ষণ থেকে যেতে বলল সুসান। টিনের খাবার রান্না করল সে, আরও বিয়ারের ক্যান খুলল রকি।

রানা চলে যাবার পর রকি মন্তব্য করল, 'ফ্রেঞ্চ না ছাই, ডাহা মিথ্যে কথা বলে গেল।'

'কি করে জানলে?'

'গায়ের রঙ দেখলে না?'

'কেন, ফ্রান্সে তো ওর চেয়েও কালো লোক আছে।'

অপ্রতিভ দেখাল রকিকে। 'মোট কথা, লোকটাকে আমার ফ্রেঞ্চ বলে মনে হয়নি, তেমন সুবিধের বলেও মনে হয়নি। কেমন উদ্ভট আচরণ, লক্ষ করেছ? একটা ঠিকানা পর্যন্ত না দিয়ে স্রেফ উঠে চলে গেল।'

কাঁধ ঝাঁকাল সুসান। 'তা যাক গে, পুরো টাকা তো দিয়ে গেছে। খানিক পর আবার বলল, 'চেহারা দেখে আজকাল লোক চেনা কঠিন, তা ঠিক।'

'এই বয়সেও কেমন শক্ত-সমর্থ লক্ষ করেছ? কিভাবে হাঁটে দেখেছ? মনে হয় বাইশ বছরের শরীরে বাহান্ন বছরের চেহারা। বাজি রেখে বলতে পারি, তুমিও ওর সাথে পারবে না।' দাঁত বের করে হাসতে লাগল রকি।

সুসানও হাসল। 'আমার কিন্তু লোকটাকে খারাপ লাগেনি। বেশি দরদাম করেনি। স্বভাবটা খুঁতখুঁতে নয়। এর বেশি কি দরকারই বা আমাদের?'

নিঃশব্দে টেরেসে বেরিয়ে এল রেমারিক। হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তার মধ্যে, কর্নেল গুগলির দৃষ্টি এড়ায়নি। একটা চেয়ার টেনে বসল. কর্নেলের

দিকে না তাকিয়ে পট থেকে চা ঢালল কাপে। তার চেহারায় দ্বিধা আর উদ্বেগ। ফোনটা এসেছে প্রায় এক ঘন্টা আগে, দশ মিনিট কথা বলার পর রিসিভার নামিয়ে রাখে রেমারিক। তারপর থেকেই গম্ভীর সে, একটা কথাও বলেনি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন গুগলি। ফোনে কোন তাৎপর্যপূর্ণ আলাপ হয়ে থাকলে এক ঘন্টার মধ্যে পাধানির কাছ থেকে জানতে পারবেন তিনি।

কফি খেতে খেতে মনস্থির করে ফেলল রেমারিক। 'আমার বন্ধু যদি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করে, কি ঘটবে?'

কর্নেলের পালস রেট বেড়ে গেল। ফোন কলটার তাহলে সত্যিই তাৎপর্য আছে। গম্ভীর হলেন তিনি, বললেন, 'জেলে তাকে অবশ্যই যেতে হবে। তবে, যে-ধরনের লোকদের সে খুন করেছে, আর তার যে মোটিভ, সাজাটা হবে বড়জোর বছর পাঁচেকের। বিশেষ ব্যবস্থাও করা সম্ভব। ধরুন, সব মিলিয়ে বছর আড়াইয়ের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাবে সে।'

'কিন্তু ওকে কি জেলখানার ভেতর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে?'

'কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি,' বললেন গুগলি। 'ইটালির জেলখানা মাফিয়ার দখলে, সত্যি কথা। কিন্তু দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আপনার বন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। রোমের বাইরে নতুন একটা জেলখানা তৈরি করেছি আমরা, শুধু কারাবিনিয়ারির লোকজন কাজ করছে ওখানে। আপনার বন্ধুর নিরাপত্তার ব্যাপারে গ্যারান্টি দেব আমি। আসলে, তার বিপদ শুরু হবে জেলখানা থেকে বেরুবার পর।'

'আত্মসমর্পণের কথা ভুলে যান,' বলল রেমারিক। 'আপনাকে যদি অনুরোধ করা হয়, আমার বন্ধুকে নিরাপদে ইটালি ত্যাগ করার ব্যবস্থা করে দিন, আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে?'

'আগে জানতে হবে অনুরোধটা কে করছে।'

'ধরুন, আপনার বস্, জেনারেল যদি করেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন গুগলি। 'তাঁর নির্দেশ আমি খুশি মনে শিরোধার্য বলে মেনে নেব।'

'সেই নির্দেশই পেতে যাচ্ছেন আপনি,' বলল রেমারিক। হাতঘড়ি দেখল সে। 'আর বেশি দেরি নেই।'

চটে উঠলেন গুগলি। 'মানে?'

'আরও কয়েকটা তথ্য দিই আপনাকে,' বলল রেমারিক। 'তার আগে বলুন, মাসুদ রানা নামটা আগে কখনও শুনেছেন?'

'মাসুদ রানা···মাসুদ রানা—হ্যাঁ, শুনেছি। বাংলাদেশের একজন দুর্দান্ত স্পাই।'

'আপনি যাকে লুবনার বডিগার্ড হিসেবে জানেন, যাকে হাসান নামে চেনেন, আমার বন্ধু, সে ওই মাসুদ রানা—মার্সেনারি হাসানের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে।'

ব্যাপারটা হজম করতে তিন সেকেণ্ড সময় নিলেন গুগলি। 'মাই গড!' রেমারিকের দিকে ঝুঁকলেন তিনি। 'কিন্তু হঠাৎ সব গড়গড় করে বলে ফেলছেন, ব্যাপারটা কি?'

'রানার এখন খুব বিপদ,' বলল রেমারিক। 'ডন বাকালা তার পরিচয় জেনে ফেলেছে। কিছুই গোপন নেই, ফাঁস হয়ে গেছে সব। রানার বর্তমান চেহারার একটা ছবিও তার হাতে পৌঁচেছে, ডোশিয়ে সহ।'

'কিভাবে?' ভুরু কুঁচকে উঠল কর্নেলের। 'আমরা কিছুই জানতে পারলাম না, অথচ···।'

'রানার পরিচয় ফাঁস হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে,' বলল রেমারিক। 'আপনি জানেন, মার্কিন মাফিয়া আর ইটালিয়ান মাফিয়ার মধ্যে সেই আদি কাল থেকেই যোগাযোগ আর সম্পর্ক আছে। এখানে বন্ধুদের বিপদ দেখে ওখানের ডনেরা চুপ করে বসে নেই। বাংলাদেশে টেলেক্স পাঠিয়ে হাসান সম্পর্কে খোঁজ-খবর শুরু করে ওরা, আর তাতেই ফাঁস হয়ে যায়। হাসান মারা গেছে মাস কয়েক আগে। তদন্ত আরও জোরেশোরে শুরু হয়, বেরিয়ে পড়ে বডিগার্ডের আসল পরিচয়।'

'কিন্তু মাসুদ রানার মত একজন এসপিওনাজ এজেন্ট বডিগার্ডের চাকরি···?'

'কোন একটা কারণে সি. আই. এ.-এর চোখকে ফাঁকি দেয়ার দরকার পড়ে ওর, তাই···'

'ও, আচ্ছা, বুঝেছি,' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল গুগলির। 'এয়ারকিং হাইজ্যাক করে নিয়ে এসে সি. আই.এ.-কে চটিয়ে দেয় আপনার বন্ধু। কিন্তু বিপদটা কি ধরনের? কে ফোন করেছিল আপনাকে?'

'ফোন করেছিল ব্রিগেডিয়ার সোহেল নামে রানার এক বন্ধু,' বলল রেমারিক, 'ঢাকা থেকে। আর রানার বিপদটা হল, ওর চেহারা আর পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার পর, ঢাকা ভাবছে, মাফিয়ানদের হাতে ধরা না পড়ে ওর কোন উপায় নেই। সেজন্যেই ওর বস্ ওকে জরুরি নির্দেশ দিয়েছেন।'

'কি সেই নির্দেশ?'

'স্টপ ইট! লিভ ইটালি ইমিডিয়েটলি!'

কাঁধে একটা দায়িত্বের বোঝা নতুন করে অনুভব করলেন কর্নেল গুগলি। চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। 'আর কি জানেন, সব বলুন আমাকে।'

'বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, মাফিয়ার ওপর আঘাত হানায় সি. আই. এ. নাকি রানার ওপর থেকে মৃত্যু-পরোয়ানা তুলে নিয়েছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাইছে ওরা। ডন বাকালার নিরাপত্তার জন্যে গেরিলা ট্রেনিং পাওয়া বারোজন মার্কিন মাফিয়ান ইটালিতে আসছিল, সি. আই. এ. খবর পেয়ে আটজনকে এয়ারপোর্টে আটক করে। কিন্তু বাকি চারজন আগের দিন রওনা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে সম্ভবত ডন বাকালার ভিলা কোলাসিতে পৌঁছে গেছে তারা। ঢাকা থেকে আরও খবর

আসে—ভিলা কোলাসি এখন একটা দুর্গম দুর্গ, কোন মানুষের সাধ্য নেই ভেতরে ঢোকে। সেজন্যেই রানার বস্ নির্দেশটা পাঠিয়েছেন।'

'এখন আমরা কি করব?'

'আপনার বসের টেলেক্স আসছে। না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

'আপনি বলতে চাইছেন, ঢাকা থেকে আমার বস্‌কে অনুরোধ করা হয়েছে…?'

'আপনি জানেন না, আপনার বস্ আর রানার বস্, খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওঁরা।'

'মেজর জেনারেল রাহাত খান? হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে বস্‌কে তাঁর কথা বলতে শুনি বটে।' চিন্তিত দেখাল কর্নেলকে। 'ঠিক আছে, টেলেক্স পেলাম। তারপর?'

'তারপর আমরা রোমে যাব,' বলল রেমারিক। 'নির্দেশটা পৌঁছে দেব রানাকে।'

'রোমে পৌঁছুতে অনেক সময় লাগবে আমাদের,' গুগলি বললেন। 'তারচেয়ে আমার সহকারী পাধানিকে ফোন করি আমি। দশ মিনিটের মধ্যে রানাকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবে সে।'

'হেডকোয়ার্টারে?' সতর্ক চোখে তাকাল রেমারিক।

'না, মানে…নিরাপদ একটা সেফ-হাউসে,' তাড়াতাড়ি বললেন গুগলি। 'তারপর ওখান থেকে তার দেশ ত্যাগের ব্যবস্থা করা হবে।'

মাথা নাড়ল রেমারিক। 'রানা যদি পাধানি, আর দশ বারোজন পুলিসকে খুন করে বসে, তাকে আপনারা দেশ ছেড়ে চলে যেতে দেবেন?'

যুক্তিটা বুঝলেন গুগলি। 'রানাকে আপনি ফোন করতে পারেন না?'

'ওখানে কোন ফোন নেই।'

'তাহলে দেরি করা বোকামি হচ্ছে, চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

'টেলেক্স না পেয়েই?'

'গাড়িতে ব্যবস্থা আছে,' বললেন গুগলি। 'পাধানির সাথে যোগাযোগ করব আমি।'

বোর্ডিং হাউস থেকে নিচে নামল ওরা। কর্নেলের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, মটরসাইকেলে চড়ে একজন পুলিস এসে থামল সামনে। কর্নেলের হাতে একটা নয়, দুটো টেলেক্স ধরিয়ে দিল সে।

গাড়ি চালাচ্ছে রেমারিক। মেসেজ পড়ছেন গুগলি। তাঁর বস্ বলেছেন, খুনী ধরা পড়লে তার শাস্তির ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। কিন্তু সে যদি ইটালি ছেড়ে পালিয়ে যায়, কিচ্ছুটি করার নেই আমাদের। ব্যবস্থা কর। শেষ কথাটার বিশেষ তাৎপর্য বুঝতে পেরে মুচকি একটু হাসলেন গুগলি।

এরপর তিনি দ্বিতীয় মেসেজটা পড়তে শুরু করলেন। 'হোলি মাদার অভ গড!' হঠাৎ আঁতকে উঠে বললেন তিনি।

'কি হল?' জানতে চাইল রেমারিক।

হাতে ধরা টেলেক্স মেসেজটা ইঙ্গিতে দেখালেন গুগলি। ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি আন্দাজ করেছিলেন রানা মার্সেলেসে গিয়েছিল ইকুইপমেন্ট যোগাড় করার জন্যে। ফ্রেঞ্চ পুলিসকে দিয়ে আর্মস ডিলারের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় কয়েকটা তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

'গগল সব ফাঁস করে দিয়েছে?' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল রেমারিক।

'কিছুই সে বলেনি,' গুগলি বললেন। 'নির্দিষ্ট একটা সময়ের ভেতর যা যা বিক্রি করেছে, তার একটা তালিকা আদায় করেছে ফ্রেঞ্চ পুলিস। আচ্ছা, আর. পি. জি. সেভেন স্ট্রোক ডি জিনিসটা কি বলুন তো?'

গম্ভীর একটু হাসি দেখা গেল রেমারিকের মুখে। 'অ্যান্টিট্যাঙ্ক রকেট লঞ্চার। মার্সেনারিরা ওটাকে জুয়িশ বাজুকা বলে।'

'ইসরায়েলি অস্ত্র?'

'না। রাশিয়ান। কিন্তু রকেট লোড করার পর জিনিসটা দেখতে হয় সারকামসাইজড্ পেনিসের মত।'

গুগলি হাসলেন না। 'রানা ওটা ব্যবহার করতে জানে?'

'কোনটা?'

এবার না হেসে পারলেন না গুগলি। 'মাংসপেশী নয়, আমি ইস্পাতটার কথা জিজ্ঞেস করছি। রানা ওটা চালাতে জানে?'

'অনেকের চেয়ে ভালভাবে।'

'কিন্তু,' বিস্মিত দেখাল কর্নেলকে, 'মাফিয়াদের প্রায় সব কিছুই আছে, ট্যাঙ্ক আছে বলে তো শুনিনি!'

'নেই,' বলল রেমারিক। 'শুধু ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে নয়, অন্য কাজেও ওটা ব্যবহার করা যায়। ধরুন, কেউ যদি বিল্ডিং ভাঙতে চায়, কিংবা স্টীল গেট খুলতে চায়? ওটার ক্ষমতা জানেন? বারো ইঞ্চি পুরু আর্মার প্লেট ভেদ করতে পারে।' মুচকি হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে।

'সন্দেহ নেই, চামড়ার অস্ত্রের চেয়ে একটু বেশিই পারে।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রেমারিক।

হঠাৎ গম্ভীর হলেন কর্নেল। 'রানাকে ওর বস্ থামতে বলায়, আমার ধারণা, আপনাকে হতাশ দেখাবার কথা। কিন্তু তা তো দেখাচ্ছে না। বরং ...'

রেমারিক হাসল না। 'রানা এই পর্যায়ে এসে কারও কথা শুনবে কিনা সেটাই হল প্রশ্ন।'

ঠিক সেই মুহূর্তে রানার কাঁধে রয়েছে ইসরায়েলি বাজুকা, রোমের রাস্তা ধরে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে ও। ক্যানভাসের ব্যাগে শুধু আর. পি. জি. সেভেন স্ট্রোক ডি

নয়, সঙ্গে এক জোড়া রকেটও রয়েছে। ব্যাগটা যে খুব একটা বড় তা-ও নয়, রকেট লঞ্চারটা সাধারণ একটা টিউবের মত দেখতে, সাঁইত্রিশ ইঞ্চি লম্বা, সহজে বহন করার জন্যে প্যাঁচ ঘুরিয়ে মাঝখানে খোলা যায়। জিনিসটার ওজন মাত্র পনেরো পাউণ্ড। এক একটা রকেটের ওজন পাঁচ পাউণ্ডের কিছু কম।

বুড়ো-বুড়ি সবেমাত্র লাঞ্চ শেষ করে সুখ-দুঃখের গল্প শুরু করেছে, দরজায় নক হল। দু'জনেরই বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে, বুড়ির পায়ে বাত, কাজেই বুড়োকেই দরজা খুলতে যেতে হল। প্রথমেই একটা পিস্তল দেখল সে, ভয় পেল সাংঘাতিক। লোকটার চেহারা দেখে ভয় তার বাড়ল বৈ কমল না। কিন্তু লোকটা কথা বলল নরম সুরে, 'আপনাদের কোন বিপদ হবে না। আমি ডাকাতি করতে আসিনি।' ধীরে ধীরে সামনে এগোল সে, একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল বুড়োকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বুড়ো-বুড়িকে চেয়ারে বসিয়ে টেপ দিয়ে আটকে ফেলা হোল। ওদের মুখেও টেপ লাগাল লোকটা, সারাক্ষণ অভয় দিয়ে কথা বলছে সে। ওদের বাড়িটা কিছুক্ষণের জন্যে ধার নিচ্ছে। কোন ভয় নেই, তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না।

একটু একটু করে ভয় কাটিয়ে উঠল বুড়ো-বুড়ি। দু'জনেই আগ্রহের সঙ্গে লোকটার কাজকর্ম দেখতে লাগল। ব্যাগ থেকে মোটা আকৃতির দুটো টিউব বের করল সে, দুটোকে এক করে জোড়া লাগাল। কয়েক মুহূর্ত পর বুড়ো বুঝল, লোকটার হাতে ওটা একটা টেলিস্কোপ লাগানো রকেট লঞ্চার—সেনাবাহিনীতে ছিল সে। তবে এ-ধরনের রকেট লঞ্চার আগে কখনও দেখেনি। জিনিসটা খুবই সফিসটিকেটেড বলে মনে হল। লঞ্চারে একটা মিসাইল ফিট করল লোকটা। এরপর দ্বিতীয় একটা মিসাইল, আর একজোড়া গগলস বের করল। শান্তভাবে বাড়ির পিছন দিকে, উঠনে চলে গেল সে। খোলা জানালা পথে তাকে দেখতে পেল বুড়ো-বুড়ি—নিচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে রাস্তা দেখছে। এই পাঁচিলটাই রাস্তা আর উঠনটাকে আলাদা করেছে।

উল্টোদিকের বিল্ডিঙের পেন্টহাউসে আতুনি বেরলিংগারও এইমাত্র তার লাঞ্চ শেষ করল।

ঠিক দুটো ত্রিশ মিনিটে বেসমেন্ট গ্যারেজে নেমে এল এলিভেটর। দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল বেরলিংগার, পিছনে তার পার্সোনাল বডিগার্ড। ক্যাডিলাক অপেক্ষা করছে, এঞ্জিন সচল। ক্যাডিলাকের ঠিক পিছনেই রয়েছে কালো একটা ল্যানসিয়া, তাতে বসে আছে চারজন বডিগার্ড। ক্যাডিলাকের ব্যাক সিটে উঠে বসল বেরলিংগার, দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল বডিগার্ড। ঢাল

বেয়ে একই সঙ্গে রওনা হল গাড়ি দুটো।

ঢালের মাথায় উঠে আসতে রাস্তা দেখা গেল, কড়া রোদ লেগে ধাঁধিয়ে গেল সবার চোখ। সবাই চোখ কুঁচকে আছে, তবু চওড়া রাস্তার শেষ মাথায়, নিচু পাঁচিলের ওপারে লোকটাকে দেখতে পেল ওরা। ধীরে ধীরে সিধে হল লোকটা।

তার মুখ ভাল করে দেখা গেল না, গগলসে বেশিরভাগটাই ঢাকা পড়ে আছে। মোটাসোটা একটা টিউব রয়েছে ডান কাঁধে। সবই বুঝল ওরা, কিন্তু কিছু করার সময় পেল না। টিউবের পিছন থেকে উথলে উঠল বিরাট একটা অগ্নিশিখা, তার ভেতর থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এল কালো একটা জিনিস। জিনিসটা চোখের পলকে কাছে চলে এল, আর আকারে বড় হয়ে উঠল। চিৎকার জুড়ে দিয়েছে বেরলিংগার, ব্রেকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে ড্রাইভার। ভারি গাড়িটা সামনের দিকে ঝুঁকল, তারপর রিএনফোর্সড স্প্রিঙের ধাক্কা খেয়ে পিছনের চাকার ওপর খাড়া হতে শুরু করল। গাড়িটার উত্থান হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকির সঙ্গে আরও দ্রুত হয়ে উঠল—মিসাইলটা র‍্যাডিয়েটরের মাঝখানে আঘাত করেছে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল এঞ্জিন, ভেতরের সব কিছুতে আগুন ধরে গেল। মুহূর্তের জন্যে রিয়ার ফেণ্ডারের ওপর খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাডিলাক, এই সময় পৌঁছুল দ্বিতীয় মিসাইল।

ফ্রন্ট অ্যাকসেলের ঠিক নিচে আঘাত করল মিসাইল। দশ টন ওজনের গাড়িটা পিছন দিকে ছিটকে পড়ল, ল্যানসিয়ার ওপর।

তাৎক্ষণিক মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারল মাত্র একজন। ল্যানসিয়া চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হতে শুরু করেছে, পিছনের দরজা বিস্ফোরিত হল, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একজন বডিগার্ড। বেরিয়ে এল আগুনের মাঝখানে। চামড়া আর মাংস পোড়ার গন্ধে ভারি হয়ে উঠল বাতাস।

গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছেন কর্নেল গুগলি। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে তাঁর পেশী। বার বার টাইয়ের নট ঠিক করছেন, ভাবছেন একটা আয়না পেলে চেহারাটা একবার দেখে নেয়া যেত।

কিন্তু রেমারিক একা ফিরে এল। তার চেহারায় স্বস্তির ছাপ।

'আপনার বন্ধু, মাসুদ রানা?'

'নেই,' বলল রেমারিক। 'বোধহয় অপেক্ষা করাই উচিত, কি বলেন?'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার সুযোগ হল না। মাত্র তিন মিনিট পর জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও। ক্যাপ্টেন পাধানি কর্নেল গুগলিকে ডাকছে—আর্জেন্ট কল।

গ্যারেজের বাইরে, ঢালের মাথায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন কর্নেল গুগলি আর পাধানি। দু'জনের কারও মুখে কথা নেই। চোখের সামনে যা দেখছেন গুগলি, এ তাঁর অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে। অবশেষে রেমারিকের দিকে ফিরলেন

তিনি। রেমারিক ওদের দিকে পিছন ফিরে রাস্তার দিকে মুখ করে রয়েছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গোল আকৃতির কালো পোড়া দাগ দেখতে পেলেন গুগলি, চুনকাম করা বাড়ির দেয়ালে।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আর. পি. জি. সেভেন স্ট্রোক ডি?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল রেমারিক। 'বলেছিলাম না, অন্য কাজেও ব্যবহার হয় ওটা!'

বিধ্বস্ত, আগুনে পোড়া গাড়ি দুটোর দিকে তাকিয়ে গুগলি বললেন, 'কি? না, শেষ পর্যন্ত সারকামসাইজড পেনিসের আঘাতে মারা গেল দুর্ধর্ষ বেরলিংগার!' তাঁর ঠোঁটে বিদ্রূপ মেশানো হাসির রেখা ফুটে উঠল।

নয়

'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস।'

উদ্ধৃতিটা জানা আছে ডন বাকালার, এর সত্যতাও চাক্ষুষ করেছে সে। কিন্তু বন্দুকের একটা টার্গেট তো থাকতে হবে! নিজেকে তার সেই ভারোত্তোলনকারীর মত লাগল, তোলার মত কিছু পাচ্ছে না যে।

হতাশা আর নৈরাশ্য ভয়টাকে হৃষ্টপুষ্ট করে তুলল। বেরলিংগার ছিল ডান হাত, তার কূটনীতির একটা হাতিয়ার। বেরলিংগার খুন হওয়ায় একেবারে নিরস্ত্র, অসহায় লাগছে নিজেকে। ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু ট্যানডন আর বোরিগিয়ানোর চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। ডেস্কের ওধারে বসে টান টান পরিবেশ থেকেই যা বোঝার বুঝে নিচ্ছে তারা। ডন বাকালার ভয় আর অসহায়-বোধ হতভম্ব করে তুলেছে তাদেরকে, গম্ভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে তারা।

কিন্তু তবু বাকালা তাদের বস্। যা কিছু আছে তাদের—ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সম্পদ, উচ্চাশা—সবই বাকালার ক্ষমতার সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা। তাদের অন্য কোন গতি নেই।

নির্দেশগুলো মন দিয়ে শুনছে তারা। ভিলা কোলাসির সিকিউরিটি আরও জোরদার করতে হবে। দু'দিন আগে হলে বসের এই নির্দেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিত না। ভিলা কোলাসি বিশাল কোন ব্যাপার নয়, ছয়জন সশস্ত্র গার্ডের পাহারা দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু আতুনি বেরলিংগারের মৃত্যু, মৃত্যুর ধরন, তাদের একটা চোখ খুলে দিয়েছে। আরেকটা চোখ খুলেছে ডেস্কে পড়ে থাকা মোটাসোটা ডোশিয়েটা। একজন লোক সম্ভব-অসম্ভব কত বিচিত্র কৌশলে ধ্বংস সাধন করতে পারে, কি ভয়ঙ্কর প্রত্যয় নিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে যে-কোন মাপের প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ওই ডোশিয়ে না পড়লে বিশ্বাস করা কঠিন। ধ্বংস, বিনাশ, হত্যা আর রক্তপাত নিয়েই তাদের কারবার, কিন্তু এই লোকের তুলনায় তারা যেন এখনও মায়ের

কোলে পড়ে দুধ খাচ্ছে।

বাইরে পাঁচিল, তার ওপাশে আরও দুশো মিটার জায়গায় ফ্লাডলাইটের আলো চাই। আশেপাশে যত বিল্ডিং আছে সব কেনা শেষ, এবার ওগুলোকে বুলডোজার দিয়ে মাটির সঙ্গে সমান করে দিতে হবে। ভিলার ভেতর প্রতি ইঞ্চিতে টহল পার্টির পা পড়বে, পালা করে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা পাহারায় থাকবে ওরা। নিউ ইয়র্ক থেকে যে চারজন এক্সপার্ট গেরিলা এসেছে, প্রত্যেক টহল পার্টির সঙ্গে ওদের একজন করে থাকবে। কুকুর জোড়া আজই এসে পৌছুবে, ভিলার সবার গন্ধ নিতে দেয়া হবে ওগুলোকে। যার গন্ধ চিনতে পারবে না, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তাকে। সব মিলিয়ে বিশ বাইশ জন বডিগার্ড, তিন শিফটে কাজ করবে ওরা। গেটে দু'জন গার্ড থাকবে, তাদের একজন হবে মার্কিন গেরিলা। ভিলার গেট থেকে আধ কিলোমিটার দূরে একটা রোডব্লক থাকবে। তল্লাশি ছাড়া কোন গাড়ি ওই রোডব্লক পেরোতে পারবে না। রোডব্লকে ছ'জন লোক থাকবে, দু'জন গাড়ি সার্চে এক্সপার্ট। কোন গাড়ি ভিলার ভেতর ঢুকতে পারবে না। অন্য কোন ডন বা তাদের প্রতিনিধি ভিলায় ঢুকতে চাইলে, আধ ঘন্টার ভেতর একজনের বেশি ঢুকতে পারবে না, তাদের প্রত্যেককে নিখুঁতভাবে সার্চ করতে হবে—কাপড়চোপড় খুলে নিয়ে। তারা ভিলার ভেতর ঢুকলেও, বাকালার সঙ্গে দেখা করার জন্যে খাস কামরায় বা কামরার কাছাকাছি তাদের নিয়ে আসা যাবে না—যদি না বাকালা অনুমতি দেয়। পাঁচিলের ভেতর পঁচিশটা ফলের গাছ রয়েছে, সব কেটে ফেলতে হবে।

এবার পরিস্থিতির আরেক দিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা। সিসিলিতে ঢোকার প্রতিটি পয়েন্টে কড়া নজর রাখতে হবে। নগণ্য জেলেদের গ্রাম থেকে শুরু করে প্রতিটি পোর্ট, প্রতিটি এয়ারস্ট্রিপ, প্রতিটি ট্রেন আর প্রতিটি রাস্তায় সশস্ত্র লোক থাকবে। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই আটক করতে হবে, বাধা দিলে গুলি। প্রতিটি ফেরিতে, প্রতিটি ফেরিঘাটে লোক চাই।

বাকালার বুলেট আকৃতির মাথায় খাড়া হয়ে আছে চুল, চোখ কুঁচকে কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'পুলিস? কারাবিনিয়ারি? এখনও তারা কিছু করছে না?'

'একে করা বলে না,' জবাব দিল ট্যানডন। 'বেরলিংগার খুন হবার পর রোমে নামমাত্র রোডব্লক দেখা গেছে—তা-ও ঘন্টা কয়েক পর। পুলিসকে সর্তক থাকতে বলা হয়েছে, বাঙালিটার চেহারার বর্ণনাও পেয়েছে তারা। কিন্তু তার আসল পরিচয় প্রকাশ করেনি, ফটোও ইস্যু করেনি।'

'বাস্টার্ডস!' খেঁকিয়ে উঠল বাকালা। 'বানচোত গুগলিটার শয়তানি বুদ্ধি এসব। আমাদের বিপদে খুব মজা পাচ্ছে শালারা। বাস্টার্ডস!'

'আজ সকালে পালার্মোয় পৌচেছে সে,' বোরিগিয়ানো বলল।

'সাথে পাধানি, আর সেই নিয়াপলিটানটা,' বাকালা দাঁতে দাঁত চাপল।

'বাস্টার্ডস! ওই শালা রেমারিকটাকে কোনভাবে ধরে আনা যায় না?'

বোরিগিয়ানো দ্রুত মাথা নাড়ল। 'হিলটনের একই স্যুইটে তিনজন রয়েছে, রেমারিককে মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করে না ওরা। ওকে ধরে আনতে হলে গুগলি আর পাধানিকে মারতে হবে।'

'তা সম্ভব নয়, প্রশ্নই ওঠে না,' তীব্র প্রতিবাদ জানাল ট্যানডন। 'পুলিসের গায়ে হাত দেয়া মানে গোটা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা—একবার শুরু হলে তার আর শেষ নেই।'

চেহারায় অনিচ্ছার ভাব নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বাকালা। 'গুগলিও ব্যাপারটা বোঝে।'

'বোঝে বলেই তো এই সুযোগে খোঁচা দিচ্ছে,' বলল বোরিগিয়ানো। 'সে পালার্মোয় বসে থাকলে কি হবে, তার লোকেরা সারা দেশ জুড়ে আমাদের ঘাঁটিতে হানা দিচ্ছে। জেরা করার জন্যে এমনকি গামবেরিকেও নিয়ে গিয়েছিল ওরা। নার্ভাস বোধ করছে সে।'

'পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে গুগলি,' বলল ট্যানডন। 'উত্তরে আর রোমে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। আমাদের লোকদের মধ্যে গুজব ছড়াচ্ছে গুগলি, তাদের মাথা কাটা গেছে, অথচ প্রোটেকশন দেয়ার জন্যে নেই কেউ।'

সামনের দিকে ঝুঁকে ডোশিয়েটা খুলল বাকালা। রানার একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি খুঁটিয়ে দেখল। ঠোঁট, জিভ, টাকরা, গলা, সব শুকিয়ে গেছে তার। ছবির ওপর টোকা দিয়ে বলল, 'এ লোক মারা না যাওয়া পর্যন্ত সমস্যা শুধু বাড়তেই থাকবে।' মুখ তুলল সে, উদাত্ত আহ্বান জানাবার ভঙ্গিতে বলল, 'একে যে খুন করবে, তার কোন অভাব থাকবে না—জীবনের সমস্ত সাধ বিনা আয়াসে ভোগ করতে পারবে সে। আমি তাকে সাত রাজার সম্পদ দান করব। বুঝতে পারছ তোমরা?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ট্যানডন আর বোরিগিয়ানো।

'আমার এই ঘোষণা প্রচার করে দাও,' নির্দেশ দিল বাকালা। ওদের জন্যে আরও একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ডোশিয়ে থেকে রানার ছবিটা বের করে ডেস্কের উপর ছুঁড়ে দিল সে। 'কাল সকালের সবগুলো কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এই ছবিটা দেখতে চাই আমি।'

প্রথমে সামলে উঠল ট্যানডন। 'ডন বাকালা! ওরা তাহলে পুরো ঘটনাটা জেনে ফেলবে—সেটা কি চাই আমরা?'

'শেষ পর্যন্ত জানবেই ওরা,' গডফাদার বলল। 'এরইমধ্যে প্রায় সবটা জেনে ফেলেছে। শুধু গুগলি আর তার ডিপার্টমেন্ট চেপে রেখেছে বলে পুরোটুকু ফাঁস হতে দেরি হচ্ছে।' ছবিটার দিকে আরেকবার তাকাল সে। 'শালার চেহারায় বৈশিষ্ট্য আছে, চোখ দুটো দেখ, কাটা দাগগুলো দেখ—দেখলেই চিনতে পারবে

মানুষ। আমাদের নিজেদের লোক থাকবে রাস্তাঘাটে, কয়েক হাজার—তাদের চোখকে ফাঁকি দেবে কিভাবে? সবখানে ছবিটা পৌছুতে এক দিন লাগবে। আমাদের হয়ে কাগজগুলোই করবে কাজটা।'

'আপনি ওকে হিরো বানিয়ে ছাড়বেন,' সাবধান করে দিয়ে বলল ট্যানডন।

'হিরো মারা যাবে,' ধমকের সুরে বলল বাকালা। 'মরা লোককে বেশিদিন মনে রাখে না কেউ।'

এ-প্রসঙ্গে আর কোন আলোচনা হল না। ট্যানডন বলল, 'এই শালা বাঙালির বস্ যে নির্দেশ দিয়েছে…'

বাকালা বাধা দিয়ে বলল, 'সেটা তার কাছে পৌছায়নি। রোমে গুগলিকে নিয়ে গিয়েছিল রেমারিক, কিন্তু দেখা পায়নি তার।'

'আমি আশা করেছিলাম,' বলল বোরিগিয়ানো। 'সি. আই. এ. যখন শালার ওপর খেপে আছে, ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার পর ওরাই আমাদের হয়ে কাজটা করে দেবে। কিন্তু এখন দেখছি…'

'ইটালিতে আমরা বিপদে পড়েছি দেখে গোটা মার্কিন প্রশাসন আনন্দে বগল বাজাচ্ছে,' বলল বাকালা। 'কংগ্রেস আর সিনেটের কিছু প্রভাবশালী সদস্য চাপ দেয়ায় সি. আই. এ. কর্মসূচী পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। ওরা আশা করছে ওদের কাজ আমরাই করে দেব, আর আমরা যদি খতম হয়ে যাই তাহলে তো আরও ভাল।'

'ইনফরমেশন আরও একটা আছে,' গম্ভীর সুরে বলল ট্যানডন। 'পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার জানা যায়নি, তবে আভাস পাওয়া গেছে, প্রয়োজনে বাঙালিটাকে যুক্তরাষ্ট্রে লুকিয়ে থাকার সুযোগ দেয়া হবে—আনঅফিশিয়ালি। আরও গুজব, বিশ্ব ব্যাংক নাকি কি একটা প্রস্তাব নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, লোকটা কোথায় জানতে পারলেই…।'

'গুজব নয়,' বলল বাকালা। 'ওপর মহল থেকে নির্দেশ পেয়ে সি. আই. এ.-ই ব্যবস্থাটা করেছে। প্রস্তাবটা সরাসরি সি. আই. এ. দিলে গ্রাহ্য না-ও হতে পারে, তাই বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমে দেয়া হবে প্রস্তাব। ওকে ওরা মাথায় তুলতে যাচ্ছে। বিশেষ কি একটা দায়িত্ব দেয়া হবে। আসলে…'

'প্রস্তাবটা কি জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করল বোরিগিয়ানো।

'নিশ্চয়ই প্রোটেকশনের অফার,' বলল বাকালা। 'আমাদের নাগাল থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার প্ল্যান।'

'তারমানে ওদেরও ধারণা আমাদের হাত থেকে নিস্তার নেই তার।' একটু সন্তুষ্ট দেখাল বোরিগিয়ানোকে।

কিন্তু বাকালা আগের মতই গম্ভীর আর উদ্বিগ্ন।

*

মোবেক্স থেকে বেরিয়ে এল সুসান, বিশাল কাঠামোটা লম্বা করে আড়মোড়া ভাঙল। লম্বা হওয়ার অনেক অসুবিধে, তার মধ্যে একটা হল গাড়িতে করে কোথাও যাওয়া—হাত-পা মেলতে না পারায় আড়ষ্ট শরীর টনটন করতে থাকে। সুসানের পিছু পিছু নামল রকি। পিছন ফিরে মোবেক্সের ভেতর তাকাল সে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কিছু লাগবে নাকি?'

মাথা নাড়ল রানা।'পেট পুরে খেয়ো। যদি বল, তোমাদের আমি ফিরিয়ে আনতে পারি।'

'না, আমরা একটু হাঁটতে চাই,' বলল সুসান। 'কিছু কেনাকাটাও করব। চিন্তা কোরো না, এ জায়গা আমরা ঠিকই খুঁজে বের করব।'

পুব উপকূল ধরে পেসকারা থেকে বারি-তে পৌঁচেছে ওরা। সুসান ভেবেছিল, তিন দিন টিনের খাবার খেয়ে নিশ্চই অরুচি ধরে গেছে ফ্রেঞ্চ লোকটার, কাজেই সে-ও ওদের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে খেতে চাইবে। কিন্তু প্রস্তাবটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে রানা। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে, ক্যাম্পসাইটে মোবেক্স পার্ক করেছে ওরা। কিন্তু বাইরে খুব একটা বেরোয়নি ও।

কৌতূহল চেপে রাখতে পারেনি সুসান। এক-আধটু ফ্রেঞ্চ জানে সে, প্রথম রাতে রানাকে পরীক্ষা করার জন্যে দু'একটা প্রশ্ন করে সে। মুচকি একটু হাসে রানা, ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনর্গল জবাব দেয়। এরপর সুসান ভাষা বদল করে, কিন্তু ইংরেজিতেও চমৎকার কথা বলে রানা, মুচকি হাসিটুকু ঠোঁটে লেগেই ছিল। ইংরেজিতেই রানা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছ?

'না,' একটু অপ্রতিভ দেখায় সুসানকে। 'তবে তোমাকে আমার কেন যেন ঠিক ফরাসী বলে মনে হয় না।'

ধমক লাগাল রকি, সুসানকে বলল, এত বকবক কোরো না তো। কিন্তু সুসানের কৌতূহল থেকেই গেল।

রোমের ক্যাম্পসাইটে পায়ে হেঁটে পৌঁচেছিল রানা, এক হাতে প্রকাণ্ড লেদার স্যুটকেস, আরেক হাতে একটা ক্যানভাস ব্যাগ। সরু দরজা দিয়ে ওগুলো ঢোকাবার সময় ওকে সাহায্য করল রকি। পরে সে সুসানকে বলে, স্যুটকেসটায় কি আছে কে জানে, অসম্ভব ভারি।

ওদের সঙ্গে বিশেষ কথাও বলে না লোকটা। তবে তার উপস্থিতি অস্বস্তিকর লাগে না।

'ওখানে, দেখ, একটা বুটিক।' ব্যস্ত রাস্তার ওপারে সার সার দোকান, সেদিকে হাত তুলল রকি।

'আর ওখানে একটা রেস্তোরাঁ,' বলল সুসান, তার দৃষ্টি আরও খানিকটা

সামনে। 'আগে খাব, খিদেয় মরে যাচ্ছি। তাছাড়া, খাওয়াদাওয়ার পর আমার হয়ত আরও বড় সাইজ দরকার হবে।'

'এরচেয়ে বড় সাইজ তৈরি হয় না,' বলেই কাঁধ আর মাথা সরিয়ে নিল রকি, জানে, ঠাট্টার ছলে যে কিলটা মারবে সুসান, রোগা শরীরটা ছিটকে পড়ে যেতে পারে ফুটপাথের ওপর।

কিন্তু সুসান কিল তুলল না। একটা নিউজস্ট্যাণ্ডের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সেদিকে তাকিয়ে আছে সুসান, চোখ দুটো বিস্ফারিত। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রকিও তাকাল।

রানার বয়স্ক চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। প্রায় বারোটা দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে ছবিটা।

এক ঘন্টা পর। দু'জন মহাতর্ক জুড়ে দিয়েছে। রকির একই কথা, বিপদ থেকে দূরে সরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

'তোমার ব্যাগে টাকা আছে, পাসপোর্ট আছে, আর কি চাই?' জিজ্ঞেস করল সে। 'সোজা রেলস্টেশনে যাই চল, ট্রেনে উঠে কিছু মুখে দিয়ে নেব। যা কিছু কেনার, ব্রিন্দিসিতে গিয়ে কিনলেই হবে। কাল সকালে ফেরিতে উঠে রওনা হয়ে যাব গ্রীসে।'

কিন্তু সুসানেরও একই জেদ। 'আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে, ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা। হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলে এসেছে জানে না। 'সুসান, এই ভাবাবেগের কোন মানে হয় না,' বলল রকি। 'লোকটা খুনী। আমরা তার কাছে কোনভাবে ঋণী নই। টাকা দিয়েছে, বদলে মোবেক্স পেয়েছে। বুঝতে পারছ না, ও আমাদেরকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করছে!'

আবার মাথা নাড়ল সুসান। হাতের কাগজটা সুসানের চোখের সামনে ধরল রকি। 'ভাল করে দেখ চেহারাটা। ওকে এখন হাজার হাজার লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন খুঁজে পাবে, ওর সঙ্গে আমাদের থাকা উচিত হবে না। এই সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না?'

'রকি ওয়াট, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' থমথমে গলায় বলল সুসান।

একাই হাঁটা ধরল সে। অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার পিছু নিল রকি। আবার ওরা ব্যস্ত শহরে ফিরে এল। একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল সুসান, পিছু পিছু রকি। বেয়ারাকে ডেকে দু'জনের জন্যে খাবার অর্ডার দিল সুসান।

খাওয়া শেষ হবার পর বিস্ফোরিত হল সে। রকির দিকে ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি কথা, লোকটা আমাদেরকে ব্যবহার করছে। কিন্তু কেন করবে না, বলতে পার? ওর পিছনে কি একটা সেনাবাহিনী আছে? নেই। সরকার ওকে

সাহায্য করছে? না। লোকটা কি গুণ্ডাদলের সর্দার, তার শিষ্য আছে কয়েক হাজার? না, নেই। লোকটা কি দেবতা? না। তাহলে কি সে? কে সে? একজন মানুষ, সাধারণ একটা লোক। স্রেফ একা। কি করছে সে? একটা অতি জঘন্য, অতি ঘৃণ্য, অতি নিষ্ঠুর অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ওকে খুনী বললে পাপ হবে, রকি।' গলা ধরে এল সুসানের। বলল, 'হাজার হাজার লোক খুঁজছে ওকে। পুলিসের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? বুঝতে পারছ না, ওর সাহায্য দরকার। আর কারও কথা জানি না, আমি ওকে সাহায্য করব। বিপদের কথা বলছ? ওকে সাহায্য করতে গিয়ে যদি মারাও যাই, দুঃখ কিসের, স্বর্গে তো যাবই যাব। হ্যাঁ, বলতে পার খানিকটা পুণ্যের লোভেই ওকে আমি সাহায্য করতে চাইছি। এইটুকুই আমার স্বার্থ।'

অন্য দিকে তাকিয়ে আছে রকি, নির্লিপ্ত। আসলে চোখের পানি লুকাচ্ছে সে।

'ভেবে দেখ, রকি, কচি মেয়েটাকে শুধু খুন করেনি ওরা, দু'জন মিলে যখনই ইচ্ছে হয়েছে বারবার রেপ করেছে। ওর জায়গায় আমাকে কল্পনা কর। তেরো বছর বয়স আমার, দুনিয়াদারি ভাল বুঝি না। আমাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করতে করতে মেরে ফেলা হল।'

সুসানের দিকে তাকাল রকি, নিঃশব্দে হাসছে, চিক চিক করছে খুদে চোখ দুটো। 'ঠিক আছে, বীরাঙ্গনা হস্তিনী, এবার একটু শান্ত হও।'

ভুরু কুঁচকে রকিকে কয়েক সেকেণ্ড দেখল সুসান। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রাজি?'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রকি। 'হঠাৎ নয়। সাহায্য আমিও করতে চাই, কিন্তু এতে বিপদ আছে। একজন পুরুষকে যা মানায়, একটা মেয়েকে তা মানায় না।'

হাত বাড়িয়ে রকির কটা রঙের চুল এলোমেলো করে দিল সুসান। 'ওরে শয়তান! আমাকে গ্রীসে পাঠিয়ে দিয়ে ওর কাছে ফিরে যাবার মতলব ছিল তোমার!'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রকি। 'আচ্ছা, আমরা সব কথা জানি, টের পেলে ওর প্রতিক্রিয়া কি হবে? আমরা বেঈমানী করতে পারি ভেবে ও যদি কোন ব্যবস্থা নেয়?'

রকির কোমর জড়িয়ে ধরল সুসান। 'সে-ধরনের কিছু ঘটবে না। আমরা মন্দ লোক নই, ও বুঝবে। আর, যতই বদরাগি বা নিষ্ঠুর হোক, ওকে আমি ভয় পাই না।'

'ভয় পাও না?' রকির চোখে অবিশ্বাস।

সুসান হাসতে লাগল। 'ভয় পাব কেন? আমাকে দেখার জন্যে তুমি আছ না!'

*

ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে পাধানি আর রেমারিকের দিকে ফিরলেন গুগলি। 'কাজটা বাকালার,' বললেন তিনি। 'সবগুলো কাগজ একই সময়ে ইনফরমেশনটা পেয়েছে।'

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইল রেমারিক।

উত্তর যোগাল পাধানি, 'এ থেকে বাকালার মনের অবস্থা টের পাওয়া যায়। সবাইকে রানার চেহারা দেখাবার এটাই ছিল সবচেয়ে সহজ উপায়।' কর্নেলের দিকে ফিরল সে। 'এখন আমরা কি করব, স্যার?'

গুগলি ইতস্তত করছেন।

'প্রাইভেটলি কথা বলতে পারলে বোধহয় ভাল হত, স্যার,' বলল পাধানি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেমারিকের দিকে তাকালেন গুগলি, মাথা নাড়লেন। 'তার কোন দরকার নেই, পাধানি।' ওদের দিকে পিছন ফিরে ফোনের রিসিভার তুললেন, ডায়াল করলেন রোমে, কারাবিনিয়ারি হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটা নির্দেশ দিলেন তিনি। তারপর রিসিভার রেখে দিয়ে রেমারিকের দিকে ফিরলেন।

'আপনাকে বিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল রেমারিক। রেগে গেছে সে।

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন গুগলি। 'এতে কিছু এসে যায় না। রানাকে যদি বাকালার লোকেরা খুঁজে না পায়, আমাদের লোকেরাও পাবে না।'

'কিন্তু আপনার ওপর নির্দেশ আছে, ওকে দেশত্যাগ করার সুযোগ করে দিতে হবে,' বলল রেমারিক। 'অথচ আপনি নির্দেশ দিলেন ওকে দেখা মাত্র গ্রেফতার করে হেডকোয়ার্টারে...'

'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!' আবার ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গুগলি। নিচু কফি টেবিলে একটা খবরের কাগজ মেলা রয়েছে, সেটার দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। 'মাথা গরম না করে, আসুন, ওর অবস্থাটা ভেবে দেখি। সত্যি কথা বলতে কি, মেজর জেনারেল রাহাত খানের সাথে আমি একমত, রানার এখন আর কোন সুযোগ নেই। ওর এই নকল চেহারা লুকিয়ে রাখার নয়, লোকে দেখলেই চিনে ফেলবে। বাকালা পুরস্কার ঘোষণা করেছে—কি কি দেয়া হবে? নিউইয়র্কে একটা বাড়ি, সিসিলিতে একটা চালু রেস্তোরাঁ, নগদ এক বিলিয়ন লিরা। যা-শালা...আমারই তো লোভ হচ্ছে! সারা জীবন আর কাজ না করলেও চলবে। তাই বলছি, আসুন, চেষ্টা করি, ওদের আগে আমরা যাতে ওকে খুঁজে পাই।'

কথা না বলে খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রেমারিক। নিচের ব্যস্ত রাস্তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'রেমারিক, বিশ্বাস করুন—রানার এখন বাঁচার আশা খুব কম। ওকে গ্রেফতার করার জন্যে এখন আমরা সাধ্যের বাইরে চেষ্টা করব,' কথাগুলো প্রায় আবেদনের সুরে বললেন গুগলি। বস্‌কে পাধানি আগে কখনও এভাবে কথা বলতে শোনেনি। 'কিন্তু এ-ও জানি, গ্রেফতার এড়াবার সব রকম চেষ্টা করবে সে। সেজন্যেই নির্দেশ দিয়েছি, দরকার হলে পায়ে গুলি করা যাবে।'

ওদের দিকে না ফিরেই রেমারিক বলল, 'এখন তো গ্রেফতার করবেনই। মাফিয়া জগতটাকে প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছে ও, মস্ত উপকার করেছে আপনাদের, কিন্তু সে-কথা মনে রাখার দরকার নেই। গুলি করুন ওকে, গ্রেফতার করে জেলে পাঠান, সবাই আপনার কৃতিত্ব দেখে হাততালি দেবে। কর্নেল থেকে জেনারেল হবেন আপনি…'

কর্নেলকে কঠোর দেখাল। 'কে তাকে খুন করার জন্যে উৎসাহ দিয়েছে? আমি? কে তাকে অস্ত্র যোগান দিয়েছে? আমি? জাল কাগজ-পত্র, ট্রান্সপোর্ট, সেফ-হাউসের ব্যবস্থা কে করেছিল? আমি? বলুন, জবাব দিন!'

ঘুরে গুগলির দিকে তাকাল রেমারিক। দু'জনই উত্তেজিত, এই প্রথম। 'ঠিক আছে, স্বীকার করছি!' বলল রেমারিক। 'হ্যাঁ, ওকে আমি সাহায্য করেছি, আর সেজন্যে আমি অনুতপ্তও নই। পরিস্থিতি অন্য রকম দেখে আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। ভেবেছিলাম আপনি কথার মর্যাদা রাখতে জানেন। কিন্তু এখন দেখছি আমারই ভুল হয়েছিল।'

এতক্ষণে মুখ খুলল পাধানি, 'আপনি ভুল করছেন, রেমারিক। খুব বড় ভুল করছেন। রানার ব্যাপারে কর্নেলের ব্যক্তিগত কোন দায়-দায়িত্ব নেই। কিন্তু, আমি জানি, তার প্রতি কর্নেলের সহানুভূতি আছে। তার জন্যে, তার ভালর জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করবেন উনি। সব কিছু।'

একটু নরম হল রেমারিক। 'রানা আপনাদের উপকার করেছে, এ-কথা তো সত্যি?'

মাথা ঝাঁকালেন গুগলি। 'হ্যাঁ--মস্ত উপকার করেছে। অন্য কারও কাছে এ কথা আমি স্বীকার করব না। বেরলিংগারকে খুন করে আমাদের কাজ পানির মত সহজ করে দিয়েছে সে। আমি কল্পনাই করিনি, বাকালা এতটা ঘাবড়ে যাবে। রানা যদি এখন তাকে না-ও ছুঁতে পারে, তবু তার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। অর্গানাইজেশনের মেইনল্যাণ্ড শাখাগুলো এরই মধ্যে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। শুধু এখানে, সিসিলিতে, এখনও তার ক্ষমতা টিকে আছে, কিন্তু তা-ও দিনে দিনে কমতে থাকবে।'

একটা সিগারেট ধরাল রেমারিক, তার হাত এখন আর কাঁপছে না।

'এদিকে আসুন, রেমারিক,' নরম সুরে ডাকলেন গুগলি। 'এখানে বসুন। রানার খোঁজ পাওয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আপনিই তার মন বোঝেন। সে

এখন কি করবে, ভেবে বের করুন। কিভাবে হামলা করবে সে? কোন পথে পৌঁছুবে?'

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে টেবিলে বসল রেমারিক। 'প্ল্যানটা আবার আমাকে দেখতে দিন।'

দৈনিকটা সরাতেই নিচে দেখা গেল ভিলা কোলাসির বড় একটা স্কেল প্ল্যান। ভিলার আশপাশের এলাকাও বেশ কিছুটা দেখানো হয়েছে স্কেচে। তিনজনেই ঝুঁকে পড়ল ওরা। প্ল্যানে একটা আঙুল রাখলেন গুগলি।

'আজ সকালে আমরা জেনেছি, বাগান আর পাঁচিলের মাঝখানে অনেকগুলো গাছ কেটে ফেলেছে বাকালা, একটা প্যাসেজ তৈরি করার জন্যে। সেই সঙ্গে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পাঁচিল থেকে বাইরের দিকে কয়েক শো মিটার এলাকায় দিনের মত আলো থাকবে।'

'পাঁচিলের ভেতর দিকে?' জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

মাথা নাড়লেন গুগলি। 'না। বোঝাই যাচ্ছে, ভিলাটাকে আলোকিত করতে চায় না। রাতের বেলা বাগান, উঠন, লন, সব অন্ধকার থাকবে। সিকিউরিটিতে কোন খুঁত নেই। দুটো গার্ড-কুকুর আমদানি করা হয়েছে—ডোবারম্যান—শিকারি কুকুর, খুন করার ট্রেনিং পাওয়া।

পাধানি বলল, 'এতগুলো বাধা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। গেটে থাকবে দুজন গার্ড, প্রত্যেকের কাছে সাবমেশিনগান। পাঁচিলের ভেতর সব মিলিয়ে বিশজন, তাদের হাতেও ওই সাবমেশিনগান। কোন গাড়িকে ভিলার কাছেপিঠে ঘেঁষতে দেয়া হবে না।'

গম্ভীর এক চিলতে হাসি দেখা গেল রেমারিকের ঠোঁটে। 'এ-সব বাধা আশা করছে রানা। ভিলা, আর গ্রাউণ্ডের লে-আউট জানা আছে তার। সে একজন সৈনিক এবং একজন গুপ্তচর; আর বাকালা একটা গর্দভ। ঘোরাঘুরির মধ্যে থাকলে অনেক বেশি নিরাপদে থাকত সে, কিন্তু তা না করে ছোটখাট একটা জায়গায় আটকে রেখেছে নিজেকে। ভিলার ভেতর ছোটখাট একটা সেনাবাহিনী থাকবে, তা রানাও জানে। একবার যদি ভেতরে ঢুকতে পারে ও, ওই সেনাবাহিনী বাকালাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

'কিন্তু ভেতরে সে ঢুকবে কিভাবে?' জানতে চাইলেন গুগলি।

'তা আমি জানি না,' বলল রেমারিক। 'তবে প্ল্যান একটা নিশ্চয়ই আছে তার। এইটুকু বলতে পারি, সেটা সাধারণ কোন প্ল্যান হবে না।'

পাধানি বলল, 'অগাস্টিন মারা গেল পিস্তলে, এলি গেল শটগানে, ফনটেলো মরল বোমায়, বেরলিংগার ধ্বংস হল অ্যান্টিট্যাঙ্ক মিসাইলে,' কর্নেলের দিকে তাকাল সে, 'এখন প্রশ্ন, বাকালাকে কি দিয়ে মারবে সে?'

সবাই চিন্তামগ্ন। প্রথমে নড়েচড়ে বসলেন কর্নেল গুগলি। ক্ষীণ একটু হাসির

রেখা দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে। বললেন, 'কি জানি! তবে নেতাদের নেতা এখন যদি মাটি খুঁড়ে ফলআউট শেলটার তৈরিতে হাত দিয়ে থাকে, একটুও অবাক হব না।'

'ওই আরেকটা!'

এইমাত্র একটা আলফা রোমিও ওভারটেক করল ওদের, সেটার দিকে হাত তুলল সুসান। আলফা রোমিওর পিছনের জানালায় একটা স্টিকার লাগানো রয়েছে, তাতে তিনটে শব্দ ছাপা রয়েছে, 'এগিয়ে যাও, রানা!'

প্রথম ঢেউটা উঠেছে ইটালিতে নয়, আমেরিকায়। ইটালিতে মাফিয়ার কিছু হলে বা মাফিয়া কিছু করলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে যায় মার্কিন মুলুকে–ওখানকার মাফিয়া, সরকারী প্রশাসন, আর জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এর একটাই কারণ, ওখানেও মার্কিন সরকার আর জনসাধারণ মাফিয়াদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে আছে। আতুনি বেরলিংগার মারা যাবার পর সবগুলো টেলিভিশন আর রেডিও স্টেশন নির্ধারিত অনুষ্ঠান বন্ধ করে খবরটা প্রচার করে। ওখানকার মাফিয়া মহলে বিষাদের ছায়া নামে, আর আক্ষরিক অর্থেই জনসাধারণের মধ্যে নামে আনন্দের ঢল। রাতারাতি স্টিকার ছাপাবার ধুম পড়ে যায়। যুব সংগঠনগুলো চাঁদা তোলার জন্যে রাস্তায় নেমে আসে, প্রতিটি দলের সঙ্গে একটা করে ব্যানার, তাতে লেখা–'একজন নিঃসঙ্গ মানবদরদীকে সহায়তা করুন–সে আহত হলে তার চিকিৎসা লাগবে, গ্রেফতার হলে আইনগত সহায়তা দরকার হবে।' চার্চগুলো মাফিয়ার ওপর সবচেয়ে বেশি খ্যাপা, একশো একজন প্রিস্ট এক যুক্ত আবেদনে বললেন, দেশবাসী যেন এই শোকাভিভূত লোকটার জন্যে প্রার্থনা করে। দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ, প্রথম দিনেই কয়েক লক্ষ ডলার চাঁদা উঠল। একজন আর্মস ব্যবসায়ী ঘোষণা করল, সে একাই আড়াই লাখ ডলার দান করবে। সম্ভবত ব্যবসার সূত্রে যে পাপ সে কামিয়েছে, উপুড়-হস্ত হয়ে এটা তার খানিকটা খণ্ডাবার প্রয়াস। তার দেখাদেখি আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী এগিয়ে এল, ঘোষণা করল মোটা অঙ্কের চাঁদা। বলতে গেলে, কে কত বেশি চাঁদা দিতে পারে, তার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু মুশকিল হল, কেউ জানে না, কোথায় পাঠাতে হবে টাকা। বেশিরভাগ যুব সংগঠন তাদের টাকা পাঠিয়ে দিল সংবাদপত্র অফিসে। ব্যবসায়ী রানার নামে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলল, কেউ কেউ সুইস ব্যাংকগুলোয়।

তবে ইটালির মানুষ আরও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিল। স্টিকার তো ছাপা হলই, রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশাল আকৃতির তোরণ নির্মাণ করল তারা। তোরণের মাথায় সোনালি জরি আর কাগজ দিয়ে কিছু না কিছু লেখা হল। একটা তোরণে পাড়ার ছেলেরা লিখল, 'বাঙালি বীর, লহ সালাম!' রোমের সবচেয়ে চওড়া

চৌরাস্তায় যে প্রকাণ্ড তোরণটা তৈরি করা হল, তার মাথায় বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকলঃ 'লুবনার জন্যে আমরাও কাঁদি!'

ইটালি জুড়ে রাতারাতি গজিয়ে উঠল মাসুদ রানা ফ্যানস ক্লাব। গত দু'দিন ধরে সবগুলো জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটাই খালি থাকছে, মাসুদ রানা ফ্যানস ক্লাবগুলো ভাগাভাগি করে কিনে নিয়েছে ওই আধ পৃষ্ঠা স্পেস। খালি জায়গার মাঝখানে ছোট অক্ষরে শুধু ছাপা হল, 'এই ফাঁকা জায়গা শুধু মাসুদ রানা ব্যবহার করতে পারবেন। তাঁর কিছু বলার থাকলে সংবাদপত্র অফিসে লিখে পাঠালে বা ফোন করলেই হবে।' কিন্তু কোন দৈনিকের অফিসেই রানার কোন মেসেজ এল না।

কোথাও কোথাও বিশৃঙ্খলা, আর এক-আধটু উত্তেজনাও দেখা দিল। মিলানে খবর ছড়াল, রানা আহত হয়েছে। ছোটবড় সবগুলো হাসপাতালের সামনে প্রচণ্ড ভিড় করল মানুষ। না, হাসপাতালে রানা আছে কিনা জানতে আসেনি তারা। এসেছে রক্ত দান করবে বলে। ভিড় হটাবার জন্যে অবশেষে লাঠি চার্জ করল পুলিস, কাঁদানে গ্যাস ছাড়ল। আহত হল বেশ কয়েকজন।

এ-পর্যন্ত বত্রিশটা তোরণ দেখতে পেয়েছে ওরা। তোরণ আর স্টিকারের লেখাগুলো একটা কাগজে টুকে রাখছে সুসান। ব্রিন্দিসি ছাড়িয়ে শহরতলীতে চলে এসেছে মোবেক্স।

খবরের কাগজে রানার ছবি ছাপা হবার পর তিন দিন পেরিয়ে গেছে। মোবেক্সে ঢুকে কাগজটা রানার সামনে মেলে ধরে সুসান, বলে, 'দেখ তো, কার ছবি চিনতে পার কিনা।'

নিজের ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মুখ তুলল রানা।

'সবগুলো দৈনিকে ছাপা হয়েছে,' বলল রকি। 'পুরো গল্পটা সহ। তোমার এই কদর্য চেহারা ইটালির যেখানেই দেখাবে, সাথে সাথে চিনে ফেলবে সবাই। টিভিতেও নিশ্চই দেখানো হচ্ছে।'

কোন কথাই বলল না রানা। পালা করে শুধু ওদের দু'জনকে দেখল।

'ফ্রেঞ্চম্যান না ছাই!' ঝাঁজের সঙ্গে বলল সুসান। 'আমরা প্রথমেই ধরেছিলাম তুমি ইউরোপিয়ান নও!'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে।

উত্তেজনা একটু হালকা হল। সাহায্যের প্রস্তাবটা এল সুসানের কাছ থেকে, ওরা দু'জনেই রানার নিরাপত্তার জন্যে কিছু করতে চায়। কিন্তু মাথা নাড়ল রানা, সে রাজি নয়। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বিপদ এখন খাঁড়ার মত মাথার ওপর ঝুলছে। 'আমি যা বলছি তাই হবে,' বলল রানা। 'ব্রিন্দিসিতে পৌঁছে ট্রেন ধরবে তোমরা, তারপর ফেরিতে উঠে গ্রীসে চলে যাবে। আমার পথ আমি ঠিকই বের করে নেব। আমার সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। সুসান আর রকি কোন যুক্তি মানতে রাজি নয়। রানার সঙ্গে এক ঘন্টা তর্ক করল ওরা। রানা একা হয়ে গেলে, ওকেই মোবেক্স চালাতে হবে—লোকের চোখে না পড়ে উপায় থাকবে না ওর। কিন্তু সঙ্গে ওরা থাকলে, মোবেক্সের ভেতর লুকিয়ে থাকতে পারবে রানা, ইটালির যে-কোন জায়গায় ওকে পৌঁছে দিতে পারবে তারা। অবশেষে ওদের জেদের কাছে হার মানতে হল রানাকে। ও শুধু রেগিয়ো পর্যন্ত যেতে চায়, তবে তিন দিনের মধ্যে নয়। ওকে রেগিয়োতে পৌঁছে দিয়ে মোবেক্স নিয়ে চলে যাবে ওরা—ওটা তখন আর ওর দরকার হবে না।

জোর করে টাকা ফেরত দিতে চাইল ওরা, কিন্তু এবার রানার জেদের কাছে হার মানতে হল ওদেরকে। সাহায্যের বিনিময়ে মোবেক্সটা রানার উপহার হিসেবে নিতে হবে ওদের। এটাই তার শর্ত।

বারির ক্যাম্পসাইটে আরও দুটো দিন ছিল ওরা। রাতে ব্যায়াম করার সময় ছাড়া মোবেক্স থেকে একবারও নামেনি রানা--সে-সময় সুসান আর রকি পাহারায় থেকেছে। সিসিলিতে কিভাবে ঢুকবে ও, ওদেরকে বলেনি। কথা দিয়েছে, রেগিয়োতে গিয়ে বলবে। ওরা ফেরি ধরার আগে রানার হয়ত আরেকটু সাহায্য লাগতে পারে।

'চুল ছাড়া কেমন লাগবে রকিকে?' জানতে চেয়েছে রানা। 'মানে, ছোট চুলে?'

চোখ কপালে উঠে গেছে সুসানের। 'কোন ধারণা নেই—নিশ্চয়ই ভীতিকর একটা কিছু দেখাবে।'

'বাজে কথা বলবে না!' চটে উঠেছে রকি। 'আমি দেখতে খারাপ নাকি! আমার এই চুল আর দাড়ি রাখার একটাই কারণ, মেয়েরা যাতে আমার পিছু না নেয়। তা, আসল ব্যাপারটা কি?'

কিন্তু ফাঁস করেনি রানা, মৃদু হেসে বলেছে, 'রেগিয়োয় পৌঁছে বলব।'

গাড়ি চালাচ্ছে রকি, পাশে বসে আছে সুসান। রানার কথা ভাবছে ওরা।

'যাই বল, আশ্চর্য একটা মানুষ,' মন্তব্য করল সুসান। 'তোমার ভেতর এই বোধ কখনও জন্ম নেবে? অমন প্রচণ্ড ঘৃণা, যার ফলে ওর মত কিছু করার শক্তি পাবে মনে?'

রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে সুসানের দিকে তাকাল রকি। সুসান সিরিয়াস। ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল রকি। 'অনেকের মনেই এই বোধ জন্ম নিতে পারে। শুধু ঘৃণা থাকলেই তো হচ্ছে না, যোগ্যতাও থাকতে হবে, এখানেই পার্থক্যটুকু। কাগজে ওর কথা পড়েছ তুমি। ওর মত মানুষ আর ক'টা আছে রাস্তায়?'

'তোমার কি মনে হয়,' জিজ্ঞেস করল সুসান। 'পারবে ও? ওখানে ঢোকা

সম্ভব?'

ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করল রকি। 'পারতেও পারে। অনেক বাধা পেরিয়ে অনেক দূর চলে এসেছে—তবে, ভাগ্যটা ভাল হতে হবে। ভাগ্য অবশ্য ভালই ওর—যেমন, আমাদের সাথে দেখা হয়েছে।'

রকির দিকে তাকিয়ে হাসল সুসান, তৃপ্তির হাসি।

কিছুক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল রকি, 'কি ভাবছ?'

'ভাবছি,' আবার হাসিটা দেখা গেল সুসানের ঠোঁটে, 'চুল ছোট করলে কেমন দেখাবে তোমাকে।'

দশ

কয়েকশো বছরের পুরানো দেয়াল, বুলডোজারের ধাক্কায় আধ ঘন্টার মধ্যে ফার্ম হাউসটা মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

গরুর গাড়ির পাশে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল এগেল, সংসারের যাবতীয় জিনিস-পত্র এইমাত্র গাড়িতে তোলা শেষ করেছে সে। স্ত্রী এরই মধ্যে উঠে বসেছে গাড়োয়ানের এক পাশে, তার দিকে তাকাতে পারছে না এগেল।

ভিলা কোলাসির পাঁচিলটা এখান থেকে দেখা যায়, চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে সেদিকেই তাকিয়ে আছে এগেল। পাহাড়ের নিচে এই ছোট্ট পাথুরে জায়গাটায় কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করছিল ওরা। ঘরের তৈরি ঘি, পনির, মাখন ভিলার মালিককে নিয়মিত পাঠিয়েছে, অত্যাচারী লোকটা যাতে তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকে।

কথাটা প্রথম শুনে বিশ্বাস করেনি এগেল। ভিলার মালিক এই রকম নিষ্ঠুর কাজ কেন করবেন। গার্ডদের হাতে-পায়ে ধরেছে সে, ওদের মালিকের সঙ্গে তাকে একবার দেখা করতে দেয়া হোক। তার কাকুতিমিনতি কানে তোলা হয়নি। ভিলার মালিক নাকি কারও সঙ্গেই দেখা করছে না। শেষ কথা জানিয়ে দিয়ে চলে গেল ওরা—চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ফার্মহাউস ছেড়ে চলে যেতে হবে। কোথায় যাবে, সেটা ভিলার মালিকের মাথাব্যথা নয়।

বাপ-দাদার ভিটে থেকে উচ্ছেদ হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে এগেল পরিবার। কোথায় যাবে জানে না। হাতে নামমাত্র টাকা গুঁজে দিয়ে কাগজ পত্রে সই করিয়ে নিয়েছে ওরা, ফার্মহাউসের ওপর তার কোন অধিকার নেই। ফার্মহাউসই নেই, তার আবার অধিকার।

গরুর গাড়িতে উঠে বসল এগেল, এখনও সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ভিলার পাঁচিলের দিকে। তার দুই চোখ থেকে উথলে উঠছে ঘৃণা। বিড়বিড় করে বলল,

'গো উইথ গড, মাসুদ রানা।'

দর নিয়ে বচসা শুরু হয়ে গেল। চুল দাড়ি কাটার জন্যে সাত হাজার লিরা, মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি! কিন্তু নাপিত ব্যাটা গোঁ ধরে বসে আছে। এত চুল দাড়ি নাকি কোন বনমানুষের শরীরেও থাকে না। একঘন্টার কমে সারতে পারবে না সে। সাত হাজার লিরার এক পয়সা কমে সে রাজি নয়।

হাতে অনেক কাজ, সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে, অগত্যা রাজি হতে হল রকিকে।

আসল রহস্য এখনও তার জানা হয়নি। ক্যাম্পসাইটে কাল রাতে পৌঁচেছে ওরা, ডিনারে বসে রানা কি চায় ব্যাখ্যা করে বলেছে ওদেরকে। কিন্তু কেন চায় তা বলেনি। 'একটু একটু করে জান, সেটাই সবার জন্যে নিরাপদ।'

প্রথমে রকিকে চুল-দাড়ি কামাতে হবে। তারপর ভাল দাম দিয়ে কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে—লেদার স্যুটকেস, ব্রিফকেস, বিজনেস স্যুট, সাদা শার্ট, একরঙা টাই, ফিতে লাগানো জুতো। নতুন কাপড়-চোপড় পরে হোটেল গ্র্যাণ্ডে উঠতে হবে তাকে, সবচেয়ে দামি সুইটে, তিন দিনের ভাড়া অ্যাডভান্স করবে সে। এরপর একটা গাড়ি ভাড়া নেবে রকি, ওই তিন দিনের জন্যে, সবচেয়ে ভাল যে মডেলটা পাওয়া যায়। রাতে হোটেলের ডাইনিংরুমে ডিনার খাবে সে, ওয়েটারকে সবচেয়ে দামি ওয়াইন দিতে বলবে, তারপর কফির সঙ্গে কনিয়্যাক খাবে।

'তারমানে তুমি চাও রকিকে যেন একজন ধনী ব্যবসায়ী বলে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করেছে সুসান।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'এ যেন রূপকথার মত লাগছে,' চোরা চোখে রকির দিকে একবার তাকিয়ে মন্তব্য করল সে। 'কাদার ব্যাঙ হঠাৎ সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে রাজপুত্র হয়ে উঠবে।'

'থামলে!' চোখ রাঙাল রকি।

'জানি, নিজেকেই চিনতে পারবে না!'

চেহারায় গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্ব আনার চেষ্টা করল রকি—এসবের দরকার হবে, এখন থেকে চর্চা করা ভাল।

রাজকীয় ডিনারের পর হোটেলে নিজের সুইটে ফিরতে হবে রকিকে, ওখান থেকে ফোন করতে হবে অস্ট্রেলিয়ায়—পুরানো কোন বন্ধু, বা যে-কোন একজনের কাছে করলেই চলবে। তবে কথা বলতে হবে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট, তার কম নয়। রাতটা হোটেলেই কাটাতে হবে তাকে, সকালে ক্যাম্পসাইটে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করবে।

রকি যখন রেগিয়োর গ্র্যাণ্ডে ডিনার খাচ্ছে, কর্নেল গুগলি তখন প্যালার্মোর হিলটনে

রেমারিক আর পাধানিকে নিয়ে গ্রিলড লামপুকা সাবাড় করছেন।

'তোমার কি মনে হয়?' পাধানিকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'রানা বোটে করে আসবে,' বলল পাধানি।'সম্ভবত ফিশিং বোটে করে—কালাব্রিয়ার কোথাও থেকে বোট যোগাড় করা তেমন কঠিন হবে না···।'

অসহিষ্ণু দেখাল কর্নেলকে। প্লেটের দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। 'আমি মাছের কথা জিজ্ঞেস করছি।'

হাসি চাপল পাধানি; মাঝেমধ্যে বস্‌কে বিরক্ত করে মজা পায় সে। 'মন্দ নয়—তবে, একটু বেশি ভাজা হয়ে গেছে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন গুগলি, রেমারিকের দিকে ফিরলেন, 'সম্ভাবনা আছে, কোন নিশ্চয়তা আছে তা বলছি না, ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা আছে, একদিন হয়ত পাধানি প্রমোশন পেয়ে কর্নেল হতে পারবে।'

'আপনি বুঝি যোগ্যতার পরীক্ষা নিলেন?' জানতে চাইল রেমারিক। 'কিন্তু ভাল খাবারের সমঝদার হওয়ার সঙ্গে যোগ্যতার কি সম্পর্ক?'

'সব কিছুর সম্পর্ক,' জবাব দিলেন গুগলি। 'মানে একটা থাকতেই হবে, তা না হলে শুধু বুদ্ধিমান আর নিবেদিতপ্রাণদের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিতে শুরু করবে ওরা। তা যদি ঘটে, সর্বনাশ হতে বাকি থাকবে না!'

'তারমানে কি আপনি কর্পোরাল পদে নেমে যাবেন?'

মুচকি হেসে পাধানিকে বললেন গুগলি, 'দেখলে তো, আমাদের নিয়াপলিটান বন্ধুর সেন্স অভ হিউমার কি ভয়ঙ্কর?—কেন, ফিশিং বোটের কথা মনে হচ্ছে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল পাধানি। 'আর কি হতে পারে? কনভেনশনাল ট্র্যান্সপোর্ট ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। প্রত্যেকটা প্লেন, ফেরি আর ট্রেনের ওপর নজর রাখা হবে। ছদ্মবেশ নেয়ায় ঝামেলা আছে, সে সুযোগ তার আছে বলেও মনে হয় না—তাছাড়া, ছদ্মবেশ নিয়ে ওই চেহারা খুব বেশি আড়াল করা যাবে না।'

'আপনার কি ধারণা?' রেমারিকের দিকে ফিরলেন গুগলি।

'কি জানি,' বলল রেমারিক। 'আন্দাজ করার চেষ্টা বৃথা। অনেক ভেবেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি। তবে একটা কথা ঠিক, এই চেহারা ও কোথাও দেখাতে পারবে না—কোথাও না।'

'হ্যাঁ, ইটালিতে ওটা বোধহয় এখন সবচেয়ে পরিচিত মুখ। মানুষ যেভাবে নিল ব্যাপারটাকে—কল্পনাই করিনি। দেশের বাইরে থাকলে, এখানে এসব ঘটছে শুনলে বিশ্বাস করতাম না। শুধু গতকালই দৈনিকগুলোর অফিসে এক বিলিয়নের ওপর লিরা পৌঁচেছে। রোমে মেয়ারা টি-শার্ট পরছে, রানার ছবিসহ ছাপা রয়েছে,—এগিয়ে যাও, রানা। ইটালির মানুষ সবাই ওর পক্ষে। কাগজগুলোর ছাপা তিন গুণ বেড়ে গেছে, তারপরও নাকি চাহিদা মেটাতে পারছে না। এই

পরিস্থিতিকে কোনমতেই স্বাস্থ্যকর বলা যায় না। মোটেও শুভলক্ষণ নয়।'

'এ অনিবার্য ছিল,' বলল পাধানি। 'মাফিয়ার অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সরকারও ওদের সাথে পারে না। কাজেই এই লোককে হিরো মনে করছে মানুষ। তাছাড়া, বীরপূজা সব সমাজেই চালু রয়েছে এখনও। যা ঘটছে, এর মধ্যে অন্তত যুক্তির কোন অভাব নেই।'

'আমার জন্যে সবচেয়ে বড় ধাঁধা হল,' গুগলি বললেন। 'রানা থাকছে কোথায়? সে একা, অথচ, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কি করে তা সম্ভব?' রেমারিকের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনি ঠিক জানেন, রোমের পর তার আর কোন সেফ-হাউস নেই?'

'আমার জানামতে নেই,' বলল রেমারিক। 'রোমের পর কি করবে, আমাকে বলেনি। কেন, বুঝতেই পারেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গুগলি। বিষণ্ন দেখাল তাঁকে। 'আমার দুর্ভাগ্য।'

'দুর্ভাগ্য কেন?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল রেমারিক। 'তাকে খুঁজে বের করার এত কেন গরজ আপনার?'

গুগলি গম্ভীর হলেন। 'রেমারিক, বিশ্বাস করুন। আপনার বন্ধু মারা যাক, এ আমি দেখতে চাই না। আমাদের জন্যে অনেক করেছে সে।' ইঙ্গিতে বেয়ারাকে ডেকে ডেজার্টের অর্ডার দিলেন। বেয়ারা চলে যেতে রেমারিকের হাতে হাত রাখলেন তিনি। 'কথাটা সত্যি। আপনার বন্ধুর কাছে আমি ঋণী। কি বলব, লোকটা আমাকে মুগ্ধ করেছে। একজন লোক একার চেষ্টায় এতটা করতে পারে, কেউ বললে হাসতাম। কি ঘটছে জানি, তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। বিশেষ করে যেভাবে সে বেরলিংগারকে মারল।'

ডেজার্ট দিয়ে গেল বেয়ারা।

পাধানি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো তার বন্ধু, আপনি বলতে পারবেন। মানুষ তো আমরা সবাই, কিন্তু ওর মত অসাধারণ ক'জন? কি আছে তার মধ্যে, কিসের গুণে অসাধারণ সে?'

'তুমি তো তার ডোশিয়ে দেখেইছ,' বললেন গুগলি। 'আসলে, অভিজ্ঞতা আর ট্রেনিং, আর সম্ভবত, আরও কি যেন কি একটা।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে রেমারিকের দিকে তাকালেন তিনি।

'হ্যাঁ, আরও কি যেন কি একটা,' একমত হল রেমারিক। 'এ অনেকটা সেক্স অ্যাপিলের মত—ছোঁয়া যায় না। হয়ত সমস্ত গুণ আর দক্ষতা আছে, তবু এই জিনিসটার অভাব থাকতে পারে একজন মানুষের—টেকনিক্যালি যতই কিনা সে ভাল হোক। হঠাৎ কোথাও এরকম লোক দেখতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে জিনিসটা আছে। তাকে দেখেই অনেক সময় আলাদা বলে চেনা যায়। হতে পারে জিনিসটা আর কিছু না, ইচ্ছাশক্তি আর ভাগ্যের কমবিনেশন। অভিজ্ঞ ট্রেনিং পাওয়া এক

প্লাটুন সোলজার ঠিক জায়গায় পজিশন নিতে ব্যর্থ হল। অথচ একজন লোক, কি যেন কি একটা আছে তার মধ্যে, প্রথমবারই ঠিক পজিশনে দাঁড়াল।'

'জিনিসটা কি আপনার মধ্যে আছে?' নরম সুরে জানতে চাইলেন গুগলি।

'হ্যাঁ,' জবাবে বলল রেমারিক। 'কিন্তু রানার মধ্যে আছে অঢেল—ওটাই তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। আর হয়ত ভিলা কোলাসির ভেতরেও নিয়ে যাবে।'

'ওটা কি তাকে ভিলা থেকে বের করেও আনবে?' দ্রুত জানতে চাইলেন গুগলি।

'কে জানে!' প্রশ্নটা অস্বস্তি আর উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিল রেমারিককে। তার বিশ্বাস, ভিলায় ঢোকার প্ল্যান নিশ্চই আছে রানার, কিন্তু বেরুবার প্ল্যান আছে কিনা কে জানে!

ভাড়া করা ল্যানসিয়া মোবেক্সের পাশে থামাল রকি। ধাপে বসে তাকে নামতে দেখল সুসান। ল্যানসিয়ার দরজা বন্ধ করে ফিরল রকি, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল সুসানের দিকে। অনেকক্ষণ কেটে গেল, এক চুল নড়ল না সুসান। তারপর সে তার বিশাল ছাতির ওপর হাত বেঁধে আগুপিছু দোল খেতে শুরু করল, হাসির প্রবল আওয়াজটা এল আরও এক মুহূর্ত পরে।

সুসানের পিছনে উদয় হল রানা। রকির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও, হাসল। ধাপ থেকে পিছলে নেমে গিয়ে ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খেতে শুরু করল সুসান। তার অদম্য হাসি নির্জন ক্যাম্পসাইটের সবখানে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

'মেয়েমানুষ এমন জঘন্য হয়!' ক্ষোভ প্রকাশ করল রকি।

তাকে সমর্থন করে রানা বলল, 'সত্যিকার সৌন্দর্যের কদর নেই।'

ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসল সুসান, হাঁটু জোড়া দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে। 'রকি ওয়াট, কাদার ব্যাঙ ডাঙায় উঠেছে, কিন্তু সেই ব্যাঙই আছ তুমি—রাজপুত্র হওয়া তোমার কপালে নেই।' গালভরা হাসি, কিন্তু এখন আর তার হাসিতে কোন আওয়াজ নেই।

ঘন নীল স্যুট পরে রয়েছে রকি, হাতে একটা কালো ব্রিফকেস, দাঁড়িয়ে আছে ল্যানসিয়ার পাশে। সুসানকে সে গ্রাহ্য করল না। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

'নিখুঁত,' বলল রানা। সুসানের দিকে ফিরল ও। 'ওকে যদি ব্যাঙের মতই লাগবে, কাল রাতে তাহলে কাঁদছিলে কেন?'

'বাজে কথা!' উঠে দাঁড়াল সুসান। 'ওর জন্যে কাঁদতে আমার বয়েই গেছে, চোখে বালি পড়েছিল।' কিন্তু এগিয়ে এসে রকিকে আলিঙ্গন করল সে।

আঁতকে উঠল রকি, ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আহ, করো কি! ছাড়ো, স্যুটের ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!'

সবাই ওরা মোবেক্সে চড়ল, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ছোট টেবিলে বসল। রানার নির্দেশগুলো কিভাবে পালন করেছে, বিশদ ব্যাখ্যা করে বলল রকি, তারপর জানতে চাইল, 'এবার কি?'

পিছনে হাত দিয়ে ম্যাপটা বের করল রানা, ভাঁজ খুলে ছোট এয়ারফিল্ডটা দেখাল। 'রেগিয়োর ফ্লাইং ক্লাবের হেডকোয়ার্টার এটা। ওখানে গিয়ে একটা প্লেন চার্টার করবে তুমি। ওদের বলবে, সিসিলির পশ্চিম উপকূল,ট্রাপানিতে যাবে।'

রকি আর সুসান দৃষ্টি বিনিময় করল।

'এতক্ষণে তোমার প্ল্যান জানা গেল,' বলল সুসান। 'কিন্তু প্লেন নিয়ে ভিলায় তুমি নামবে কিভাবে?'

মুচকি হাসল রানা। 'প্লেন নিয়ে নামব, আমি বলেছি?' ওর প্রথম প্ল্যানটা কি ছিল, ব্যাখ্যা করল ও। টেলিফোনে একটা নাইট ফ্লাইট চার্টার করত, তারপর দরকার হলে প্লেন হাইজ্যাক করত। রকি সাহায্য করতে চাওয়ায় ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

কিভাবে কি করতে হবে, রকিকে সব বুঝিয়ে দিল রানা। ফ্লাইং ক্লাবে গিয়ে রকি বলবে, সে একজন ব্যবসায়ী, রেগিয়োতে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটছে তার। কয়েকটা মীটিং আছে, সেগুলো শেষ হওয়া মাত্র ট্রাপানির উদ্দেশে রওনা হতে চায়। ফ্লাইং ক্লাব বা আর কোথাও থেকে কেউ যদি চেক করে, জানবে শহরের সবচেয়ে দামি হোটেলের সবচেয়ে খরচবহুল সুইটে উঠেছে সে, খাওয়াদাওয়ার পিছনে খরচ করছে প্রচুর, স্রেফ গল্প করার জন্যে সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় ফোন করে মোটা বিল দেয়। সংক্ষেপে, রকির মধ্যে ভুয়া কিছু পাবে না তারা।

ফ্লাইং ক্লাবকে রকি জানাবে, ঠিক কখন যে সে রওনা হতে পারবে, আগে থেকে তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে ছ'ঘন্টা আগে নোটিস দেবে সে। বেশিরভাগ সম্ভাবনা, শেষ সন্ধের দিকে রওনা হতে চাইবে সে, পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে যে-কোন একদিন।

'নির্দিষ্ট একটা সময় ঠিক করতে পারছ না কেন?' জানতে চাইল রকি।

'কারণ ব্যাপারটা নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপর।'

'তাহলে তিন দিনের মধ্যে কেন?'

কারণ এই তিন দিন চাঁদ থাকবে না, বা থাকলেও খুব অল্প সময়ের জন্যে।'

রকির কৌতূহল না মিটলেও, প্রশ্নটা চেপে রাখল সে। রানা ব্যাখ্যা করে বলল, ফ্লাইং ক্লাবে চারটে প্লেন আছে, তার মধ্যে একজোড়া সেসনা ওয়ান-সেভেন টু। রকিকে একটা সেসনা চার্টার করতে হবে, অন্য কোন প্লেন হলে চলবে না। কারণ জানতে চাইলে রকি বলবে, আগেও এই প্লেনে চড়েছে সে, নিরাপদ বোধ করে। পুরো টাকা অ্যাডভ্যান্স করবে রকি, নগদ।

'সেসনা হতেই হবে, কেন?'

রানা বলল, 'কারণ সেসনার রয়েছে হাই উইং কনফিগারেশন।'

'লাভ?'

'লাভ, সহজে জাম্প করা যায়।'

কৌতূহল মিটল রকির।

গোটা ভিলাটা চক্কর দিচ্ছে ট্যানডন আর বোরিগিয়ানো। সব আয়োজন নিজের চোখে দেখেছে ওরা, তারপর এক জায়গায় থেমে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

মেইন গেটের বাইরে গার্ডদের সঙ্গে আলাপ করল ওরা, তারপর বাগানের পথ ধরে ফিরতে শুরু করল।

'এভাবে আর যদি এক হপ্তা কাটে, আমি পাগল হয়ে যাব,' বলল ট্যানডন।

'তোমার পাগল হওয়ায় কিছু এসে যায় না,' মন্তব্য করল বোরিগিয়ানো। 'ভাবো গডফাদারের কি অবস্থা হবে।'

'হুম।' ট্যানডনের গম্ভীর চেহারায় দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ।

'তুরিনের খবর শুনেছ নিশ্চই?' জানতে চাইল বোরিগিয়ানো। 'নাইটক্লাব থেকে হপ্তার টাকা তুলতে গিয়ে আমাদের তিনজন লোক মারা গেছে। পাবলিক খেপে গেলে কি অবস্থা হয় জানই তো। উন্মত্ত মানুষ ওদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখেছে পুলিস, কাউকে গ্রেফতার পর্যন্ত করেনি।'

'রোমে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ নিয়ে চারটে পরিবার মারামারি শুরু করেছে,' বলল ট্যানডন। 'ছ'জন মারা গেছে এরই মধ্যে। এমনকি কালাব্রিয়াতেও গোলমাল শুরু হয়েছে। জেল থেকে আইন-শৃঙ্খলার জন্যে আবেদন জানিয়েছে ডন ব্যামবিনো ফেটুচিনি, পরদিনই তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। অথচ আমাদের গডফাদার কিছুই করছে না, কাউকে একটা নির্দেশ পর্যন্ত দিচ্ছে না সে।'

'গামবেরি আসছে কাল, পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে চায়,' বলল বোরিগিয়ানো। গডফাদারের অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্যানডন। আজ বিশ বছর ডন বাকালার সঙ্গে আছে সে। বিপদের সময় এই লোক ছাড়া আর কারও ওপর ভরসা করতে শেখেনি। সেজন্যেই এতটা অসহায় লাগছে তার।

হঠাৎ বোরিগিয়ানো ট্যানডনের একটা হাত খামচে ধরল। শিউরে উঠে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল দু'জন।

কোন শব্দ না করে কালো এক জোড়া ছায়া অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। একেবারে কাছে চলে এল ওগুলো, ঘন ঘন নাক কোঁচকাচ্ছে, তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'বেজন্মা কুকুরগুলোকে দেখলেই আমার ল্যাট্রিনের বেগ চাপে,' অভিযোগের সুরে বলল বোরিগিয়ানো।

'ভয় পাবার কোন কারণ নেই,' হেসে উঠে বলল ট্যানডন। 'আমাদের গন্ধ চেনে ওরা।'

'কোন কারণে যদি ভুল হয়, যদি চিনতে না পারে?' শিউরে উঠল বোরিগিয়ানো। 'কি জানি কি আছে কপালে!'

কিচেনের দরজা দিয়ে ভিলায় ঢুকল ওরা। বিশাল কামরা, পাথরের দেয়াল। অতিরিক্ত বডিগার্ডদের জন্যে ক্যানটিন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে কামরাটাকে। আটজনকে দেখা গেল, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে কফি খাচ্ছে, আর টেলিভিশন দেখছে। কাঠের টেবিলে এঁটো বাসনকোসন পড়ে রয়েছে এখনও। ছ'টা সাবমেশিনগান আর দুটো শটগান দেখল ওরা, সবগুলো হাতের কাছে রাখা। কিচেন থেকে একটা প্যাসেজ ভিলার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে। প্রথম কামরায় কাঠের বাক্স তৈরি করা হয়েছে, বডিগার্ডরা বিশ্রাম নেবে এখানে। কয়েকজনকে দেখা গেল ঘুমাচ্ছে, কেউ কেউ বসে গল্প করছে। ওদের টহলের পালা শুরু হবে মাঝরাতে।

প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা সিঁড়ি। দোতলায় উঠে গেছে সেটা, সেখানেই ডন বাকালার স্টাডি আর বেডরুম। ট্যানডন আর বোরিগিয়ানোর বেডরুমও ওই দোতলায়। বডিগার্ডদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে এল ওরা।

স্টাডির বাইরে ডন বাকালার পার্সোনাল বডিগার্ড একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছে, কোলের ওপর সাবমেশিনগান। ওদেরকে দেখে উঠে দাঁড়াল সে, দরজায় টোকা দিল দু'বার, কবাট মেলে ধরল। রিপোর্ট করার জন্যে ভেতরে ঢুকল ওরা।

•

দু'দিন পর দমকা বাতাস নিস্তেজ হয়ে পড়ল। চব্বিশ ঘন্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকবে। আকাশে ছোটখাট মেঘ জমতে পারে, পুবদিক থেকে হালকা বাতাস বইবে, উত্তর সিসিলির দু'এক জায়গায় অল্প বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

তৈরি হল রানা।

সন্ধে নামতে বড়, চওড়া স্যুটকেস খুলে একটা পার্সেল বের করল ও, ফরাসী জেনারেল মার্সেলেসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এটা। বাইরে, ঘাসের ওপর বসে, ওর দিকে তাকিয়ে আছে সুসান আর রকি। পার্সেল খুলে বিশাল একটা কালো কাপড়ের ভাঁজ করা থান বের করল রানা।

'দেখে তো প্যারাস্যুট বলে মনে হচ্ছে না,' অবাক হয়ে বলল রকি।

'বরং অনেকটা ডানার মত,' বলল রানা। 'লাফ দাও, তারপর ভাগ্যের ওপর

নির্ভর কর, সেদিন ফুরিয়েছে। এটা ফ্রেঞ্চ মিস্ট্রাল। ভাল ট্রেনিং পাওয়া একজন "প্যারা" এমনকি বাতাসের উল্টো দিকেও এটা নিয়ে ফ্লাই করতে পারবে, টার্গেটের কয়েক গজের মধ্যে ল্যাণ্ড করা আজকাল কোন সমস্যাই নয়।'

কর্ডগুলো একটা নকশার মত করে বিছাল রানা, ওরা তাকে সাহায্য করল। তারপর পিছিয়ে এসে দেখল কিভাবে রানা দক্ষতার সঙ্গে বাঁধল কর্ডগুলো। সবশেষে ক্যানোপিটা ভাঁজ করল আবার।

প্যারাস্যুট প্যাক করে মোবেক্সের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল রানা। রকির দিকে ফিরে বলল, 'আধ ঘন্টার মধ্যে রওনা হব আমি।'

'কোন সাহায্য লাগবে?' জিজ্ঞেস করল রকি।

'না, নিজেই করতে পারব। এখানেই অপেক্ষা কর তোমরা।'

মোবেক্সের ভেতরে এসে দ্বিতীয় পার্সেলটা খুলল রানা, ঢাকা থেকে মেজর জেনারেল রাহাত খান পাঠিয়েছিলেন এটা। পার্সেল খুলতে সোঁদা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে, অনেকদিন ব্যবহার না করলে কাপড় থেকে এই গন্ধটা বেরোয়। রানার পুরানো একটা ক্যামোফ্লেজ কমব্যাট ইউনিফর্ম। কাপড় ছেড়ে ইউনিফর্মটা পরল ও।

মোবেক্সের বাইরে যখন বেরিয়ে এল, চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। ল্যানসিয়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রকি আর সুসান। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রানা। চাপা গলায় ফুঁপিয়ে উঠল সুসান।

রানা কে, কি করতে কোথায় যাচ্ছে, সবই জানে ওরা, কিন্তু ওকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে এই প্রথম ধাক্কাটা খেল।

অতিরিক্ত ফোলানো বেলুনের মত লাগছে রানাকে। বুটি বুটি দাগ আর ছোপ লাগানো ওভারঅল পরে আছে ও, নিচের দিকটা কালো আর লম্বা বুটের ভেতর গোঁজা। ইউনিফর্মের দুটো পায়ে অনেকগুলো পকেট, ফুলে আছে সবগুলো। বুকের কাছে অনেকগুলো কর্ড আর একজোড়া পকেট। এই পকেট দুটোও ফুলে আছে, ভেতরে গ্রেনেড। কোমরের কাছে বড়সড় একটা পাউচ। বেল্টের ডান দিকে একটা ক্যানভাস স্ন্যাপ-ডাউন হোলস্টার, সেটার পাশে আর পিছনে ছোট ছোট আরও অনেকগুলো পাউচ। গলা থেকে একটা স্ট্র্যাপের সঙ্গে ঝুলছে ইনগ্রাম সাবমেশিনগান, স্ট্র্যাপের লুপে ঢুকে আছে ডান কনুই। বাঁ হাতে রয়েছে কালো, নিটেড, স্কালক্যাপ।

প্যারাস্যুট তুলে নিয়ে ল্যানসিয়ার দিকে এগোল রানা, মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা রেডি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু বলতে গেল রকি, কিন্তু আওয়াজ বেরুল না। দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। প্যারাস্যুটটা ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে সুসানের দিকে ফিরল রানা। 'কিছু বলার নেই, সুসান; সবই তো জানো।'

নাক টানল সুসান, প্রকাণ্ড হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল, তারপর রানার দিকে তাকাল। 'আমারও কিছু বলার নেই, রানা। শুধু একটা কথা জেনো, আড়াল থেকে সব দেখতে পাচ্ছে, লুবনা। ওর আর কোন কষ্ট বা দুঃখ নেই।'

শক্ত পাথর হয়ে উঠল রানার চেহারা। পরমুহূর্তে শিথিল হল মুখের রেখাগুলো। সুসানের কাঁধে একটা হাত রাখল ও। 'আমার জন্যে কোন দুশ্চিন্তা কোরো না। এসব কাজ আগেও আমি করেছি—পানির মত সহজ।'

অবিরাম ধারায় সুসানের গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। হঠাৎ রানাকে আলিঙ্গন করল সে তারপর ছেড়ে দিয়ে পিছন ফিরল, মোবেক্সের ভেতর ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

এয়ারফিল্ড বিশ মিনিটের পথ। পিছনের সিটে শুয়ে আছে রানা, রাস্তা থেকে কেউ ওকে দেখতে পাবে না। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা।

রকি জানতে চাইল, 'তুমি বেরুবে কিভাবে?'

'বাতাসের দিকেও সেসনার দরজা খোলা যায়,' বলল রানা।

'না, ভিলা কোলাসির কথা জিজ্ঞেস করছি আমি। ভেতরে ঢুকবে জানি, কিন্তু বেরুবে কিভাবে?'

পরবর্তী প্রশ্নের অবকাশ না রেখে, ছোট্ট করে জবাব দিল রানা, 'ঢোকার পথ থাকলে বেরুবারও পথ আছে।'

খানিক পর জানতে চাইল রানা, 'সব কথা তোমার মনে আছে তো, রকি? কি করতে হবে না হবে?'

'আছে,' বলল রকি।

'আজ রাতে?'

'হ্যাঁ, মোবেক্স নিয়ে রওনা দেব আমরা।'

'এক মিনিটও দেরি করবে না,' বলল রানা। 'চারদিকে নানা রকম গোলযোগ শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু সকালে তোমাদের ওই ফেরিতে ওঠা চাই।'

'জানি,' বলল রকি। 'সামনে এয়ারফিল্ড—বাইরে শুধু দুটো গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না।'

হ্যাঙ্গারের পিছনে ল্যানসিয়া থামাল রকি। হাতে স্যুটকেস নিয়ে নেমে পড়ল। পিছন দিকে একবারও তাকাল না সে, বলল, 'গুড লাক, রানা।'

'ধন্যবাদ, রকি।'

স্টার্ট-আপ চেক শেষ করল ভেলুচি ডেলু। এই চার্টারের মেয়াদ শেষ হলে খুশি হয় সে। এয়াফোর্স থেকে ট্রেনিং পাওয়া পাইলট, নিয়ম ভাঙতে অভ্যস্ত নয়। ছ'ঘন্টা ধরে স্ট্যাণ্ড-বাই থাকায় গলায় এক ফোঁটা মদ ঢালতে পারেনি সে। ঠিক করেছে

রাতটা ট্রাপানিতেই থেকে যাবে, বন্ধুদের নিয়ে মদ খাবে সকাল পর্যন্ত। ওখানে তার অনেক বন্ধু আছে।

আড়চোখে ডান পাশের সিটে বসা অস্ট্রেলিয়ান লোকটার দিকে তাকাল সে। লোকটাকে একটু নার্ভাস লাগছে। এরকম নার্ভাস লোক দেখে অভ্যস্ত ডেলু। 'আমরা রেডি,' বলল সে।

'গুড।' মাথা ঝাঁকাল আরোহী।

জ্যান্ত হয়ে উঠল সেসনার এঞ্জিন। অয়েল প্রেশার গজের দিকে তাকাল ডেলু। আরোহী টোকা দিল তার কাঁধে। এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা, 'পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'এক ঘন্টার কিছু কম,' বলল ডেলু। তার দৃষ্টি ডায়ালের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'প্লেনে টয়লেট নেই?' আবার জিজ্ঞেস করল আরোহী।

মাথা নাড়ল ডেলু।

'কিন্তু আমার যে টয়লেটে একবার না গেলেই নয়!'

ক্ষীণ একটু হাসল ডেলু। এ লোক সত্যি নার্ভাস। হাত বাড়িয়ে ডান দিকের দরজাটা খুলে দিল সে। 'যান। সাবধানে নামবেন।'

সিট বেল্ট খুলে প্লেন থেকে নেমে গেল আরোহী। আবার ডায়ালের দিকে মন দিল ডেলু।

দু'মিনিট পর দরজায় একজনকে দেখা গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই পাথর হয়ে গেল পাইলট। প্রথমেই চোখ পড়ল পিস্তলটা। তারপর লোকটাকে দেখল।

'তোমার কাজ তুমি কর,' বলল রানা। 'কোন ভয় নেই।'

বেল্ট দিয়ে নিজেকে আটকাল না রানা। সিটে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকল শুধু, ডান হাতটা ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের মাথায়, শরীরটা পাইলটের দিকে বাঁকানো। হাতের পিস্তল নিচু করা, পাইলটের পাঁজরের কাছাকাছি।

'চেক কমপ্লিট কর,' বলল রানা। 'নিয়ম ধরে করবে। সেসনা চালাতে জানি আমি। রেডিও প্রসিডিউরও জানা আছে। বোকার মত কিছু করতে যেয়ো না।'

স্থির হয়ে বসেই থাকল পাইলট। হাত দুটো হাঁটুর ওপর। মাথার ভেতর দ্রুত চিন্তা চলছে। নতুন আরোহী তার চিন্তায় বাধা দিল না, চুপচাপ বসে থেকে অপেক্ষা করছে। অবশেষে মনস্থির করল ডেলু। কিছুই বলল না সে, নিঃশব্দে টেকঅফের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

দশ মিনিট পর। মেসিনা প্রণালীর চার হাজার ফিট ওপরে উঠে এসেছে সেসনা। সামনে দেখা যাচ্ছে সিসিলির আলো। আরও ওপরে উঠছে ওরা।

'পিস্তলটা তুমি সরিয়ে রাখতে পার। আমি জানি তুমি কে। আমিও আছি তোমার পাশে!'

মাত্র এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর ক্যানভাস হোলস্টারে ভরে রাখল কোল্ট। দুই সিটের মাঝখানে হাত গলিয়ে পাইলটের চার্টটা তুলে নিল ও। ট্রাপানির রুট পেন্সিল দিয়ে দাগানো রয়েছে। ভিলা কোলাসি থেকে তিন মাইল দক্ষিণের পথ ধরে যাবে ওরা। 'টারমিনি ইমেরেসি বীকন পেরোবার পর, আমি চাই, একটু ঘুর-পথে যাবে তুমি,' বলল রানা।

গম্ভীর একটু হাসি দেখা গেল পাইলটের মুখে। 'এই চার্টারের জন্যে আরও বেশি টাকা চাওয়া উচিত ছিল আমার।'

'কম—তোমার আরোহী সবটুকু পথ যাচ্ছে না।'

'ভাগ্যই বলতে হবে পুরোটা অ্যাডভান্স পেয়ে গেছি,' বলল ডেলু। 'নিন, ব্রিফ করুন।'

ম্যাপ নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। 'দেখতে না পাওয়ার কোন কারণ নেই। পালার্মো থেকে দক্ষিণ দিকে পাঁচ কিলোমিটার, মনরেলা থেকে পুব দিকে তিন কিলোমিটার। আলোয় ক্রিসমাস ট্রি-র মত ঝলমল করছে।' ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে তাকাল ও। পাঁচ হাজার ফিট ওপরে রয়েছে সেসনা। এখনও উঠছে। 'সাধারণত ক'হাজার ফিটে সিধে কর প্লেন?'

'সাত হাজারে।'

'গুড। বীকন না পেরোনো পর্যন্ত ওই হাইটেই থাক। তারপর আবার উঠতে শুরু করবে, বারো হাজার ফিট পর্যন্ত।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল ডেলু।

'হাই অলটিচ্যুড, লো ওপেনিং,' ব্যাখ্যা করল রানা।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল ডেলু। 'আমরা ওটাকে ডিলেইড ফ্লোট বলি। প্যারাস্যুট খুলবেন ক'হাজার ফিটে?'

'দু'হাজার, তার আগে নয়—অবশ্য নির্ভর করবে আমার ফ্রি ফল ড্রিফটের ওপর। বাতাস পুব দিকে বইছে, দশ নটে।'

প্যারাস্যুট প্যাকের দিকে তাকাল পাইলট। 'কি ধরনের ওটা?'

'একটা ডানা—ফেঞ্চ মিস্ট্রাল।'

'আপনার ভাগ্যই বলতে হবে, ডিউটিতে আজ আমি ছিলাম,' বলল ডেলু। 'ওদের অত্যাচারে আমাদের পরিবার অনেক ভুগেছে। আপনি যা করছেন, আমরা ইটালিয়ানরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকল ওরা। তারপর রানা জানতে চাইল, 'তুমি কি তারপর ট্রাপানিতে যাবে?'

'না। রেগিয়োতে ফিরে যাব—সেটাই নিরাপদ। অস্ট্রেলিয়ান লোকটা কে?'

ককপিটের ম্লান লালচে আলোয় রানার চেহারা নরম দেখাল। 'তোমার মতই একজন।'

*

হিলটনের বারে রয়েছেন কর্নেল গুগলি, খোলা জানালার দিকে পিছন ফিরে কাউন্টারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—হাতে ককটেল গ্লাস, চোখে সুন্দরী রমণী। খুবই খোশ-মেজাজে আছেন তিনি, তাঁর হাতের ককটেল একটা হাইবল। দেহ-মনে ফূর্তি এনে দিয়েছে স্বর্ণকেশী আমেরিকান মেয়েটা। এক কোণের একটা টেবিলে ওরা দুই বান্ধবী বসে আছে, অপরজন নিগ্রো যুবতী। চোরা চোখে লেডিকিলার কর্নেলের দিকে প্রায়ই তাকাচ্ছে শেতাঙ্গিনী, চোখাচোখি হতে একটু লজ্জা পাচ্ছে, দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার আগে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠছে তার ঠোঁটে।

কর্নেলের সঙ্গেই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেমারিক আর পাধানি। রেমারিক অন্যমনস্ক। কিন্তু পাধানি শুধু ব্যাপারটা টেরই পায়নি, উপভোগও করছে। আটত্রিশ বছর বয়স কর্নেলের, কোন মেয়ে এখনও তাঁকে বাঁধতে পারল না, সেজন্যে দুঃখের অবধি নেই পাধানির। আসলে কর্নেলেরই কপাল খারাপ। যখনই সুন্দরী কোন মেয়ের দিকে ঝুঁকবেন তিনি, তখনই জরুরি কাজের ডাক আসে, মেয়েটাকে হতাশ করে কর্তব্যের পিছনে ছুটতে হয় তাঁর। শুধু এই একটা কারণে কত মেয়ে যে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, গুনে শেষ করা যাবে না।

কর্নেল আর আমেরিকান মেয়েটাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করে পাধানি উপলব্ধি করল, ওদের যদি মিলন হয়, আদর্শ একটা দম্পতি হতে পারবে ওরা।

কি যেন বলল পাধানি; রেমারিক শুনতে পেল না। কয়েকদিন থেকেই প্রচণ্ড একটা টেনশন অনুভব করছে সে। রানার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না।

সাধারণ একটা রেডিও, মানুষের মাথা থেকে বেরিয়েছে, দুনিয়ার সবখানে আর মহাশূন্যের কোটি কোটি মাইল দূরে সিগন্যাল পাঠাতে পারে। তাহলে এ-ও বাস্তব বলে মনে হয় যে মাথাটাও, রেডিওর চেয়ে অনেক বেশি নিখুঁত আর সফিসটিকেটেড, নিশ্চয়ই সিগন্যাল পাঠাতে পারে, পারে আরেক মাথার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

এসব কথা ভাবছে না রেমারিক। কিন্তু তার মন গাইছে, সে আসছে—রানা আসছে। আর বেশি দূরে নেই। আশ্চর্য একটা অস্থিরতা বোধ করছে সে। মনে হচ্ছে, কি যেন একটা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করা দরকার তার। তা না হলে রানার আগমন টের পাবে না।

বারটেণ্ডারকে আরও ড্রিঙ্কের জন্যে বললেন গুগলি। খুক করে কেশে আবার রেমারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল পাধানি। মেয়েটার ব্যাপারে রেমারিকের মন্তব্য শুনতে চায় সে।

'এত উদাস কেন?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলেন গুগলি।

'না,' অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল রেমারিক।

'মেয়েটাকে দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন গুগলি। 'ঠিক বুঝতে পারছি না,

কাকে পছন্দ করছে ও। প্রতি মিনিটে বিশ সেকেণ্ড করে আমাদের তিনজনকেই দেখছে। কি বুঝব?' '

'ঘড়ি আমার হাতেও আছে, কর্নেল,' পাধানি বলল। 'হিসেবে ভুল করছেন আপনি।'

'তাই?' একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন গুগলি। 'কি রকম?'

হঠাৎ কর্নেলের একটা হাত খামচে ধরল রেমারিক। 'শুনুন!' চাপা গলায় বলল সে, তার হাত কাঁপছে।

খোলা জানালা দিয়ে অত্যন্ত অস্পষ্ট একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেতরে ঢুকছে। মনে হল অনেক দূর দিয়ে একটা প্লেন যাচ্ছে।

'রানা!'

কর্নেল আর ক্যাপ্টেন হতভম্ব, তাকিয়ে আছে রেমারিকের দিকে।

'রানা!' আবার ফিসফিস করে বলল রেমারিক।'এসে গেছে ও!'

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন কর্নেল।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল রেমারিক, টেবিলে একটা ধাক্কা খেল। কর্নেলের দিকে ঝুঁকল সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'ও একজন প্যারাট্রুপার কমাণ্ডো,' কাঁপা গলায় বলল সে। 'প্লেন ছাড়া আর কিসে করে আসবে ও!' দরজার দিকে ছুটল সে।

কর্নেল দাঁড়ালেন, দেখাদেখি পাধানিও। স্বর্ণকেশীর দিকে তাকালেন কর্নেল, তাঁর চোখে বিষাদের ছায়া দেখল পাধানি।

'এসো,' বললেন গুগলি।'লোকটার সময়জ্ঞান আগের মতই আছে, একটুও বদলায়নি।'

ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে দরজা। ফাঁকটার মাঝখানে রানার মুখ আর কাঁধ দেখা যাচ্ছে। রাবারের সোল লাগানো বুট জোড়া আণ্ডারক্যারিজের অবলম্বনের ওপর স্থির হয়ে আছে। খুলি কামড়ে বসে আছে স্কালক্যাপ, মুখের নিচের অংশ রঙ লাগিয়ে কালো করা হয়েছে। চোখ দুটো অপলক স্থির হয়ে আছে পাইলটের ওপর।

দক্ষ হাত, গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্লেন চালাচ্ছে ডেলু। আস্তে ধীরে প্লেনটাকে কাত করল সে, ডানে-বামে ঘন ঘন তাকাচ্ছে, বেয়ারিংগুলো দেখে নিয়ে কমপাসের সঙ্গে মিলিয়ে কোর্স ঠিক রাখছে। তার বাঁ পা রাডারে উঠে এল, চাপ দেয়ার জন্যে তৈরি। তার ডান হাত শূন্যে উঠে পড়ল। 'চালিয়ে যাও, মাসুদ রানা! আমরা আছি তোমার···।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডেলু। দরজা খালি।

ভিলা কোলাসির সব ক'টা জানালা বন্ধ।

দোতলার একটা জানালা খুট শব্দ করে খুলল, সামান্য একটু ফাঁক হল

কবাট। ধীরে ধীরে, এক চুল এক চুল করে সরল পর্দা। লাল টকটকে একটা চোখ দেখা গেল পর্দার ফাঁকে।

অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকল ডন বাকালা। বাগান আর লন পুরোপুরি অন্ধকার নয়, পাঁচিলের বাইরে থেকে ফ্লাডলাইটের আলো না এলেও, আলোর আভা আসতে বাধা পায়নি। গত কয়েক দিনে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। ভয়ের জায়গা দখল করে নিয়েছে হতাশা, আর রাগ। যুগ যুগ ধরে যারা অনুগত ছিল, সেই পা-চাটা কুকুরগুলো এখন তার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এমনকি যারা তার চারপাশে থাকে। মুখে কিছু না বললেও ওদের চেহারা দেখে সে বুঝতে পারে সব। তার এই স্টাডিতে বসে নির্লিপ্ত একটা ভাব দেখিয়ে গেছে গামবেরি। কি দুঃসাহস!

উন্মাদ লোকটা মারা যাক, তারপর সে ওদের দেখে নেবে। তখন ওরা বুঝবে, কতটুকু তার ক্ষমতা। বুলেট আকৃতির নিচে চওড়া মুখটা কঠোর হয়ে উঠল। দৃঢ় একটা প্রতিজ্ঞায় ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে সেঁটে আছে। পর্দা টেনে দিয়ে ডেস্কের দিকে ফিরল সে।

কয়েক সেকেণ্ড পর পাঁচিলের ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো, পোয়াতি বাদুড়ের মত উড়ে এল রানা।

এগারো

বাগানের পাশে ঘাসের ওপর ল্যাণ্ড করল রানা। পা মাটির স্পর্শ পেতেই ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, কয়েকটা ডিগবাজি দিয়ে ছোট্ট এক লাফে সিধে হয়ে দাঁড়াল—রিলিজ হ্যাণ্ডেল টান দিয়ে আগেই প্যারাস্যুট থেকে মুক্ত করে নিয়েছে নিজেকে। একটা গাছের গায়ে কালো আবরণের মত ঝুলে আছে প্যারাস্যুট।

ব্যস্ত হাতে বেরিয়ে এল কোল্ট আর সাইলেন্সার। আঙুলে বিদ্যুৎ খেলে গেল, প্যাঁচ ঘুরিয়ে ফিট করল সাইলেন্সার। সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, একটা গাছের দিকে পিছন ফিরে আছে। বুকের একটা পাউচ থেকে নাইট সাইট বের করল।

বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, পুরো লনের ওপর চোখ বুলাল, ভিলার একপাশ ঘুরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল ওগুলোকে। এক জোড়া নিচু, কালো আকৃতি, পাশাপাশি, ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। কোল্ট আর নাইট সাইট একই সরল রেখায় স্থির রয়েছে। গভীর করে শ্বাস টেনে আরও একটু ঝুঁকল রানা। ডোবারম্যান নিঃশব্দে হামলা চালায়, খুন করে নিঃশব্দে।

ওগুলো মরলও নিঃশব্দে। প্রথমটা দশ মিটার দূরে, বুকে আর গলায় বুলেট নিয়ে। দ্বিতীয়টা হার্টে গুলি খাবার আগে পাঁচ মিটারের মধ্যে চলে এল, গুলি খাবার পরও তার গতি পুরোপুরি রুদ্ধ হল না, রানার পায়ের কাছে এসে একটা হেঁচকি

তুলে মারা গেল।

কিচেনে ওরা ফুটবল খেলা দেখছে। জুভেন্টাস বনাম নেপলস। সবার চোখ আঠার মত আটকে আছে টিভির পর্দায়। জানালা বিস্ফোরিত হওয়ার শব্দে সবাই ঘাড় ফেরাল, দেখল, অশ্লীল আকৃতির একটা গ্রেনেড জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে।

তিন জন মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে। দু'জন চিরকালের জন্যে অচল হয়ে গেল শ্র্যাপনেলের আঘাতে। বিস্ফোরণের আঘাত থেকে রক্ষা পেল চারজন, বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। লাথি মেরে খোলা হল দরজা, তখনও অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াবার মত হুঁশ ফেরেনি ওদের।

বুকের কাছে সাবমেশিনগান ধরে দরজায় দাঁড়াল রানা। চোখ দুটো চঞ্চল, কিছু নড়ে কিনা দেখছে। সাদা আগুনের শিখা বেরুল ইনগ্রাম থেকে। ঘরের ভেতর থেমে গেল প্রাণস্পন্দন।

যেন কোন ব্যস্ততা নেই, অথচ দ্রুত, এগোচ্ছে রানা। খোলা দরজার পাশে দাঁড়াল ও, বাইরে প্যাসেজ। পাথুরে মেঝেতে ছিটকে পড়ল খালি একটা ম্যাগাজিন। ক্লিক শব্দে নতুন আরেকটা বসাল জায়গামত। আবার কক্ করল ইনগ্রাম। দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ, কান দুটো সজাগ।

প্যাসেজের মাঝখান থেকে কর্কশ চিৎকার ভেসে এল, আরও অস্পষ্ট হৈ-চৈ এল ওপরতলা থেকে। কি ঘটছে, জানতে চাইছে ওরা। এক এক করে অনেকগুলো দরজা খোলার আওয়াজ হল। কোমর বাঁকা করে নিচু হল রানা, ঝট করে দাঁড়াল খোলা দরজার সামনে, ইনগ্রাম নিচের দিকে তাক করা, অগ্নি উদগীরণ করছে।

প্যাসেজে তিনজন লোক। একজন পিছিয়ে গিয়ে কামরার ভেতর ঢুকে পড়তে পারল। বাকি দু'জন বুলেটের ধাক্কা খেয়ে নির্দিষ্ট একটা ছন্দে পিছিয়ে যেতে শুরু করল, সেই সঙ্গে লম্বায় ছোট হতে থাকল দ্রুত।

আবার এগোল রানা, আবার খালি ম্যাগাজিন ছিটকে পড়ার আওয়াজ হল পাথুরে মেঝেতে। এ যেন এক ধরনের উঁচু দরের তাল লয় সহ বিশুদ্ধ নৃত্য শিল্প। ছন্দোবদ্ধ, সুচারু, সুনিপুণ; প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে তাল ও লয়ের মিল থাকছে। নৃত্যের সঙ্গে মিল রেখে সঙ্গীত—আর্তচিৎকারকে চাপা দিয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠা গানফায়ার, খরচ হয়ে যাওয়া কার্ট্রিজের টুনটুন বোল।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল না রানা, বাঙ্কগুলোর মাঝখানে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল শুধু। প্যাসেজ ধরে কয়েক পা এগিয়ে এল, বিস্ফোরণের আওয়াজে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে লোকটা, গোঙাচ্ছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে মেঝেতে। শটগানটা আটকে গেছে কাপড়ে, চেষ্টা করেও তুলতে পারছে না। ট্রিগারে চাপ পড়ল, ইনগ্রাম থেকে আধ সেকেণ্ড গুলি বেরুল। আবার ঘুরল রানা, পৌঁছে গেল সিঁড়ির গোড়ায়. দেয়ালে পিঠ

ঠেকিয়ে দাঁড়াল, বুকের কাছে ইনগ্রাম, কান দুটো সজাগ।

ল্যাণ্ডিঙের ওপরে, স্টাডির দরজায় ডান হাতে একটা পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডন বাকালা। বাঁ হাত দিয়ে পার্সোনাল বডিগার্ডের শার্টের আস্তিন আঁকড়ে ধরেছে সে।

'থাকো এখানে!' খেঁকিয়ে উঠল বাকালা, ঘামে ভেজা চেহারায় আতঙ্ক। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্যানডন, বোরিগিয়ানো, আর গামবেরি। পিস্তলগুলো নিচের দিকে তাক করা। ট্যানডনের গায়ে শার্ট নেই, তার বুক আর পিঠ ঢাকা আছে কালো লোমে। 'নিচে নামো!'

ঘাড় ফিরিয়ে ডন বাকালার দিকে তাকাল ওরা। সবাই ইতস্তত করছে। ঘৃণায়, রাগে, ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে বাকালার মুখ। 'নিচে নামো!' কর্কশ গলায় আবার গর্জে উঠল সে, হাতের পিস্তলটা তুলল।

নড়ে উঠল ট্যানডন, সাপের মত এগোল তার পা, এক ধাপ নিচে নামল। তার শরীরের ওপরের অংশটুকু শুধু দেখতে পাচ্ছে বাকালা, এই সময় কানে তালা লাগিয়ে দিল সাবমেশিনগানের একটানা আওয়াজ। বাকালা দেখল, একটা ঝাঁকি খেয়ে শূন্যে উঠল ট্যানডন, কালো লোমের মাঝখানে কাঁচা লাল গর্ত দেখা গেল। পরমুহূর্তে চোখের আড়ালে পড়ে গেল সে। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল লাশটা নিচের দিকে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে।

পিছিয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠে আসছে বোরিগিয়ানো আর গামবেরি। নিচে নামবে না ওরা। দু'জনেই ডান দিকে তাকাল, দশ মিটার পিছনে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাকালা, বডিগার্ডের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে আছে। আবার যখন ওরা সিঁড়ির দিকে ফিরল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। দু'জনের ঠিক মাঝখানে বিস্ফোরিত হল গ্রেনেডটা। ল্যাণ্ডিঙের কোণ আড়াল করে রাখায় বাকালা আর বডিগার্ড বেঁচে গেছে।

গ্রাস করল নিখাদ আতঙ্ক। বডিগার্ডের পিঠে ধাক্কা দিয়ে পিছিয়ে স্টাডির ভেতর ঢুকে পড়ল বাকালা। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে। খোলার ধৈর্য হল না, পিস্তলের বাঁট দিয়ে কাঁচ ভেঙে, এক টানে ছিঁড়ে ফেলল পর্দা। তারপর বাইরে মুখ বের করে চিৎকার জুড়ে দিল, 'কোথায় তোমরা? ওপরে উঠে এসো! ওপরে উঠে এসো!'

সিঁড়ির মাথায় থামল রানা, বিধ্বস্ত শরীরগুলোর ওপর চোখ বুলাল। প্যাসেজের গা ঘেঁষে এগোল ও, বাকালার উন্মত্ত চিৎকার পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে।

ইনগ্রামটা ডান হাতে, বাঁ হাত দিয়ে একটা গ্রেনেড বের করল। গ্রেনেড ধরা হাতটা নিচু করে ইনগ্রামের পাশে আনল, ডান হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে খুলে নিল

পিন। স্প্রিঙ রিলিজ করল, মাথার ভেতর ঘড়িটা টিক টিক করল দু'বার, আঙুলগুলো ছড়াতে শুরু করল। হাত থেকে ছুটে গেল গ্রেনেড, কোণ ঘুরে মেঝেতে ড্রপ খেল দু'বার, ঠক করে বাড়ি খেল স্টাডির দরজায়।

বিস্ফোরণের আওয়াজে জানালার দিকে পিছন ফিরল বাকালা। দেখল, ওক কাঠের মজবুত দরজা কব্জা সহ ভেতর দিকে ছিটকে পড়ছে। দরজার সঙ্গে তার পার্সোনাল বডিগার্ডের লাশও আছড়ে পড়ল কার্পেটে।

নেতাদের নেতা দাঁড়িয়ে থাকল—আড়ষ্ট। রক্ত-মাংসের দলা পাকানো পিণ্ডটার ওপর স্থির হয়ে আছে চোখ। মুখ খুলল সে, কিন্তু কোন আওয়াজ হল না। তার ব্রেন অচল হয়ে গেছে।

তারপর, নিচে থেকে ভেসে আসা চিৎকার শুনতে পেল সে। এতক্ষণে আসছে ওরা! দরজার দিকে তাকাল, তাকিয়ে থেকেই কুঁজো হল ভারি ডেস্কের পিছনে, পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করা। বুকের ভেতর তড়পাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, থেমে থেমে দমকা বাতাসের মত নিঃশ্বাস পড়ছে।

দোরগোড়া থেকে ডাইভ দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, কার্পেটে পড়েই গড়িয়ে দিল শরীরটাকে। লাশের ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে ঘরের ঠিক মাঝখানে চলে এল, উঠে দাঁড়াল এক লাফে। দু'বার গুলি করল বাকালা। কাঁপা হাতের গুলি, তবে একটা বুলেট লাগল। ঝাঁকি খেয়ে পাশে, আর পিছন দিকে সরে গেল রানা। দেখতে পেয়ে ডেস্কের পিছনে সিধে হল বাকালা, উল্লাসে দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে। পরপর আরও দু'বার গুলি করল সে—সেই কাঁপা হাতের গুলি।

তার অভিজ্ঞতা নেই। শুধু ভাগ্যই যথেষ্ট নয়।

রানার ডান কাঁধে গুলি লেগেছে, হাতটা কোন কাজে আসছে না। ইনগ্রামটা এখনও গলা থেকে ঝুলছে, বাঁ হাতে ধরে আছে সেটা। ডেস্কের দিকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে গেল ওটা থেকে।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা, কাঁধের অসহ্য ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে। ইনগ্রাম সিধে করে সাবধানে ডেস্কের দিকে এগোল ও।

কার্পেটে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে বাকালা। একটা হাঁটু শরীর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হাত দিয়ে তলপেটে চেপে ধরে আছে সে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে সাদা চর্বি দেখা যাচ্ছে, লাল রক্তের স্রোত মাঝেমধ্যে ঢেকে দিচ্ছে সাদা রঙটাকে। মুখ তুলে রানার চোখে তাকিয়ে আছে সে। তার দৃষ্টিতে ভয়, ঘৃণা আর আবেদন। তার সামনে দাঁড়াল রানা, জখমগুলো লক্ষ করল, বুঝল বাঁচবে না। ডান পা-টা তুলল ও। ঘামে ভেজা বাকালার গলার ওপর রাখল বুট। 'তুমি এখনও বেঁচে আছ সেজন্যে আমি খুশি,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। বাকালার গলায় চাপ দিল ও। নিচু গলায় কথা বলছে, নরম সুরে 'লুবনার মত, বাকালা। ওর মত তুমিও দম আটকে মারা যাবে।' ডান পায়ের ওপর শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে দিল সে।

গেটের গার্ড দু'জন ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগোল। কিচেন হয়ে প্যাসেজে এল তারা, সিঁড়ি বেয়ে উঠল দোতলায়। এমন কিছু দেখল না যাতে মনে জোর পাওয়া যায়। ট্যানডন আর বোরিগিয়ানোর লাশ আরও মন্থরগতি করে তুলল তাদেরকে। গেরিলা ট্রেনিং পাওয়া আমেরিকান লোকটা অকারণেই হাঁপাতে শুরু করেছে। যদিও দু'জনের মধ্যে তার সাহসই বেশি। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে বাকালার স্টাডির ভেতর তাকিয়ে আছে সে, একটু পিছনে দ্বিতীয় লোকটা। দলা পাকানো লাশটা দেখে বুঝল, বাকালার পার্সোনাল বডিগার্ড। অস্পষ্ট, প্রায় শোনা যায় না, গোঙানির আওয়াজ পেল তারা। স্টাডি থেকেই বেরিয়ে আসছে।

তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল আওয়াজ।

দু'জনের কেউই প্রথমে ঢুকতে চায় না, কাজেই যুক্তি করে একসঙ্গে, পাশাপাশি, এগোল। ওকে ওরা ডেস্কের পিছনে দেখতে পেল, নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল ওরা।

দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল রানা, দেয়ালে ঘষা খেতে খেতে কার্পেটে নেমে আসছে শরীর। আবার গুলি হল, এবার ইনগ্রাম থেকে। ঘরের এক দিক থেকে আরেক দিকে ছুটে গেল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট।

গেটের বাইরে ঘ্যাঁচ করে থামল পুলিস কার। প্রথমে লাফ দিলেন গুগলি, তারপর পাধানি। গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ। গেটের ডান দিকে ছোট একটা জানালা, সেটাও তালা দেয়া। জানালার কপাটে লাথি মারছে পাধানি, বেলের হাতল ধরে ঘন ঘন নাড়তে শুরু করলেন গুগলি।

হঠাৎ ওদের পিছনে তীক্ষ্ণ শব্দ করে উঠল হর্ন। লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেলেন গুগলি, পাধানি আর একটু দেরি করলেই ধাক্কা খেত। ভারি পুলিস কারটা খ্যাপা হাতির মত ছুটে এল গেটের দিকে।

গেটের এক পাশে গাড়ি তাক করল রেমারিক। সংঘর্ষের আওয়াজ হল প্রচণ্ড, কাজের কাজও হল। গেট নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও, দেয়াল থেকে খুলে বেরিয়ে গেল কব্জা সহ ইস্পাতের খানিকটা পাত—মাথা গলিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্যে যথেষ্ট।

মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকটা গলে ভেতরে ঢুকে গেল রেমারিক, কাঁকর ছড়ানো গাড়ি-পথ ধরে ছুটল ভিলার দিকে।

চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া পুলিস কারের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন গুগলি, কিন্তু সংবিৎ ফিরে পেয়ে এরই মধ্যে ফাঁকের ভেতর মাথা গলিয়ে দিয়েছে পাধানি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার পিছু নিলেন কর্নেল।

রেমারিককে ওরা দেখতে পেলেন ভিলার সদর দরজায়, তারপর সে বিল্ডিঙের কোণ ঘুরে ছুটল, অদৃশ্য হয়ে গেল কিচেনের দিকে।

পাধানিকে নিয়ে গুগলি যখন কিচেনে ঢুকলেন, রেমারিককে কোথাও দেখা গেল না। দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকালেন তিনি। প্রথমে নড়ে উঠল পাধানি, ঘুরে দাঁড়িয়ে বমি শুরু করল সে। তাকে সামলে ওঠার জন্যে খানিকটা সময় দিলেন গুগলি, তারপর রক্তের ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগোলেন। প্যাসেজের লাশ দেখে থামলেন একবার, উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতর তাকালেন। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে আবার থামলেন, ধাপের ওপর পড়ে থাকা লাশটা চিনতে অসুবিধে হল না।

'ট্যানডন,' পাধানিকে বললেন তিনি। 'বাকালার ডান হাত।'

সিঁড়ির মাথায় আবার একবার থামলেন গুগলি। লাশ দুটোর দিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হাসলেন তিনি। 'বাজি ধরবে?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল পাধানি। 'আপনি হারবেন।'

'চিনতে পারছ?' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে সহকারীর দিকে তাকালেন গুগলি। 'কিন্তু কিভাবে? তেমন কিছুই তো অবশিষ্ট নেই।'

'গামবেরি আর বোরিগিয়ানো,' বলল পাধানি। 'ওদের কিমা বানিয়ে ফেললেও চেনা যায়।'

'যাই বল, আমাদের হাতে আর কোন কাজই থাকল না—সব আবর্জনা সাফ!'

স্টাডিতে ঢুকলেন গুগলি। তিনটে লাশ। ডেস্কের পিছনে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে রেমারিক। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল সে। 'কুইক!' ফোঁপানো গলায় ডাকল রেমারিক। 'একটু সাহায্য করুন! কুইক!'

ডেস্কের পিছনে এসে ঝুঁকলেন গুগলি। রানার মুখের দিকে তাকালেন। 'তাহলে সত্যি ফেরেশতা নয়!' যেন মস্ত একটা ধাক্কা খেয়েছেন তিনি। 'তাহলে এত কিছু সম্ভব হল কি করে?'

'ইউ বাস্টার্ড!' সব ভুলে গাল দিল রেমারিক।

কর্নেলকে স্পর্শই করল না। ক্ষীণ, বিদ্রূপ মেশানো হাসি লেগে রয়েছে তাঁর ঠোঁটে। রানার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, রানার চোখ খোলা, সে-ও তাকিয়ে আছে। দু'জনের কারও চোখেই পলক নেই। ব্যথায় গাল কুঁচকে আছে রানার, কপালে চিটচিটে ঘাম। চোখ নামিয়ে রক্ত আর ছেঁড়া মাংসের দিকে তাকালেন গুগলি। রানার বগলের নিচে রেমারিকের একটা হাত ঢুকে গেছে, আরেক হাতে রানার হাত চেপে ধরে আছে সে। 'আপনার ডান হাত,' জরুরি আবেদন জানাল রেমারিক। 'এখানে চেপে ধরুন, আমার হাতের পাশে!'

হাঁটু মুড়ে বসলেন গুগলি। হাত বাড়ালেন। তাঁর হাতটা ধরে জায়গা মত বসিয়ে দিল রেমারিক।

'আর্টারি ছিঁড়ে গেছে। আঙুল দিয়ে চেপে ধরুন।'

নির্দেশ পালন করে নিচের দিকে, গুঁড়িয়ে যাওয়া কজির ওপর চোখ রাখলেন

গুগলি। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

'আরও জোরে!' চেঁচিয়ে বলল রেমারিক। এখন আর ফোঁপাচ্ছে না সে।

আরও জোরে চাপ দিলেন গুগলি, পেশীর ভেতর তাঁর আঙুল ডেবে গেছে। এখন আর আগের মত রক্ত বেরুচ্ছে না, গতি শ্লথ হয়ে এসেছে।

'আমি? আমি কি করব?' পিছন থেকে অস্থির কণ্ঠে জানতে চাইল পাধানি।

'ফোনে কথা বল। ওরা আসছে, কিন্তু বলে দাও সমস্ত ইকুইপমেন্ট যেন সঙ্গে নেয়। আর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে আমি একটা হেলিকপ্টার চাই।'

ব্যস্ততার সঙ্গে ফোনে কথা বলছে পাধানি, রেমারিক জখমগুলোর ওপর দ্রুত হাতে পট্টি বাঁধছে। ডান দিকে তাকিয়ে বাকালার লাশ দেখতে পেলেন গুগলি—আধ হাত জিভ বেরিয়ে আছে। রানার দিকে ফিরলেন। রূপোর একটা চেইনের সঙ্গে গলায় ঝুলছে খুদে একটা বই। রেমারিকের কাছে শোনা গল্পটা মনে পড়ে গেল। লুবনার দেয়া পবিত্র উপহার বুকে নিয়ে রওনা দিয়েছিল রানা। রক্তে ভিজে গেছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। আবার তিনি লোকটার মুখের দিকে তাকালেন। চোখ দুটো এখন বন্ধ। কান পেতে শুনলেন, বিড় বিড় করে বলছে রানা, 'এবার আমি ঘুমাব, লুবনা। এবার একটু ঘুমাব।'

কর্নেলের আঙুলগুলো ব্যথা করতে শুরু করল, তবু চাপ এতটুকু ঢিল হতে দিলেন না। এই লোকের জীবন আক্ষরিক অর্থেই এখন তাঁর হাতে। কিছু শব্দ ঢুকল তাঁর কানে। সাইরেনের একটানা বিলাপ, অতি ব্যস্ত রেমারিকের নাক দিয়ে গোঙানির মত আওয়াজ।

চোখ বন্ধ করে রানা যেন ঘুমাচ্ছে। মুখে ব্যথা-বেদনার কোন চিহ্ন নেই, চেহারায় পরম প্রশান্তি। এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন কর্নেল গুগলি, খুবই যেন হতাশ হয়েছেন।

বারো

জানাজায় প্রচুর লোক হল।

দিনটা ঠাণ্ডা, আকাশে মেঘ। নেপলসের পাহাড় ছুঁয়ে একটানা দখিনা বাতাস বইছে। ইটালির সবগুলো দৈনিক থেকে রিপোর্টাররা এসেছে। বিদেশী রিপোর্টারও সংখ্যায় অনেক, পঞ্চাশ জনের কম হবে না। বাকালা মারা যাবার পরদিন থেকে, গত একটা মাস এই একটা খবরই হেডিং ছিল কাগজগুলোয়। এই একটা মাস বেঁচে থাকার জন্যে যেন নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে রানা, তার ভাল-মন্দের খবর বিশেষ বুলেটিন আকারে ছাপা হয়েছে সকাল-সন্ধ্যায়।

নিষ্ফল একটা যুদ্ধ, শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছে বেচারা।

প্রথমে রানাকে রাখা হয় পালার্মোয়, ইনটেনসিভ কেয়ারে। মেডিক্যাল বোর্ড

থেকে সাংবাদিকদের বলা হল, ওর বেঁচে থাকার ক্ষীণ একটু আশা থাকলেও থাকতে পারে, মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে বেঁচে থাকল রানা, প্রাণ ধরে ঝুলে থাকল। দু'হপ্তা পর কারাবিনিয়ারির বিশেষ একটা প্লেনে করে নেপলসে নিয়ে আসা হল ওকে। প্রস্তাব এবং ব্যবস্থা, সবই কর্নেল গুগলির। পালার্মোর হাসপাতালের চেয়ে নেপলসের কারাদারেলি হাসপাতালে অনেক ভাল ইকুইপমেন্ট আছে, অনেক বেশি নিরাপদও।

ডাক্তাররা সবাই জান-জীবন দিয়ে লড়ল। অবশেষে একটু আশার আলোও দেখল তারা। কিন্তু জখমগুলো খুবই মারাত্মক, বেঁচে থাকার প্রচণ্ড আকুতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত কি হয় বলা যায় না।

সত্যি বলা যায়নি। মাসের শেষের দিকে দিনে দিনে খারাপের দিকে যেতে লাগল রানার অবস্থা। ভিজিটর একেবারে নিষিদ্ধ। ইটালি জুড়ে সাধারণ মানুষ প্রার্থনা করল ওর জন্যে। মেজর জেনারেল রাহাত খান ঢাকা থেকে নেপলসে চলে এলেন, সঙ্গে তিনজন বাংলাদেশী ডাক্তার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মারা যাবার আগের দিন ছাপা হল কাগজে, কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল মাসুদ রানা, ইটালীর জনসাধারণকে ধন্যবাদ জনিয়েছে সে। পরদিন সকালে চিরবিদায় নিল মহান বাঙালি যুবক।

রানাকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন কর্নেল গুগলির বড় ভাই। সার্জেন ভদ্রলোক মেডিক্যাল বোর্ডের ডিরেক্টর নির্বাচিত হয়েছিলেন। জানপ্রাণ দিয়ে খেটেছেন গত একটা মাস।

আজ সাংবাদিকরা নাটকের শেষ দৃশ্যটা দেখতে এসেছে। খোলা কবরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক গণ্যমান্য মানুষ। জানাজা পড়িয়েছেন নেপলস শাহী মসজিদের ইমাম সাহেব। নেপলসের সমস্ত নারী-পুরুষ হাজির হয়েছে গোরস্থানে।

মা আর ভাইকে নিয়ে কবরের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রেমারিক। ওদের মা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, লাঠির ওপর ভর দিয়ে। তার পরনে কালো পোশাক, বুকের কাছে ক্রুশটা মুঠোয় নিয়ে বিড়বিড় করে বাইবেলের অংশ বিশেষ পড়ছে। ওদের পাশে জুলিয়ানা, তার পাশে ফুরেলা। জুলিয়ানার চোখ দুটো লাল। কবরের উল্টো দিকে রয়েছেন কর্নেল গুগলি আর পাধানি, ওদের মাঝখানে লরা আভান্তি। খানিক আগে পর্যন্ত তাকেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখা গেছে। এখনও কাঁদছে, তবে আওয়াজ নেই, শুধু দু'গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। যাক, এতদিনে শান্তি হল মেয়েটার; লুবনার পাশেই কবর দেয়া হচ্ছে মাসুদ রানাকে। প্রভু, শান্তি হোক মহৎ-হৃদয় লোকটার মহান আত্মার।

কবরের ভেতর নামানো হল লাশ। কফিন নামাচ্ছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। আগেই কবরে নেমে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাঁর চোখে পানি নেই। শুধু খানিকটা উদভ্রান্ত, খানিকটা ভাষাহীন দৃষ্টি। কাঁচাপাকা ভুরুতে মাটি লেগে

আছে। কবরে নামার সময় একটু পিছলে গিয়েছিলেন। কর্নেল গুগলির পাশে দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি ফ্রেঞ্চ জেনারেল। মাসুদ রানাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে এসেছেন তিনি। জেনারেলের পাশে থমথমে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিনসেন্ট গগল।

কবরে মাটি চাপা দেয়ার পর ফ্রেঞ্চ জেনারেল স্যালুট করলেন। সবাই ঘুরে দাঁড়াল, শুধু মেজর রাহাত খান দাঁড়িয়ে থাকলেন, আর দাঁড়িয়ে থাকল লরা আভান্তি।

রেমারিক আর পাধানি দেখল, রাহাত খানের দিকে এগোতে শুরু করেও কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়লেন কর্নেল গুগলি, তারপর কবর ঘুরে লরা আভান্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাকে নিয়ে কবরস্থানের গেটের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে লরাকে তার গাড়িতে উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর নিজেও উঠে তার পাশে বসলেন।

রেমারিক আর পাধানির দিকে চোখ পড়তে হাত নাড়লেন কর্নেল। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

সেইদিন সান্ধ্য-দৈনিকে ছাপা হল মাসুদ রানার মৃত্যু-সংবাদ। একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হলঃ এদেশের মিষ্টি এক মেয়ে একটা গান উপহার দিয়েছিল বাংলাদেশের এক দুঃসাহসী যুবককে। বলেছিল, একদিন ছাড়াছাড়ি হবে, তখন যেন আমার কথা ভুলে যেয়ো না। এক সময় থেমে যাবে সমস্ত কোলাহল, ঘুমিয়ে পড়বে ধরণী। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটা মিটমিট করলে বুঝবে আমি তোমায় ডাকছি। সে রাতে তুমি জেগে থেকো, বন্ধু, ঘুমিয়ে পোড়ো না। আর হ্যাঁ, ফুলের গন্ধ পেলে বুঝে নিয়ো আমি আসছি। আর যদি কোকিল ডাকে, ভেবো আমি আর বেশি দূরে নেই। তারপর হঠাৎ ফুরফুরে বাতাস এসে তোমার গায়ে লুটিয়ে পড়লে বুঝবে আমি এসেছি। সে-রাতে তুমি জেগে থেকো, বন্ধু, ঘুমিয়ে পোড়ো না!

এই পবিত্র ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে সেই বিদেশী যুবক।

কামনা করি, তার চিরনিদ্রা শান্তিময় হোক। আমেন।

তেরো

মাঝরাত পেরিয়ে যাচ্ছে।

গোজোর পাহাড়ে পাহাড়ে বাতাসের ফিসফিসানি।

চাপা স্বরে কী সব জল্পনা-কল্পনা।

গ্রামগুলো অন্ধকার, কিন্তু ঘুমিয়ে নেই।

রুচিতা'স-এর ঝুল-বারান্দায় একজোড়া ভারি বুট দেখা গেল, লোমশ একটা ভারি হাত পড়ল রেলিঙের ওপর। বিদ্রোহীর চোখ পড়ে আছে জেটির দিকে। তার পিছনে দরজা খুলে গেল, পাশে এসে দাঁড়াল ক্ষতি কি! ক্ষতি কি-র হাত থেকে বিয়ারের একটা গ্লাস নিল বিদ্রোহী। দু'জনেই সাগরের দিকে তাকিয়ে ।

ফেরিবোট ডলফিন বাতাসের ধাক্কায় পানির ওপর মৃদুমন্দ দুলছে, জেটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ওটা। ব্রিজের ডানায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অক্লান্ত। সে-ও অপেক্ষা করছে, চুমুক দিচ্ছে বিয়ারের গ্লাসে।

হাজির আর গুঁফো রয়েছে পাহাড়ের মাথায়, দু'জনের চোখে দুটো বিনকিউলার।

পুলিস-লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে পুলিস অফিসার মেনিনো। বন্দরের শান্ত পানি কেটে সাবলীল গতিতে এগিয়ে আসছে লঞ্চ। জেটি আর বেশি দূরে নেই।

রুচিতা'স-এর পিছনের রাস্তায় হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ হল, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ল্যাণ্ড-রোভার। গড়াতে গড়াতে জেটির শেষ প্রান্তে এসে থামল সেটা। ওখানটা অন্ধকার। একমাত্র বাল্‌বটা কি করে জানি ফিউজ হয়ে গেছে।

জেটিতে ভিড়ল লঞ্চ। আবার ডেকে বেরিয়ে এল মেনিনো। দশ মিটার দূরে পার্ক করা রয়েছে ল্যাণ্ড-রোভার। আবছা অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি কোন রকমে দেখতে পেল সে। মূর্তিটা দরজা খুলে নিচে নামল। ভাল করে দেখার পর মেনিনো বুঝল, ওটা একটা নারীমূর্তি।

পিছন দিকে হাত নাড়ল মেনিনো। হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এল মানুষটা, মেনিনোকে পাশ কাটিয়ে জেটির দিকে এগোল। ধীর পায়ে হাঁটছে সে। লম্বা শরীর, হাঁটার ভঙ্গিটা অদ্ভুত, প্রথমে মাটি ছোঁয় পায়ের বাইরের অংশ।

মেয়েটা এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করল লোকটাকে।

সিগন্যাল দিল মেনিনো। এঞ্জিন থেকে জোরাল আওয়াজ বেরুল। মুখ ঘুরিয়ে খোলা সাগরের দিকে ছুটল পুলিস-লঞ্চ।

পিছনে তাকিয়ে অস্পষ্টভাবে এখনও দেখতে পাচ্ছে মেনিনো, দুটো ছায়া এক হয়ে আছে।

গোজোর পাহাড়ে পাহাড়ে বাতাসের ফিসফিসানি।

চাপা স্বরে কী সব জল্পনা-কল্পনা।

—ঃ শেষ ঃ—

মাসুদ রানা
দুইখণ্ড একত্রে

অগ্নিপুরুষ

কাজী আনোয়ার হোসেন

পালিয়ে বেড়াচ্ছে মাসুদ রানা।
সি.আই.এ এবং জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের
মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছে ওর মাথার ওপর।
কদিন বিশ্রাম নেবে মনে করে
আশ্রয় নিল সে বন্ধু রেমারিকের ওখানে, ইটালীতে।
তারই সুপারিশে দেহরক্ষীর চাকরি নিল ইটালীর
এক ধনী পরিবারে।
সেখানে ছোট্ট একটি মেয়ে মিষ্টি একটা গান
উপহার দিল রানাকে। দিয়েই চিরবিদায় নিল
এ পৃথিবী থেকে।
খুন করেছে ওকে কিডন্যাপাররা।

কিছুর সাথে নিজেকে জড়াবে না—
প্রতিজ্ঞা করেছিল রানা; কিন্তু কখন যে ওকে
জয় করে নিয়েছিল কিশোরী মেয়েটা, টেরই পায়নি।
এখন আর ঘুমাতে পারে না ও।
দাউ দাউ করে জ্বলছে বুকে প্রতিশোধের আগুন।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০